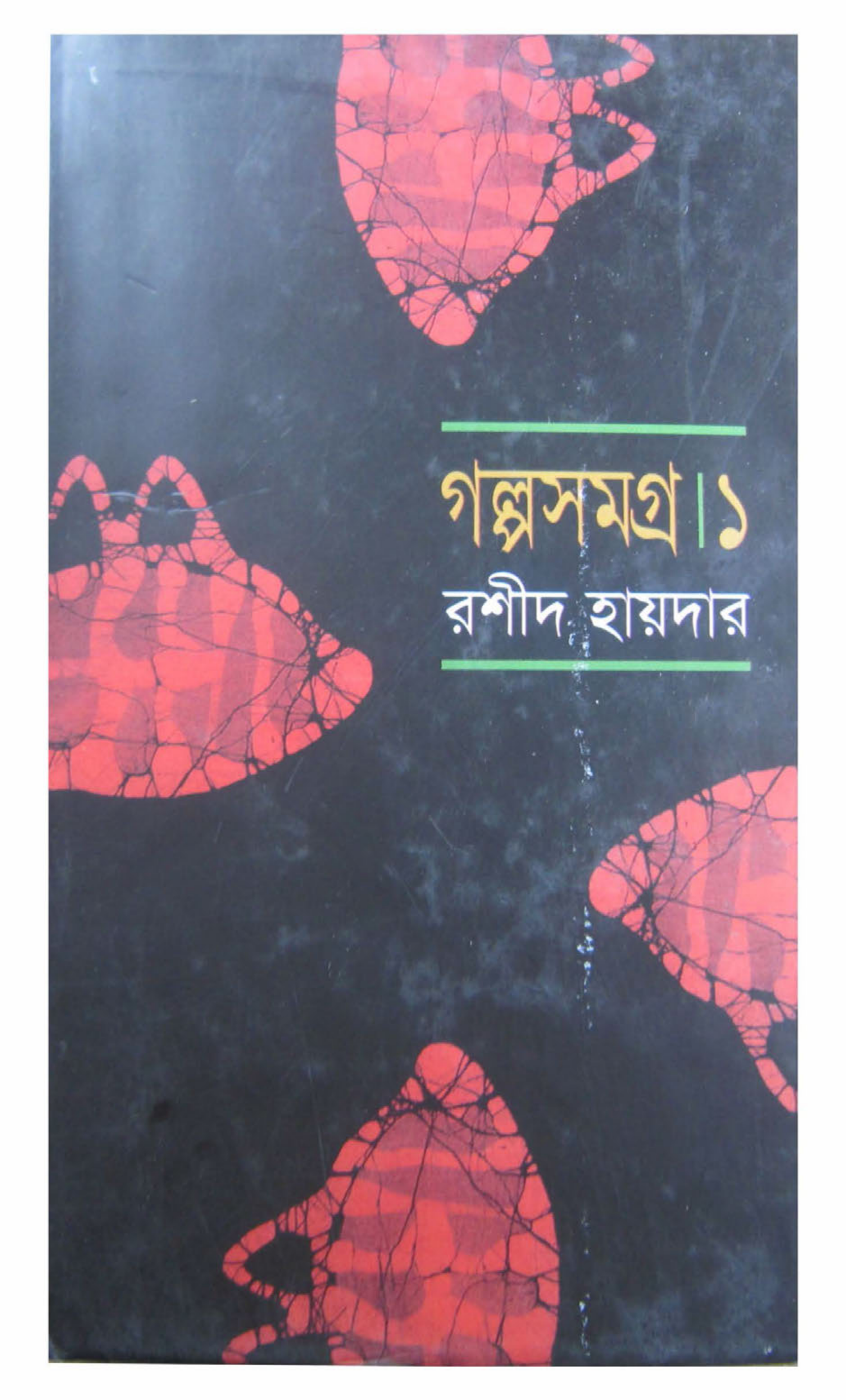




গল্পসমগ্র। ১

রশীদ হায়দার



‘উনিশ শ’ ‘ষাট’-এর দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দশক হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। কী রাজনীতি, কী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, কী বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম মানুষ এই দশকে হয়ে উঠেছিলো দুর্দমনীয় প্রতিবাদের এক মূর্ত প্রতীক।

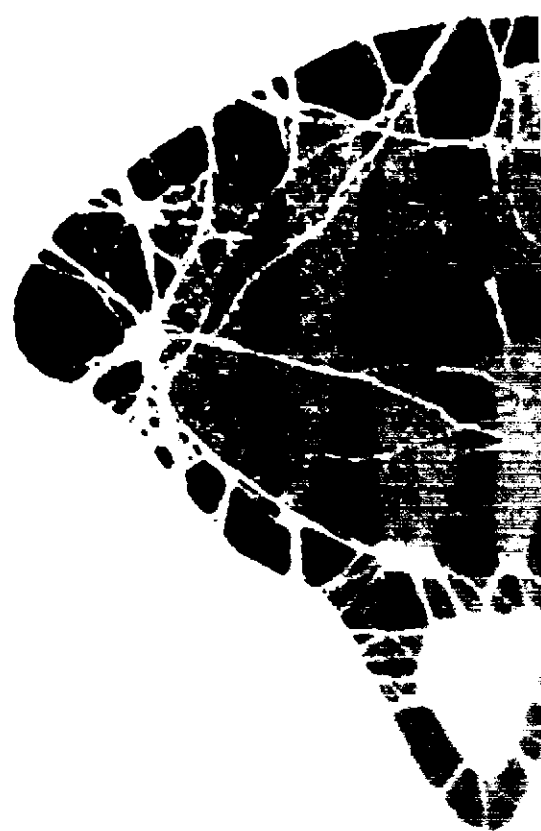
এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিষয়টিই বিবেচনায় আনা যাক। কথাশিল্পী রশীদ হায়দার এই দশকের অন্যতম প্রতিনিধি। ষাট-এর দশকের গোড়ায় ‘কাক’ ও ‘বাথান’ গল্প লিখে তিনি সুদী পাঠকসমাজের যে দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তার নানা বিষয়ের উপস্থাপন বৈচিত্র্যে। এই বৈচিত্র্য রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, গ্রাম-বাংলার জীবন, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা-প্রত্যাশার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি; সবকিছু মিলিয়ে রশীদ হায়দার মানবচরিত্র অঙ্কন করেন গভীর মমতায়, আন্তরিকতায়।

‘গল্পসমগ্র’-এ রশীদ হায়দারকে পাওয়া যাবে এমনই মমতা, আন্তরিকতা ও জীবনের প্রতি অকৃত্রিম অঙ্গীকারে।



গল্পসমগ্র । ১

রশীদ হায়দার



শোভা প্রকাশ ॥ ঢাকা

১৯৮৩

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
৩৮/৪ বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট
তৃতীয় তলা ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৭৮৭৪

স্বত্ব
আনিসা হায়দার

কম্পোজ
সাকিবুর কম্পিউটার

প্রচ্ছদ
শ্রবণ এম

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস

দাম
৪০০ টাকা

ISBN : 984 70084 0178 2

Complete Works of Short Stories (Part-I); by Rashid Haider.
Published by Mohammad Mizanur Rahman, Shova Prokash,
Banglabazar, Dhaka 1100. First Published : February 2011.
Price : Tk. 400 Only.

উৎসর্গ

শান্তি তোয়াছনেনসা ঋতুন
স্বস্তি মোঃ খোরশেদ আলী

সবিনয় নিবেদন

বইয়ের নাম 'গল্পসমগ্র' হলেও আমার সমস্ত গল্প এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। হয়নি নয়, বরং বলি প্রকাশ করিনি।

এর একাধিক কারণ রয়েছে। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত গল্পের কপি যেমন আমার সংগ্রহে নেই; তেমনি সংগ্রহে থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি গল্প আমি নিজেই অমনোনীত করেছি। গল্পগুলো আমার বিবেচনায় 'সমগ্র'ভুক্ত করা সমীচীন নয়। তবু কথা থেকে যায়। পাঠক, এবং পাঠকই যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক; সেজন্যে লেখকের অপছন্দের কোনো গল্প কোনো পাঠকের প্রিয় হতে পারে এমন সত্যও সত্য, কিন্তু নির্বাচনের সিদ্ধান্তটি যেহেতু আমার, সেজন্যে সম্মানিত পাঠকের কাছে পূর্বেই বিনীত মার্জনা প্রার্থনা করি।

১৯৬২ সালে সিদ্ধান্ত নিই যতোদিন চোখ মাথা ও হাত সচল থাকে-লিখবো। গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-ড্রামা কাহিনী-অনুবাদ-সম্পাদনা মিলিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় সত্তর হলেও আমি এখনও নিজেকে শিক্ষানবীশ বিবেচনা করি; সবিনয়ে বলি আমি লিখতে চেষ্টা করি। এটাকে বিনয় ভাবা উচিত হবে না। কারণ দীর্ঘ কয়েক দশকের লেখালেখির পরও নিজেকে লেখক নামে অভিহিত করতে যেমন সীমাহীন দ্বিধা; তেমনি অন্য কেউ করলে প্রচণ্ড সঙ্কোচ বোধ করি। পুনরায় বলি, এটি বিনয় নয়, আমার সরল স্বীকারোক্তি।

আমার 'নির্বাচিত গল্প' প্রকাশিত হয় লেখালেখি শুরু করার প্রায় চল্লিশ বছর পর; আর 'গল্প সমগ্র' হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে। এর দায় ভার আমার নয়, 'শোভা প্রকাশ'-এর অনুজপ্রতিম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান-এর। মিজান সাহসে এগিয়ে না এলে, সহযোগিতার হাত না বাড়ালে আমার এই 'গল্প সমগ্র' কখনও সামগ্রিকতার রূপ পেতেনা।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বোপরি পাঠক । তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিষাদন ।

গল্পগুলো আমি প্রকাশকাল অনুসারে সাজাইনি; গল্পের নিচে প্রকাশের বছরও অনুলিখিত । একজন সৃজনশীল সাহিত্যশিল্পীর জন্যে কালক্রম অনুসরণ প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু আমি বিবেচনা করেছি লেখকের সমস্ত গল্প পাঠের পর একজন পাঠক যেন একজন লেখককে পূর্ণভাবেই মূল্যায়ন বা সনাত্ত করতে পারেন ।

এটি 'গল্প সমগ্র' ১ম খণ্ড । ২য় খণ্ড সম্পর্কেও আমার 'নিবেদন' ১ম খণ্ডের অনুরূপ ।

ফেব্রুয়ারি ২০১১
মিরপুর, ঢাকা

রশীদ হারদার

সূ | চি | প | ত্র

- নানকু ॥ ১১
আমি, জুলেখা ও মা ॥ ২০
একটি সত্যি অথবা মিথ্যে গল্প ॥ ২৫
একটি অভদ্র ভদ্রলোক ॥ ৩২
কামুকী ॥ ৩৭
বিধাতার দরবারে ॥ ৪৩
ধ্রুবতারার স্থানচ্যুতি ॥ ৪৭
ওরা যখন ঘুমে ॥ ৫১
বোধি ॥ ৬০
অচেনা ॥ ৬৬
মাত্রা ॥ ৭৫
স্বাদ ॥ ৮৭
সেই পাখির গান ॥ ৯৮
এ কোন গৃহকোণ ॥ ১০৬
চেহারা ॥ ১১৫
দক্ষিণায়ন ॥ ১২৭
আলাপের মাত্রা ॥ ১৩৩
ও এবং ওরা ॥ ১৪৪
আগে গেলে বাঘে খায় ॥ ১৪৯
হাতের জীবন ॥ ১৫৭
অচেনা ॥ ১৭১
পানেট ॥ ১৮২
নিয়মের নিয়ামত বুড়ো ॥ ১৯১
ব্যবধান শূন্য ॥ ২২২
হাওয়ার বাক বদল ॥ ২২৯

মৰ্ত্যলোক । ২৪৫
প্রথম দিনে । ২৬২
এ কোন সংগীত । ২৭০
হাওয়ার মানুষ । ২৭৭
দ্বিতীয়বার । ২৮৪
এখনও । ২৯২
জলৌকা । ২৯৯
অন্য অনু । ৩০৭
সেই ছবি । ৩১৭
অসত্যের সত্য । ৩২৪
তধু একবার । ৩৩৩
কাক । ৩৪৩
ভেল । ৩৪৮
জয় । ৩৫৪
বাজিকর । ৩৬০

নানকু

পায়ে পায়ে বেলা বেড়েছে। আকাশে কোথাও মেঘ নেই, নীল বিস্তৃত সামিয়ানা আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। সূর্যটা ঠিক মাঝখানে। এখন দুপুর, প্রচণ্ড রোদ্দুর, কাক-পক্ষীদের রা নেই, একটা কুকুর একটা গাছের গুড়ির পাশে জিব বের করে হাঁপাচ্ছে। নানকুর কাছে অদ্ভুত মনে হয়। ভারি ঝাপ লাগে তার হঠাৎ; জীবনের কোন চাঞ্চল্য নেই, পৃথিবীটা এইমাত্র যেন শুরু হয়ে গেছে, থেমে গেছে গতি, একটা জড় পদার্থের মত বুঝি এখনি ছিটকে পড়ে যাবে রসাতলে। হাতের মাউথ অর্গানটা মুখের কাছাকাছি নিয়ে আবার সে পকেটে রেখে দিল, আড়চোখে একবার ছোট চাচার দিকে দেখে, তিনি ক্রমাল দিয়ে মুখটা ভাল করে মুছে নিলেন, রোদ্দুরে তার মুখটা রুম্ব দেখাচ্ছে।

গরুর গাড়িতে দাদি, ফুফু, ছোটচাচি, শানুবু, মিনুবু ও হেনাবু। নানকুর ভীষণ আপত্তি ছিল হেনাবু গাড়িতে উঠেছিল বলে। চাচা আর ও হেঁটে যাচ্ছে, হেনাবুর বয়েস আর কতই বা বেশি, সেওতো হেঁটে যেতে পারে। তা না, তার অহ্লাদ আর ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ে না। গাড়িতে ওঠার সময়ই নানকু চাচাকে বলেছিল,

হেনাবু হেঁটে যাবে।

চাচা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

বারে, আমি হেঁটে যাবো।

তুই বেটাছেলে হেঁটে যাবি নাতো গাড়িতে যাবি, লজ্জা করে না?

মুখ ঝামটা দিয়ে হেনাবু আগেভাগে গাড়িতে উঠে বসল। অন্য সময় হলে হেনাবুর বিশ-পঁচিশটা চুল মাথা থেকে খসে যেত, গায়ে নখের আঁচড় পড়ত, কিল চড়ের শব্দও হত। এখন নানকু কিছুই বলল না, যাওয়ার আনন্দে সে কেবল হেনাবু'কেই নয়, গোটা দুনিয়াটাকে ক্ষমা করে দিল।

গরুর গাড়ি একেবারে পদ্মার পাড়ে এসে গেছে। পাড়টা বেশ ঝাড়া, বাগির পথটা গাড়িয়ে নেমে পানিতে গিয়ে মিশেছে। পথের দু পাশে গরুর গাড়ির চাকার দাগ, গর্ত হয়ে গেছে দু এক জায়গায়, তারই পাশ দিয়ে হেনাবুদের গাড়িটা নামবে, থামবে পানির কাছে। এই সময় যদি হেনাবু একটু শান্তি পেত, খুশি হত না নানকু; এতক্ষণ সে কোন পথই পাচ্ছিল না তাকে শান্তি দেবার। চাচা বললেন গাড়োয়ানকে,

ওহে, গাড়িটা আস্তে নামিও।

ভয় নেই, কত নাবাইটি এই রাস্তায় গাড়ি; আপনে যে কি কন।

গাড়োয়ান গর্ব করে জবাব দিল।

গাড়োয়ানের জবাব শুনে খুব আমোদ হলো নানকুর। কি পাকা আর ওস্তাদ হয়ে গেছে গাড়ি চালাতে চালাতে। সেবারে সে সখ করে রজব ভাইয়ের গাড়িতে উঠে বসে গরুর লেজ ধরে যেই না এক বাড়ি মেরেছে, অমনি গরু দে ছুট। রজব ভাইয়ের গরু থামাতে সে কী কষ্ট! খুব রাগ করেছিল রজব ভাই সেবার।

সরসর করে নেমে গেল গাড়িটা নিচে। বালির পথ, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে, যেন গুঁড়ো সোনা কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে। আনন্দে চিড়িক দিয়ে উঠল নানকুর বুকটা, সেও তীরের মত এক দৌড়ে গাড়ির পেছনে পেছনে এসে একেবারে পানির কাছে গিয়ে থামলো।

পানিতে তখন শান্ত নাচন। দূর থেকে তরঙ্গের নৃপুর পরে শৌ শৌ শব্দ তুলে, ছড় বিছড় হয়ে আছড়ে পড়ে পাড়ে, নানকুর পায়ের কাছে। হাত দিয়ে নানকু পানি ছুঁয়ে চিৎকার করে ওঠে,

ফাট, আমি ফাট।

কিসের ফাট। নামতে নামতে শানুবু জিজ্ঞেস করেন।

আমি আগে পান্নার পানি ছুঁয়েছি।

নিচে থাকলে আমিও আগে ছুঁতাম।

হেনাবু পরাজয়ের সংলাপ উচ্চারণ করল। খুশি হল নানকু।

ঐ দ্যাখ, মোহিনী মিলের চোঙ দেখা যায়। ইং, একেবারে কাছে মনে হয়! বলে— মিনুবু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। শানুবু হেনাবু, নানকু সকলে ঘাড় ফিরিয়ে মোহিনী মিলের চোঙ দেখল, গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চাচা বললেন,

তোমরা দাঁড়াও, আমি নৌকা ঠিক করে আনছি। হেনু নানকু, মারামারি করো না।

চাচা না বললেও ওরা মারামারি করত না। নানকু অন্তত শানুবুর সামনে মারামারি বা অজদ্ভতা করতে পারে না। কি সুন্দর শানুবুকে দেখতে, চোখ দুটো টানা টানা, চুলগুলো কোঁকড়ানো, কপালে একটা লাল টিপ, পরণে সবুজ রঙের শাড়ি, কাঁচা সোনার দেহটা যেন জড়িয়ে রয়েছে। শানুবু যদি নানকুর আপন বোন হত তাহলে হেনাবু'কে সে আপন বোন বলে বীকারই করত না। ফুফুর কপালটা ভাল; একটি মাঝ মেয়ে, কি সুন্দর। হেনাবুর সঙ্গে প্রায়ই মারামারি লাগে নানকুর। ওদের সাপে নেউলে সম্পর্ক।

সেবার ফুল থেকে নানকু খবর পেয়েছিল শানুবু এসেছে তাদের বাড়ি বেড়াতে। ফুল পালিয়ে বাড়ি এসে দেখে শানুবু নিঁড়ি পেতে বসে মার সঙ্গে নারকোল কুড়ছেন, বা নাড়ু বানাবেন। নানকুকে দেখে শানুবু চোখ তুলে হেসে ফেললেন। বললেন,

ফুল হয়ে গেল!

আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। শানুপা, আমি হাফপ্যাটেল সাইকেল চালানো শিখেছি। দেখবেন?

না, পরে দেখবো।

না, এখনি।

কথাটা অর্ধেক বলেই এক দৌড়ে সাইকেলটা নিয়ে এসে, কায়দা করে হাফপ্যাডল চালাতে লাগল। শানুবু বারকয়েক দেখলেন, খুশি হলেন এবং বললেন, এখন হাত মুখ ধুয়ে আয়, খাবি।

এই আর একটু।

এবারে কায়দাটা একটু বেকায়দা হয়ে পড়েছিল; আর তক্ষণি সাইকেল সুন্দর ছড়মুড় করে পড়ল মাটিতে। মা আর শানুবু ছুটে এলেন, হেনাবু কোথেকে যেন চিৎকার করে উঠল,

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, কল্লার শান্তি আল্লাই দিয়েছে, আমার মনটা খুশি হয়েছে।

হেনাবু ছিল পেয়ারা গাছে, নানকু দেখেনি। আড়চোখে একবার তাকালো, ততক্ষণে শানুবু ওকে টেনে তুলেছেন—লেগেছে? চোট পেয়েছিস?

শানু আপা ওকে হাত ধরে টেনে তুলেছেন, সব ব্যথা সে ভুলে গেছে ইতিমধ্যে, এমনকি হেনাবুর টিটকারিও।

এই পদ্মার পাড়ে এসেও নানকু হেনাবুর সব অপরাধ, বাড়াবাড়ি, টিটকারি ক্ষমা করে দিতে পারে এবং দিয়েছেও। শানুবু সামনে আছেন, তাঁর সামনে তো আর বেয়াদবি করা যায় না! মিনুবু চাচাতো বোন, কেবল ফিকফিক করে হাসে, কিন্তু বড় ভাল; হেনাবুর মত হিংসুটে না। দু'চোখে দেখতে পারে না নানকু হেনাবু'কে, ও যে কেন ওর আপন বোন হতে গেল!

চাচা নৌকা ঠিক করে নিয়ে এলেন। বাজিতপুরের ঘাট থেকে কুষ্টিয়া, দেখতে মনে হয় এই তো কাছে; এ-পাড় থেকে মোহিনী মিলের চোঙ দেখা যায়, রায়ে ও ভোরে মিলের শিটি শোনা যায়। কিন্তু পৌঁছুতে গেলে পার হতে হয় পাকা বারো মাইল। নদীর পথ ঘুরে ঘুরে গেছে, বালির চড়া কখনো ডাইনে কখনো বায়ে রেখে। চাচা গাড়োয়ানকে বললেন, জিনিসপত্রগুলো ঠিক মত উঠিয়ে দিও।

জিু আচ্ছা।

মিষ্টির পাতিলটা আলগোছে নামাবে।

কি মিষ্টি আনিছ্যান? গাড়োয়ান জিজ্ঞেস করে।

রসগোল্লা। নৌকার উঠতে উঠতে জবাব দিলেন চাচা।

নানকুরা বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে।

বিয়ে বাড়িতে রসগোল্লাই নিয়ে যেতে হয়, এটাই নিয়ম। ছোটচাচার সম্বন্ধীর মেয়ের বিয়ে। শেকালীবুর। শেকালীবু'কে নানকু আগে একবার দেখেছে। ওদের বাড়িতে গিয়েছিল, বেশ অনেকদিন আছে। সেই শেকালীবুর বিয়ে। তাকে কোথাকার

কারা এসে নিয়ে যাবে, পর হয়ে যাবে আন্তে আন্তে শেফালীবু, অনেকদিন পর যখন বাড়ি আসবে, কুটুম এসেছে মনে হবে। আশ্চর্য একটা সম্পর্কে মানুষ কেমন পৃথক হয়ে যায়। এই হেনাবু, এখন নানকুর সাথে মারামারি করছে, অথচ আর দুদিন পরে হেনাবুর বিয়ে হবে, নানকু তখন আর তাকে মারতে পারবে না, হেনাবুও মারবে না, কেমন একটা সাক্ষি, অথচ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে ওদের।

নৌকার ছইয়ের ভেতর দাদি, ফুফু আর চাচি বসলেন। চাচা ও বুড়ো মাঝিটা গলুইয়ের ও-মাথায়, এ-মাথায় নানকু, শানুবু, হেনাবু ও মিনুবু। মিনুবু ও হেনাবু বেসুরো গলায় 'খরবায়ু বয় বেগে' গাওয়া শুরু করল, শুনে পিণ্ডি জ্বলে গেল নানকুর। গলায় সুর নেই, অথচ আহ্লাদ দেখোনা! মাঝি দুটো কি ভাবছে। ঘাড় ফিরিয়ে নানকু এ-পাশের জোয়ান মাঝিটার দিকে তাকিয়ে দেখে, সে মিনুবু ও হেনাবুর গানের 'গ'-ও শুনেছে না, হা করে শানুবুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ভারি পুলক লাগল নানকুর। দ্যাখ ব্যাটা দ্যাখ, পরাগ ভরে দ্যাখ, যত পারিস দ্যাখ। একটু আগের গান শোনার বিরক্তি সে ভুলে গেল, শানুবুর সৌন্দর্য, মিষ্টতা ও কোমলতা তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে এল, শানুবুর গা ঘেঁষে বসল নানকু।

একটা ছোট সংসার ভেসে চলেছে। গুটিকয়েক মানুষ, নৌকাটি তার আবাস। সকলের সব ভাবনা, চিন্তা, কথা, গান রূপ পাবে এখানে বসেই, হারিয়ে যাওয়া যাবে না বৃহৎ প্রকৃতিতে; আত্মগোপন করা যাবে না পৃথিবীর বিশালতায়। এই সংক্ষিপ্ত মিলনে সকলের হৃদয়ের কাছে মনে হয় একেকজনকে, কারো সামান্য বিপদেও কেউ হাত পা গুঁটিয়ে বসে থাকবে না, উদ্ধার করবে, হারিয়ে খুঁজে পাওয়ার পর বেশি করে আদর করবে। এখন যদি নানকু পানিতে পড়ে যায়, সে ঠিক জানে, হেনাবুই কাঁদবে বেশি; আর সকলে কাঁদবে, কিন্তু ওর হিংসুটে বোনের মত আর কেউ অতখানি অনুভব করবে না। তবুও ওরা সকলে হৃদয়ের কাছাকাছি আপন হয়ে রয়েছে। মানুষ এমনি করেই বুঝি চিরদিন আপন হয়ে এসেছে, অভাবে অনুভব করেছে বেশি করে।

নৌকা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পাড়ে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা ন্যাংটা হয়ে গোসল করছে, একটা লোক গরুর গা মুছে দিচ্ছে, গামছা বেঁধে কে যেন ডোবা নৌকার আগায় বসে খ্যাপ জাল ফেলছিল—সব এখন অনেক পেছনে পড়ে গেছে, মানুষগুলোকে ছোট ছোট মনে হয়। চাচা বললেন, নানকু, মাউ অর্গান কৈ?

এই যে।

পকেট থেকে বার করে নানকু আপন মনে আবোল-তাবোল বাজিয়ে যেতে লাগল। শানুবু নৌকার ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে পানি কেটে কেটে চলেছে, মিনুবু ও হেনাবু গান ছেড়ে দিয়ে কবি-কবি ভাব ধরেছে, ভেতরে দাদি, ফুফু ও চাচি গল্প করছেন।

শানুবু চিৎকার করে উঠলেন, ভেতর থেকে দাদি, ফুফু ও চাচি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলেন, 'কোন ভয় নেই' বলে চাচা লাফিয়ে পড়লেন পানিতে। নৌকা পানির নিচের চড়ায় আটকে গেছে, কাত হয়ে গেছে একপাশ, বড় বাকসটা ভেসে যাচ্ছে। চাচা

পানিতে লাফিয়ে পড়েই খপ করে বাকসটা ধরে ফেললেন। এতক্ষণে নানকু, মিনুবু ও হেনাবুর যেন দম আটকে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় নি, চোখের সামনে এতবড় একটা বিপর্যয়কে ওরা শুধু দেখেছে, অনুভব করেনি। নানকুর মাউথ অর্গান বন্ধ হয়ে গেছে আগেই, হেনাবু ও মিনুবুর তনুয়তা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মাঝি হেসে বলল,
ভয় করতিছ্যান কি কামে? আল্লাই বাঁচাবি।

তবুও বুঝতে চায়না নানকু। রাগ হয় জোয়ান মাঝিটার ওপর। হা করে শানুবুকে না দেখে হালটা আগে থেকে ঘুরিয়ে দিলেই তো এমন ঘটনা হত না। সবাই যদি মরে যেত!

নানকু আরো গভীর করে অনুভব করে সবাইকে। সে যেন স্পর্শ করে উপলব্ধি করতে চায় সকলের অস্তিত্ব। ওরা যে মরে নি, সেই কথাটা বোঝার সাথে সাথেই পৃথিবীর সব আনন্দ বুঝি ওর মাঝে এসে জমা হয়েছে। পদ্মাকে অমৃত রকমের লক্ষ্মী মেয়ে মনে হতেই পকেট থেকে মাউথ অর্গানটা বের করে আবার সে পিঁ পিঁ করে বাজানো শুরু করল।

নদীর নাচুনিটা এখন আগের চেয়ে যেন বেড়েছে।

আগে ছিল লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে, গায়ে হাত বুলোলে আলগোছে বিনীতা হয়ে যেত, কিন্তু এখন মনে হয় রাগ করছে, ফুলছে, খেমে খেমে, রয়ে সয়ে। নানকুর মনে হয়, পদ্মার সাথে ইতিমধ্যে তার যত হৃদয়তা হয়েছে, আর কারো সাথে তা হয় নি।

পদ্মা যেন সকলের অলক্ষ্যে নানকুর কানে কানে রাগের কথা কয়ে গেছে, শুনে ভয় পেয়েছে সে। না, কোথাও মেঘ নেই, সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে, ওদের নৌকার ছায়াটা পূবে নদীর পানিতে নাচতে নাচতে চলেছে লম্বালম্বি হয়ে। তবুও কেমন যেন একটা ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে, পৃথিবীটা বুঝি এক মহাপ্রলয়কাণ্ডে তছনছ হয়ে যাবে, আল্লা তাঁর সাত আসমানের ওপরে তখতে বসে তাই দেখবেন। শানুবু চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, মামা, আর কতদূর?

ওই সামনের বাঁকটা পার হয়ে আর কিছুদূর গেলেই গড়াই নদী, তার পরেই কুটে।

নানকু ওই সামনেটা আঁচ করতে গিয়ে দেখল, দূরের গ্রাম গাছপালাগুলোকে সবুজ ধোঁয়ার আবরণে জড়ানো মনে হয়। হঠাৎ বুড়ো মাঝি বলল,

হজুর, নদীর গতিক ভালো দেখছিতি না। আকাশও ধিনি কেমনি কেমনি করিতেছে। তোমার কি মনে হয় ঝড় হবে?

হেঁ তাইতো মনে হয়। ইয়েরি যদি বাতাস বজ্জে, বালুও ওড়তেছে।

সত্যি সত্যি কেউই খেয়াল করে নি কুচি কুচি বালির অসংখ্য কণা গায় কাপড়ে ছিটে গেছে, সাদা হয় গেছে শরীর, সূর্যের ছটায় চিলিক দিয়ে উঠছে।

অনেকগুলো গাংচিল নৌকার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়ে গেল, কোথা থেকে একটা চিংকার ভেসে এলো হেই-ই-ই-ই। নানকু দেখতে পেল, আকাশটা আর নীল নেই, সাদা হয়ে গেছে, সূর্যটা অনেক ভাঁজের কাপড়ের আড়াল থেকে লুকোচুরি হটা

ছড়াচ্ছে। আশেপাশে কোন নৌকা যায় না, দু'পাড় তখন চোখের আড়াল হয়ে গেছে, সবুজ গ্রামটা তখন ঢাকা। হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা নৌকা বেরিয়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ চিৎকারে বলে গেল—হেই, পাড়ে নৌকা বাঁধো, দ্যাখোনা বালুর ঝড় শুরু হয়েছে। নানকু আর ভাবতে পারে না। শানুবু, মিনুবু ও হেনাবু নৌকার ছইয়ের ভেতরে চলে গেছে, অথচ সে বিমূঢ়ের মত বাইরে পাটাতনের ওপর বসে বালির ঝড় দেখছে।

চাচা ওপাশে তারতরে চিৎকার করছেন—কে আছ বাঁচাও; কিন্তু বাতাস তখন গলার পেয়েছে অসুরের শক্তি, হা হা করে হাসছে, চাচার কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে যেন ফেটে পড়ছে নদীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। নানকু শুনেছিল, ঝড়ের সময় সমস্ত দৈত্যদানো নাকি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, যোগ দিয়ে ঝড়কে আরো প্রবল করে তোলে, কারো ওপর রাগ থাকলে নাকি তুলে আছাড় মারে; বাড়িঘর ভেঙে ফেলে, গাছ-গাছড়া উপড়ে দিয়ে যায়। নানকুর ভয় হল, সে দৈত্যদের রাগানোর মত কিছু বলেছে কিনা মনে মনে।

পৃথিবীর একেবারে শেষপ্রান্ত থেকে ঝড় উঠেছে; সমস্ত বালি উড়িয়ে ওই প্রান্তে নিয়ে জমা করবে বাতাসের এমনি একটা মতলব। এখন আর কিছুই চোখে দেখা যায় না। হৈয়ের মধ্যে দাদি, চাচি, ফুফু, বু'রা সবাই আল্লা আল্লা করছে, চাচা ওপাশে মাঝির সাথে দাঁড় বাইছেন। নানকু ঘাড় তুললে দেখতে পেত, চাচাকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ তাঁর হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। নানকু হৈয়ের এক কোণায় চূপ করে বসে আছে, তার কোন বোধশক্তি নেই, অনুভূতিহীন একটা কিশোর যেন জড়পিণ্ডের মত ধূন ধরে বসে রয়েছে।

হঠাৎ বুড়ো মাঝিটার গলা ফাটানো চিৎকার বাতাসের অট্টহাসি ভেদ করে নানকুর কানে পৌঁছুলো, সে চিৎকার বিজয়ের, আশ্রয়ের।

আমরা পাড়ে আইছি, পার পাইছি।

লাকিরে উঠল নানকু, গলা বাড়িয়ে দেখে সত্যি তারা তীরে এসে গেছে, কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের কিনারায় এনে ফেলেছে তার নাম কেউ জানে না। নানকু ততক্ষণে হৈয়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে একেবারে চাচাকে জড়িয়ে ধরেছে। চাচা ওকে কিছু বললেন না, মাথার একবার হাত বুলোলেন, তারপর তীব্র আবেগে দু'হাতে জাপটে ধরে কেঁদে ফেললেন। বুড়ো মাঝিটা বলল,

হজুর, ঝড় কমলি গায় যাবেন?

চাচা সে কথার জবাব দিলেন না; বজ্রাহতের মত চোখ তুলে তাকালেন, উদাস ও নিরর্থক দৃষ্টি বুড়ো মাঝির মুখ পার হয়ে কোন দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়লো তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু ঝড় কমেছে কই, সমান গতিতে বালির ঝড় বইছে, নৌকা তীরে ঠেকেছে বলে বোঝা যায় যে সত্যি তীরে এসে গেছে, কিন্তু কোথায় গ্রাম, কোথায় বা লোকালয়। নৌকাটা আছড়ে আছড়ে পড়ছে নদীর পানিতে। ঝড়ের রাজা যেন খেয়াল-খুশিভরে খেলনার মত নৌকাটা পানির ওপরে তুলছে, ফেলছে। সে ঝড়ে যদি সবাই মরে যেত, নানকু মরেও অবাক হত না; মৃত্যু ওদের না আসাটাই

স্বাভাবিক। অসহায়ের মত সকলে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। এই বুঝি আরো শক্তিশালী একটা বাতাসের ঝাপটা এসে এসে নৌকাটাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে ফেলে দেয়, নানকু যে সাঁতার জানে তাতে এই বিক্ষুব্ধ পদ্মার দু'হাতও সাঁতার দিয়ে যাওয়া যাবে না, আন্তে আন্তে পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এক একটা মুহূর্তকে বিশাল বিরতিহীন এক তাণ্ডব উৎসবের ঘণ্টা বলে মনে হয়, বুঝি তার শেষ নেই।

ঝড় আগের চেয়ে কমেছে, তবুও তার তর্জন-গর্জন শেষ হয় নি, কি যেন বিধ্বস্ত করতে পারে নি এমনি এক আক্রোশে ফোঁপাচ্ছে। বুড়ো মাঝিটা আন্তে আন্তে তীরে নামল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো আন্তে আন্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। চাচা তাকিয়ে রইলেন, নানকু যতদূর দেখা যায়, দেখল। মাঝিটা অশান্ত ধোঁয়াটে অন্ধকার প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে গেল, আর বুঝি ফিরে আসবে না।

শামুকের মত সময় এগিয়ে চলেছে। বুড়ো মাঝিটার দেখা নেই। ওপাশে জোয়ান মাছিটা গামছা গায় দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। বুড়ো মাঝিটা কোথায় গেল! গ্রাম দেখা যায় না, তবুও সে ফিরে আসে না। না সে পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গেল! এলোমেলো মেঘের মত নানকুর চিন্তারাজি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছুটে বেড়াতে থাকে। একত্রে, ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চিন্তা করতে গিয়ে নানকু বারবার অনুভব করল— আসলে মৃত্যুর পূর্বে নাকি মানুষের সমস্ত কথা মনে এসে ভিড় করে। না, ঐ যে বুড়ো মাঝিটা ফিরে এসেছে। তার চোখমুখ দেখা যায় না, কাপড়ে বালিতে এক হয়ে গেছে, যমদূতের মত সাদা কাপড়ে জড়ানো মানুষটা হাজির হয়েছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। সে বলল, গাঁওতো নেই, গরুর বাথান আছে। চলেন তো যাই।

কার বাথান?

আছির বিশ্বাসের।

নামটা শুনেই যেন চমকে উঠলেন চাচা। এ মুহূর্তে তার মত ডাকাত নাকি হয় না। ভয়ে হিম হয়ে যেতে লাগলেন তিনি। নানকু জিজ্ঞেস করল, যাবেন চাচা?

চাচা কোন কথা বললেন না। আন্তে আন্তে নৌকা থেকে নামলেন, চারদিকে একবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর দ্রুত নৌকায় উঠে দাড়ির কাছে গিয়ে কি বললেন নানকু তা শুনতে পেল না, অনুমানও করতে পারল না। চাচা বেরিয়ে এলেন ছেয়ের ভেতর থেকে। পেছনে ফুফু, শানুবু, চাচি, দাদি, মিনুবু ও হেনাবু। সাদা হয়ে গেছে ওরা। হেনাবু নানকুর মুখের দিকে চোখ পড়তেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। নৌকাতে থাকা নাকি আরো বিপজ্জনক। রাতে ডাকার দলের হাতে পড়লে নির্ঘাত লুটতরাজ, খুন, আরো কত কি! বাথানে গিয়ে নানকুর আবার নাম করে যদি রক্ষা পাওয়া যায়, এমনি একটা ক্ষীণ ভরসা সকলের চোখে মুখে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, যে কোন মুহূর্তে ভেঙে খান খান হয়ে যেতে পারে।

চাচা একহাতে শক্ত করে ধরেছেন দাদিকে, আরেক হাতে বড় বাকসটা মাথায় ধরা, বুড়ো মাঝিটা রসগোল্লার হাড়ি আর বিছানার বাঙিলটা, জোয়ান মাঝিটা ছোট

ছোট বাকস তিনটে মাথায় নিয়ে রওনা হল। তার পেছনে চাচি, ফুফু, শানুবু, হেনাবু ও নানকু হাত ধরে এমনভাবে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল, যেন জ্যান্ত শবদেহের মিছিল চলেছে।

ওরা এগিয়ে চলল চাচা আর বুড়ো মাঝিটাকে অনুসরণ করে। নির্দিষ্ট কোন পথ নেই, বাতাসের বেগ কমেছে, দূরে দেখা যায় তিনচারটে ছোট ছোট ঝড়ের ছাপড়া, তারই অভিমুখে ওদের যাত্রা। বাতাসে তখনো গায়ে কাপড় লেপটে যাচ্ছে, আরো জোরে বইলে মানুষকে মাটিতে ফেলেও দিতে পারে। এতটা পথ হেঁটে এল, কিছু কোন পথের চিহ্ন দেখতে পেল না নানকু। মাঝে মাঝে কাশের ঝাড় ঝোপ দেখা যায়, বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে মাটিতে নুয়ে পড়ে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ওরা হাঁটছে, সামনে লক্ষ্য ওই ছাপড়া কটা; কখন পৌঁছুবে, কে জানে। চাচা মাঝে মাঝে পেছন ফিরে চাইছেন আর শানুবুর, হেনাবু, মিনুবু ও নানকুকে সাবধান হয়ে হাঁটতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

ওরা যখন বাথানে এসে হাজির হল তখন বাতাস পড়ে গেছে, কলাগাছগুলোর পাতা ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে তখনো তর তর করে কাঁপছে, গরুগুলো চাড়িতে মুখ রেখে পানি খাচ্ছে। নানকু অবাক হয়ে দেখলো এখানকার মানুষগুলোকে, প্রকৃতির সঙ্গে রোজ বুঝি যুদ্ধ করে, তাই ওদের চেহারা অমন ক্লান্ত। ভয় পেল নানকু। সে হেনাবুর হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল।

বাথানের সর্দার-মত লোকটি চাচাকে বলল,

আপনেরা কোনে যাবেন?

কুটে।

জবাব দিলেন চাচা।

কুটে কোনে?

ভালবাড়ি, মোরাজ্জিম বিশ্বাসের বাড়িতে।

নানকু লক্ষ করল, লোকটা যেন দমে গেল হঠাৎ। পরে চোখে মুখে সহজ ভাব ফুটিয়ে তাড়াতাড়ি বলল,

আম্মা, আম্মা, বিশ্বাসের বাড়িত যাবেন? আহারের দুদির ছাওয়াল মিয়ে ইয়েরে এত কষ্ট সহ্য হয়?

পাঁচ ছ জন লোক ইতিমধ্যে জমা হয়ে গেছে ঐ লোকটির পাশে। সবাইকে সে বলল, উনারে জিরেনের ব্যবস্থা করে দে।

লোকগুলো ছুটে গেল কেউ ঘরের দিকে, কেউ ঝড়ের গাদার দিকে। সবাই ছুটাছুটি করে বাথানের একটা ঘর পরিষ্কার করে দিল, খড় বিছিয়ে দিল, রাতে সকলে সে ঘরেই থাকবে। নানকুর হঠাৎ লোকটাকে ভাল লাগল। প্রথম দেখে ভয় পেয়েছিল, কেমন যেন চাউনি চোখে মুখে, সকলকে যেন দৃষ্টি দিয়ে চেটে খাচ্ছে। অথচ এখন কি স্ত্রু আর ভালমানুষি। হঠাৎ তার মনে হয়, মোরাজ্জিম বিশ্বাসের নাম

শোনার পর থেকেই লোকটি কেমন ভালমানুষ হয়ে গেছে। তার দ্বারা অনিষ্ট হবে না এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে নানকুর মনে।

সে রাতে খাওয়া নেই কারো। চাচা মিষ্টি এনেছিলেন, বাথানের সবাইকে দিলেন, নিজেরাও খেয়ে পানি খেলেন। নানকুর খাবার ইচ্ছে ছিল না, এখন কেবল ইচ্ছে করছে এই শৌ শৌ বাতাসের মধ্যে বাথানের উঁচু টিবিটার ওপর চুপচাপ বসে থাকতে। চাচা থাকতে দিলেন না, আদর করে কোলে নিয়ে খড় বিছানো বিছানার এক কোণে শুইয়ে দিলেন। ছোট্ট একটা ঘর, গায় গায় সবাই শুয়েছে; বেড়ার সাথে নানকু, তার পরে চাচা, হেনাবু, চাচি, ফুফু, শানুবু, মিনুবু ও দাদি। নানকুর মনে আছে, অনেক রাত পর্যন্ত চাচা গল্প করেছেন; কোন নদীতে কবে কে ঝড়ে পড়েছিল, কোনবার বেশি বন্যা হয়েছিল, এমনি কত কি। নানকুর শুনতে ভালই লাগছিল, শুনেও ছিল অনেকক্ষণ, কিন্তু তারপরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে তার আর মনে নেই।

নানকুর এখনো মনে পড়ে না রাত তখন কত হবে। সকলের নাক দিয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ করে নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে, মিনুবু ঘুমের ঘোরে কাকে যেন গালি দিয়ে উঠল, নানকু বুঝতে পারল, গভীর রাত, গভীর; অসম্ভব রকমের গভীর, সে গভীরতার মাপ হয় না। কাত ফিরে শুঁল নানকু। ঠিক তখনই সে শুনল, তার পাশের ঘরে একটি পুরুষ আর একটি মেয়ে কথা বলছে, অনুচ্চ কণ্ঠে, অনেকটা ফিসফিস করে। নানকু কান খাড়া করল, অতি আন্তে কানটা ঠেকিয়ে দিল বেড়ায় সাথে। আশ্চর্য হল সে, এতক্ষণ সে কোন মেয়েলোকের দেখা পাওয়া দূর, গলাও শোনে নি। এ আবার কোথেকে এল! নিজের অজান্তেই ঘাড় উঁচু করে লষ্ঠনের স্বল্প আলোয় দেখল, সবাই যেমন শুয়ে ছিল, ঠিক তেমনি আছে। তাহলে পাশের ঘরে কথা বলছে কে? এবারে আরো আশ্চর্য হয়ে নানকু উৎকর্ণ হয় লোকটি আর মেয়েটির কথা শোনার জন্য। ছি, ছি, নানকু যে ও কথার অর্থ বোঝে। বুঝক না, কেউতো জানছে না যে সে শুনছে। লোকটি খুশির চোটে এবারে গলাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলল,

আজ রসগোল্লা খাইছিস, আজ প্যাটে যদি ছাওয়াল আসে, তাহলি নাম খোবো রসগোল্লা।

নানকু আর কিছু শোনে নি। মেয়েটি কোন কথার জবাব দেয় নি। কেবল আঃ উঃ শব্দ কানে এলো। ভারি খারাপ লাগে নানকুর। বুকের মধ্যে খুঁতখুঁতি নিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে তা নিজেই জানে না। চাচা ধাক্কা দিয়ে তুললেন,

যাবি না? ওঠ।

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল নানকু। উঠেই একলাফে ঘরের বাইরে দেখল, পূর্ব আকাশে মস্ত বড় সূর্য উঠেছে, সোনার রং সারা পৃথিবীতে যেন ছেয়ে গেছে। মুহূর্তে তার মনে হল রাত্রের কথা, কিন্তু একটুও খারাপ লাগল না; বরঞ্চ খুশিই হল যেন, খুব খুশি, অসম্ভব রকমের খুশি। প্রচণ্ড ঝড়কে তার আশীর্বাদ মনে হল, বাথানের ওই ঘরটায় যে ছেলের জন্ম হবে, সমস্ত আশীর্বাদ যেন তার জন্য।

আমি, ভুলেখা ও মা

যখন আপনাদের এ কাহিনী বলছি, তখন আমি পূর্ব পাকিস্তান সড়ক পরিবহন সংস্থার একটি বাস ষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। রাত হয়েছে। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। রাতের শহর পুরোপুরি জীবন্ত।

আমাকে আপনারা কেউ কখনো সন্দেহ করেছেন? আমি জানি করেন নি। করতে পারেন না। করার পেছনে কোন কারণ নেই। আমিও তেমন কোন আচরণ করিনি যার জন্যে আপনারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমার চারপাশে সমবেত হতে পারেন। আমি, দিকি ভাল মানুষ, পৃথিবীর সমস্ত ভাল মানুষগুলো যেমন হয়। যারা ভাল মানুষ সাজে, তাদের চেয়েও, আমি ভাল মানুষ।

আমি এই বাস ষ্ট্যান্ডে রোজ আসিনে। সম্ভবত এটাও আমাকে সন্দেহ না করার কারণ। যারা সব সময়ই কারণ খুঁজে বেড়ায়, তাদের হিসেবেও আমি এত নগণ্য যে পৃথিবীতে আর অস্তিত্ব আছে কিনা সে সম্পর্কে তাদের সন্দেহ রয়েছে। হঠাৎ, যেদিন আমাকে আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নে, সেদিন, ঠিক দু আনা কিংবা তিন আনা পয়সা খরচ করে, অথবা পায় হেঁটে, সোজা চলে আসি এই বাস ষ্ট্যান্ডে। বাস থেকে নেমে আমার গন্তব্যস্থলই হয় এইটে। এটা ছেড়ে আমি বেশিদূর যেতে পারি নে। যখন পারি, তখন সোজা বাসায় চলে আসি। এসে, আমার পরাজিত আমিকে খেয়াল খুশিমত চাবুক মারি ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমার বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

আমি একজন ভাল মানুষ, বাকে বলে পারফেক্ট জেন্টলম্যান। বাস থেকে নামি। একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসি ষ্ট্যান্ডে। যারা নামার সময় আমাকে লক্ষ্য করে, তারা ঐ গাড়িতেই উঠে চলে যায় বলে, দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করে না। যারা থাকে তারা, আমি জানি, আমার দিকে তাকায়, দেখে না। আমি অন্যান্যদের মতই বাসের জন্যে অপেক্ষা করার ভান করি। বাস দেরি করে আসার জন্যে মাঝে মাঝে কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করি। আবার কখনো কখনো অপেক্ষমান যাত্রীদের অসহিষ্ণু উক্তি কপট সমর্থন জানাই। আমি দূরে লক্ষ্য করি বাস আসছে কি না। রাতের অন্ধকারে বাসের মাথার আলো দেখে ও শব্দ শুনেই বোঝা যায় তার আগমনী। আমি ঠিক তখনই সবার অলক্ষ্যেই কেটে পড়ি। দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনি। কিংবা রাস্তা

ধরে হাঁটা শুরু করে দিই, আর খেয়াল রাখি বাসটা এসে আবার ষ্টার্ট নিল কি না। যক্ষুণি ষ্টার্ট নেয়, তক্ষুণি ফিরে এসে ঐ ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে, আবার বাসের জন্যে অপেক্ষা করি।

আমি বাসের জন্যে অপেক্ষা করলেও আমার দৃষ্টি প্রায় সব সময়ই নিবন্ধ থাকে এই বাস ষ্ট্যাণ্ড-সংলগ্ন বাড়িটাতে। একটা সাদা একতলা বাড়ি। খুব সুন্দর। আমেরিকান কায়দায় বানানো। বাড়ির সম্মুখে ফুল বাগান আছে। প্রাচীর দিয়ে সম্পূর্ণ বাড়িটা ঘেরা। সামনের দিকে লোহার বড় একটা গেট। বাড়ির সামনে দিয়েই বড় চওড়া রাস্তা। রাস্তাটা এসেছে সন্ধান্ত পাড়া থেকে, গিয়েছে আরো বেশি সন্ধান্ত পাড়ায়। এই বাড়িটাই আসলে আমার লক্ষ্যস্থল। আমি তাকিয়ে থাকি আনমনে। বাস আসছে না, তাকাচ্ছি এদিক ওদিক। যেন সময় কাটাচ্ছি।

আজকে আমি যখন এসে নামলাম বাস থেকে, তখন রাত সাড়ে আটটা মত বাজে। আকাশে মেঘ নেই। তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। একফালি চাঁদও রয়েছে আকাশের পশ্চিমাংশে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। ঘামে সারা শরীর ভিজে চুপসে গেছে। একটুও বাতাস নেই। আমি বাস থেকে নেমে প্রথমে মাথার ঝিম ছাড়িয়ে নিলাম। মিনিট দুয়েক পার হয়ে যাওয়ার পর, আন্তে আন্তে এগিয়ে গেলাম রাস্তার অপর পাশের দোকানটায়। একটা সিগারেট কিনে আবার ফিরে এসে, ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে লক্ষ করতে লাগলাম।

প্রাচীরের সাথেই লাগানো যে ঘরটা সেটা, মাঝেরটা ও তার পাশের ঘরে সাদা আলো জ্বলছে। বাসায় কোন সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ প্রাচীরের পাশের ঘরে একটি পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল :

ভোর হল

দোর খোল—সাথে সাথে একটি বাচ্চা মেয়েলি কণ্ঠে চিৎকার করে উচ্চারণ করল :

ভোর হল

দোর খোল।

আমি বুঝতে পারলাম, ইপু পড়ছে। প্রাইভেট টিউটর এসেছেন পড়াতে। রায়ে ইনি বাংলা পড়ান। সকালে একজন এসে ইংরেজি পড়িয়ে যান এবং বিকেলে একজন অন্যান্য বিষয় পড়ান। ইপু কিণ্ডারগার্টেনে পড়ে। আশ্চর্য, এই ছেলেটির কণ্ঠস্বর ঠিক মেয়েলি। খালি কণ্ঠ ভাল করে লক্ষ করলে যদিও টের পাওয়া যায়, কিন্তু টেলিফোনে একদম বোঝা যায় না। আমি একদিন পাবলিক টেলিফোন থেকে এই বাসায় ফোন করেছিলাম। ইপু ধরেছিল। আমি মোটেই বুঝতে না পেরে, জুলেখা ভেবে রীতিমত সূর্যমুখী বলে সম্বোধন করতে, বেচারী খতমত খেয়ে রং নাশ্বার বলে খটাং করে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল। আমার বিশটি পয়সা নষ্ট হওয়ার জন্যে ভীষণ দুঃখ হয়েছিল। ঐ পয়সা বিশটি থাকলে, ভর দুপুরে বাসায় হেঁটে না গিয়ে বাসে যেতে

পারতাম। আর ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে, মনের আনন্দে হেঁটে, চাইকি পৃথিবীও এক পাক দিয়ে আসা যেত। ইপুর সঙ্গে তখনো আমার পরিচয় হয় নি। যখন হয়েছিল, তখন সেই বিশ পয়সার শোকে আমি ও সূর্যমুখী প্রাণ খুলে হেসেছিলাম।

ইপু এখন পড়ছে। আমার ছোট ভাই মাজেদও হয়ত এখন পড়ছে। কিংবা পড়তে পড়তে মাদুরের ওপরে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা ওরই সমবয়সী রাজা রতনদের সাথে মারামারি করছে। রাত সাড়ে নয়টা দশটায় মা রান্নাঘরের ধোঁয়া কালির মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে রোজই ছোট ভাই বোনগুলোকে ঘুম থেকে টেনে তুলে খাওয়ান। ইপু ঠিক নয়টা পর্যন্ত পড়বে। তারপরে ওর মা কিংবা বড় আপা এসে কোলে করে নিয়ে যাবে খাওয়ার ঘরে। খাওয়ার ঘরে চাকর তখন সব প্রস্তুত করে রাখে।

ইপু 'প্রভাতী' কবিতাটি চিৎকার করে পুরোটাই বলে গেল। ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে ওকে কোলে করে মাজেদের মত আদর করি। দু'পা এগিয়েও গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল, আমি যে ঐ বাসার সাথে সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি, গেলেই চিনবে। ইপু হয়ত আনন্দে চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু ওর বড়গুলো? আসবে। হয়ত কিছুই বলবে না। সম্ভবত কেবল চোখের নীরব প্রশ্নে আমাকে ঘায়েল করে ফেলবে। কিংবা, অজস্র প্রশ্নে আমাকে অক্ষত রাখবে না।

বারান্দা দিয়ে পা'জামা ফ্রক পরা একটি মেয়ে আস্তে আস্তে এ ঘর থেকে ওঘরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, রেখা। জুলেখার ছোট বোন। কলেজে পড়ে। ভীষণ দুই। ওর হাতেও টেলিফোন পড়েছে মাঝে মাঝে। পড়লে আর রক্ষে নেই। প্রথমে কৃত্রিম রাগ ও শাসন করবে। তারপরে দু'চারটে মিথ্যে বলে ঘাবড়ে দেবে। অবশেষে জুলেখাকে ডাকবে। প্রথম প্রথম ভীষণ ভয় হত। ঘাবড়ে যেতাম। মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে গ্রহণ করতাম। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, রেখার আসলে রসিকতা। কিন্তু আমি যার জন্যে এসেছি তার তো দেখা পাইনে। আমি যে মাঝে মাঝে সূর্যমুখীকে দেখার জন্যে আসি তা কি আমার বিধাতা জানে না? একশোবার জানে। একশোবার নয়। হাজার বার, লাখবার, কোটিবার জানে। অথচ সেই ষোলই ফেব্রুয়ারির পর থেকে, আমার সঙ্গে একটিবার দেখা হওয়ার সুযোগ দিলে না তুমি বিধাতা। রেখাও রসিকতা করে, তুমিও রসিকতা কর। তুমি সত্যি সর্বশক্তিমান রসিক। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি বাহাদুরি দেখাও। যাই বল তুমি, তোমার রসিকতাগুলো এখন নিরস হয়ে আসছে। এক কাজ করলে ভাল হয়, তোমার এখন ছুটি নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের হাতে ছেড়ে দাও পৃথিবীটাকে। দিয়েই দেখো শক্তি। দান করো সেই ক্ষমতা, যা দিয়ে আমাদের ভাগ্যকে আমরা গড়ে নিতে পারি। আমি কেবল দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। নিজের দুই পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে সুন্দর পৃথিবীকে প্রাণ ভরে দেখে নিতে চেয়েছিলাম। আমি ভালবাসতে চেয়েছি। বিশ্বাস না করলে কি করব। তবুও বলছি, আমি সুন্দরকে সুন্দরতম করে পেতে চেয়েছি। আর সেই অপরাধেই কি তুমি বিধাতা আমার পৃথিবীকে অন্ধকার করে দিলে?

সূর্যমুখী আমাকে অস্বীকার করেছে। ওর সাথে আমার বিচ্ছেদ হয়েছে। অনেক কারণ আছে। নাইবা শুনলেন সে সব কারণ। ওরা অনেক ওপরে। আমরা নিচে একতলা বাড়িতে থাকলেও লোহার গেট পার হয়ে ঢুকতে হয়। আমি কি পাগল হয়ে গেছি যে কারণ বলছি? বলছি তো বলব না।

আমি এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি, প্রাচীরের ওপর দিয়ে রজনীগন্ধা ফুলের শীষ উঠেছে। বড্ড প্রিয় ফুল আমার। জুলেখাকে আমি বলেছিলাম,

তোমার নাম রাখছি সূর্যমুখী, অথচ তুমি ভালবাস রজনীগন্ধা ফুল।

এর উত্তরে ও আমার ধরা গলায় বলেছিল,

দেখা ও মাধুরীতো এক জিনিস নয়। সূর্যমুখী দেখে চোখ ভরে ঠিকই, কিন্তু রজনীগন্ধায় যে মন ভরে তা বোঝ না? তুমি আমাকে দেখে খুশি হও, আর পরিবর্তে তোমার মনে গন্ধ ছড়িয়ে দিই আমি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম তখন। কেবল একটু হেসেছিলাম। ও তখন পায় পায় এগিয়ে গিয়ে একটা রজনীগন্ধা ফুল তুলে এনে আমায় বলল,

আমার উপহার। সাজিয়ে রেখ।

আমি রেখেছিলাম। খুব যত্ন করে। যদিও দামি ফুলদানিতে সাজাতে পারি নি, তবুও রেখেছিলাম, এবং একটি চুমুও খেয়েছিলাম।

ইপুর পড়া হয়ে গেছে। মাষ্টার সাহেব বাইরে এলেন। জুলেখার ছোটভাই খালিদ মাষ্টারকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। খালিদ আমাকে খুব ভাল করে চেনে। এই একুশি ধরা পড়ে যাবো, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দাঁড়ালাম। মাত্র কয়েক হাত দূরে, খালিদ মাষ্টারকে সালামুআলাইকুম জানাল। এখন যদি আমায় দেখতে পায়, তাহলে একটু হাসবে। বাসায় গিয়ে নিশ্চয়ই বলে দেবে যে জাহেদ ষ্ট্যাভে দাঁড়িয়ে আছে। তখন সবাই অদৃশ্য হয়ে আমাকে করুণা ও বিদ্বেষ করবে। ভাগ্যিস, আগে থেকে খালিদের আসা টের পেয়েছিলাম। খালিদ চলে গেল। বাওয়ার সময় বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলাম বলে বাসের জন্যে আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। সত্যি একটা বাস আসছে। তাহলেও এখনই আমাকে কেটে পড়তে হয়। কেটে পড়লাম। সোজা হনহন করে রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটছি, আর পেছন ফিরে চাইছি। বাসটা কখন এই ষ্টপেজে এসে থামে এবং রওনা দেয়। সাঁকোটা পার হতে না হতেই বাস এসে গেল। লোক নামাল। তুলল। আবার আমাকে পেছনে রেখে চলে গেল।

ফিরে এলাম আমি। ভাবছি চলে যাব। এমনি প্রায়ই ইপুর কণ্ঠ তনি, রেখাকে দেখি, খালিদ বারান্দায় এসে পায়চারি করে যায়, অথচ জুলেখাকে একটি বারের জন্যেও দেখতে পাইনে। আমার পরাজিত আমিকে, দেখতে না পাওয়ার সম্ভাবনার চলে যেতে বলেও, সহজে বাওয়াতে পারি নি। ভাবছি, আর পাঁচ মিনিট পরে হেঁটেই চলে যাব।

জুলেখাদের বাড়ির অপর পাশ থেকে একটা রাস্তা উঠে এসে বড় রাস্তার সাথে মিশিছে। সেটা দিয়ে একটা জীপ আসতে দেখলাম। জীপের হেড লাইট পড়েছে ঠিক বারান্দার ওপর। দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে বারান্দাটা।

আপনারা আমাকে যে সন্দেহ করেন নি, তার কারণ, আমি কোন সন্দেহজনক আচরণই করিনি। আমি, এই দেখুন, সম্পূর্ণ ভাল মানুষ। স্বাভাবিক, সহজ সরল অবস্থায় তাকিয়ে রয়েছি বারান্দার দিকে। বারান্দায়, আপনিও দেখুন, লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরা যে মেয়েটি, সে জুলেখা। পায়চারি করছিল বারান্দায়। হঠাৎ চোখে-মুখে আলো পড়ায় থমকে দাঁড়িয়েছে, দু'তিন সেকেন্ডের জন্যে। আমি স্পষ্ট করে দেখলাম, ওর ষোঁপায় একটা সাদা ফুল গোঁজা রয়েছে। ঠিক ওটা রজনীগন্ধা হবে। সুন্দর করে পেচিয়ে শাড়িটা পরেছে। পরিপাটি করে চুলগুলো আঁচড়িয়েছে। আমি কোন ভুলই করছিনে। সত্যি ও সূর্যমুখী। আমি যদি এখন চিৎকার করে ডাক দিই, ও হয়ত ফিরে তাকাবে। চিনবে আমাকে। বুঝতে পারবে আমার কণ্ঠস্বর। কিন্তু দাঁড়াবে না। দ্রুত চলে যাবে। অপরদিকে রাস্তার লোকগুলো আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে। সদুত্তর পাবে না। আর, অবশেষে আচ্ছা করে মার লাগাবে। আমি মোটেই অপ্রকৃতিস্থ হই নি। আমি দেখছি, জুলেখা আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর চলে গেল। আমি ছুটে যেতে চাইলাম ওর কাছে। কিন্তু তক্ষুণি মনে পড়ল, ঐ লোহার গেট। ছুটেই যাই আর ধীরে সুস্থেই যাই, আমাকে ওটা পার হতে হবে। আমি পার হব ঠিকই। কিন্তু ওরা যে আবার আমাকে গেটের বাইরে রেখে যাবে!

বিশ্বাস করুন, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে। সূর্যমুখী চলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই, আমার অনুভূতির অনুসরণ করে ঐ দরোজা দিয়েই যে বেরিয়ে এল, সে সূর্যমুখী নয়। তার অনেক বয়স। বার্দ্ধক্যে এসে পৌঁছেছে। মাথায় তার রজনীগন্ধা ফুল নেই। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। মুখে বহু অভিজ্ঞতার ছাপ। আমার মা। আমার মা, যার গর্ভে আমার জন্ম হয়েছে। আমার জননী, যে আমাকে বড় করে তুলেছে, কথা বলতে শিখিয়েছে, হাঁটতে শিখিয়েছে, জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছে। যার কাছে আমি পেয়েছি অপত্য স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা। তবুও তুমি মা প্রেমময়ী। তুমি কয়েক দিন আগে আমার উপর মুখ করেছিলে। আমি রাগ করেছিলাম। ভাতও খাই নি। আর তার জন্যে তুমিও রাতে কেঁদে কেঁদে না খেয়েই ঘুমিয়েছিলে। আজ যদি এই বুড়ো ছেলে তোমার কোলে ওঠে লাফিয়ে, তুমি বলবে—‘যা দুষ্ট।’ ঠিক নামিয়ে দেবে কোল থেকে। কিন্তু বলবে—‘পাগলা।’ অথচ জানো মা, এখন যদি তুমি আমায় বুকে করে রাখো, তবে আমি ঠিক হারিয়ে যাবো। এই দেখোই না। আমি তোমার অস্তিত্বে ও সত্যায় বিলীন হয়ে যাচ্ছি। আমার এই দেহের দৈর্ঘ্য প্রস্থ যেন আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে আসছে। আমি ক্রমশই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছি। একসময় আমি বাতাসে মিলিয়ে গেলাম। আমি এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছি। আমি রাতের আকাশের সূর্যের সাথে খেলা করছি। কাল আমার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তুমি দেখেই নিও মা!

একটি সত্যি অথবা মিথ্যে গল্প

মূল গল্প শুরু করার আগে আমি একটা ভূমিকা দিতে চাই।

সাইকেল থেকে নেমে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় আড়াইটে বাজে। অফিস ছুটি হয়েছে দুটোয়; অফিস থেকে বাড়ি আসতে বড় জোর দশ মিনিট লাগে। পথে আড্ডা দিলাম কিছুক্ষণ; যখন সাইকেলে উঠলাম, তখন ক্ষিদেয় পেট আমার একান্ত পরিচিত। বাড়ি ঢুকে আর সব দিনের মত চিৎকার করে ডাক দিলাম ছোটবোনকে,

নীনা, গোসলের পানি দে।

নীনা রান্নাঘর থেকে বাইরে এল, হাসিমুখে নয়, গম্ভীর। আর সব দিনে বলত—
বাথরুমে পানি তোলা আছে, অথবা এই দিচ্ছি। কিন্তু সেদিন কোন জবাব নেই, গম্ভীর হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি এগিয়ে গেলাম রান্নাঘরের কাছে। ফিরে আসতে হল। রান্নাঘরের দরোজার কাছে দেখলাম একটি মেয়ে। সাদা শাড়িতে ঝয়েরি ফুলের ছাপ, মাথায় ঘোমটা। মুখ দেখতে পাইনি মেয়েটার। চট করে মনে হল, ও নয়তো? কয়েকদিন আগে, মার সঙ্গে দেখা করতে আসবে কথা দিয়েছিল। অনুমান করলাম, নীনা আসলে অভিনয় দেখাচ্ছে। আমাকে হঠাৎ চমকে দেবে এমন একটি ভাব মুখে মুখে নিয়ে অমন গম্ভীর হয়ে আছে। নীনা তখনও চুপ। একটু পরে মা উঠে এলেন। আশ্চর্য, মার মুখও গম্ভীর। অবাক হলাম সত্যি সত্যি। তাড়াতাড়ি বললাম,

মেয়েটি কে মা?

আমার বলতে ভয় করছে।

কেন?

তুই যদি রাগ করিস।

বলই না।

মা তারপরে গল্প শুরু করলেন ধীরে ধীরে, পূর্ণ সমবেদনার সাথে। মার গল্পই মেয়েটার গল্প। পরে আমি মেয়েটিকে আরো কিছু কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার আগে মূল গল্পটা বলি।

“আমার বাড়ি দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলায়। জন্ম হয়েছে কোথায় জানি নে, আমাকে জানতে দেয়া হয় নি। প্রয়োজনও বোধ করি নি, কেননা যাদের সাথে থাকতাম, তারাই যখন আমার মা বাবা ভাই বোন, তখন তাদের জন্মস্থান যেখানে,

আমারও সেখানেই হবে। কোনদিন কোন প্রশ্নই মনে জাগে নি, আমার জন্মবৃত্তান্ত আমাকে আবার জানতে হবে, মানুষকে বলতে হবে সামান্য একটু সহানুভূতির জন্যে, সাহায্যের আশায়, আশ্রয়ের কামনায়।

ছোটবেলা কেটেছে কোলকাতায়, বড়ও হয়েছি সেখানে। পড়াশোনা করতাম স্কুলে। আমরা ছিলাম পাঁচ বোন এক ভাই। ভাই বড়, বোন ছোট। বাবা খুব আদর করতেন আমাদের। কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট বুঝতে পারি নি, কোলকাতার মত জায়গায় যা কিছু নিয়ে সুখে স্বাস্থ্যে থাকা যায়, তার কোনটিরই অভাব ছিল না আমাদের। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। ভাইকেও তাই করলেন। শুধু তাই নয়, বিলেত পাঠালেন বাবা। লক্ষ করলাম, ভাইকে বিলেত পাঠিয়ে বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন। মা আর বড় আপাকে বলতেন,

কাজটা আমি ভালো করলাম না। আমার মনে হয়, ওর ওখানে গেলে কিছু হবে না, এখানে থাকলেই পারত।

আমি তখন অতশত বুঝতাম না; তবে ভাবতাম, বিলেত যাওয়া তো খুব গৌরবের কথা, আনন্দের কথা; তবে বাবা অমন করেন কেন? এই ধারণা শেষ পর্যন্ত বাবাকে কোলকাতা ছাড়তে বাধ্য করল। একমাত্র ছেলের চিন্তায় তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। কাজকর্ম ঠিকমত করেন না, উপার্জনের দিকে খেয়াল নেই, কেবল মাকে বলতেন,

চল, দেশে চলে যাই। আর নয় এই বিদেশে পড়ে থাকা।

বাবার আচরণ দেখে আমার কেমন যেন ভয় করত। বড় বেশি কাছে যেতাম না। অথচ, বাবা আমাকেই কাছে ডাকতেন বেশি, আদর করতেন খুব, আর মাঝে মাঝে বলতেন,

আমি মরে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে, না রে?

বাবা 'তোদের' বলতেন না, শুধু 'তোর' বলতেন কেন, তা আজ বুঝতে পারছি। অথচ এই সত্যটা যেদিন প্রথম জানলাম, সেদিন মরার কথা চিন্তা হয়েছিল, কিন্তু এদের সকলের স্নেহ ভালবাসা সবকিছু উপেক্ষা করে মরতে নিজেকে বড় স্বার্থপর মনে হল। অথচ আজ আমার বেজায় মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমি বাঁচতে চাই, পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার আমার আছে, সেই জন্মগত অধিকারকে আমি নিজেই যদি বিসর্জন দেই, তাহলে আমার মত আরো কতজনকে তো মৃত্যুবরণ করতে হয়। এই সুন্দর পৃথিবী, এখানকার আলো, বাতাস, লোকজন, সবই আমার পরিচিত; তবুও কেন আমার আশ্রয় ছুটবে না, তাহলে কি বলবো আল্লার অস্তিত্ব মিথ্যে?

দেশে চলে এলাম। জানলাম, আসলে এইটাই আমাদের আদি বাসস্থান। কিন্তু দেশে আসা আমার পক্ষে যে কতখানি ভয়াবহ ও দুঃখজনক হয়ে উঠল, যা সারা জীবন কেঁদে কেঁদে বললে গল্প শেষ হবে অল্পক্ষণেই, কিন্তু চোখের পানি ফুরোবে না। কান্না-ধুসার তনতে পেলাম, আমি পালিতা মেয়ে। বিশ্বাস করি নি। কিন্তু যে কথাটা প্রায়ই আমাকে তনতে হয়, সে কথাটার সত্যতা কতখানি প্রমাণ করবার জন্যে বাবাকে বললাম,

বাবা, আমি নাকি পালিতা মেয়ে?

কে বলেছে রে?

কেন ওরা বলে।

খবরদার আর মুখে আনবি না এ-কথা।

বাবার কথা বিশ্বাস করলাম। ভাবলাম আদর করে তো নিজের ছেলেমেয়েকে বলে—তাকে মাটি খুঁড়ে পেয়েছি, রাস্তায় পড়ে পেয়েছি, এক ভিথিরির সন্তান তুই, এমনি কত কি। ভুলে যেতে চাইলাম আস্তে আস্তে। ইতিমধ্যে মা মারা গেলেন। ভাইয়ের তখন বিলেত থেকে আসার সময় হয়েছে। বাবা খবর দিলেন, ভাই সে খবরের কোন জবাবই দিলেন না। বাবা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যেতে লাগলেন, সারাদিন প্রায় বাসায়ই থাকেন, শুয়ে বসে কাটান। আবার সেই কানাঘুষা, আমি পালিতা মেয়ে। একদিন প্রায় মরিয়া হয়ে বাবাকে বললাম,

বলতে হবে আপনাকে আমি কে? আমার পরিচয় কি?

বাবা জবাব দিলেন না সেবার, দু হাতে মুখ ঢেকে কেবল কাঁদলেন। বুঝলাম, আসলে সত্যি তিনি বলতে চান না। তাহলে মা বলেন নি কেন? পরে জানলাম, মাকে বাবা শাসিয়ে রেখেছিলেন, বললে নাকি নিস্তার নেই। ভাগ্যিস, যাকে মা বলে জেনেছি, তিনি আগেই মারা গেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম কৈ?

আমি আর আগের মত হাসিখুশি থাকতে পারি নে, কেবল মুখ গুঁজে কাঁদতে ইচ্ছে করে। সমবয়সী মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করে মনটা পাতলা করে নিতে বসে কেবলি মনে হত, ওরা যদি আমাকে পরিচয়হীন বলে খেলতে না নেয়? শান্তি পাইনে, সবকিছু নিরর্থক মনে হয় আমার কাছে।

এমন সময় ভাই এলেন বিলেত থেকে। বাবা যে আশঙ্কা করেছিলেন তাই হল। ভাই ওখানে গিয়ে কিছুই শেখেন নি, টাকাপয়সা উড়িয়েছেন ইচ্ছে মত, মদ খেয়ে মেয়েদের নিয়েই সময় কাটিয়েছেন। বাবা ভাইয়ের এই পরিবর্তন ঘটবে তা আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন কেমন করে? নিজের মনে কি আগে থেকেই এই বীজ বোনা ছিল? তাহলে আমার পরিচয়? আমার চিৎকার করে গলা ফাটাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু গলার চার দেয়ালের মাঝে সে চিৎকার ঘুরে কখন যে মরে যেত, টের পেতাম না। বড় দুই বোনের বিয়ে হল, বাবা অনেক খরচ করে ঘটা করে বিয়ে দিলেন ভালো ছেলে দেখে। বোন দুটো চলে গেল স্বস্তর বাড়ি। এখন বাড়িতে বাবা, ভাই, আমিও ছোট বোন দুটো। ভাইয়ের কোন পরিবর্তন হল না, এখানেও দিনরাত মদ খেয়ে মেয়েলোকের পেছনে পয়সা খরচ করে সময় কাটান। ভাইও যদি ভাল হত, তাহলে অন্তত আমাকে আজ এই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হত না।

বাবার প্যারালিসিস্ হল, আর আমার জীবনে বইল দুঃখের ঝড়। বেশ বড় হয়েছি, লেখাপড়াও শিখেছি কিছু। কিন্তু ম্যাট্রিক দেওয়া হল না। আজ অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ থাকলেও কিছু না কিছু করে বাঁচা যেত। আজ নিজের এমন কিছু নেই যা দিয়ে নিজের উপার্জন নিজে করতে পারি। বাবার প্যারালিসিস্ হওয়ার সংবাদ

পেয়ে বড় আপা এলেন তাঁকে নিতে, তিনি নিজের তাঁর চিকিৎসা করাবেন। বাবা তখন উপায়হীন, ছেলের আশ্রয়ে থাকা তাঁর ভাগ্যে নেই, তাই মেয়ের বোঝা হয়েই তাঁকে জামাইবাড়ি যেতে হল। যাওয়ার সময় আমাকে বললেন,

মা তোকে এতবড় করেছি, কিন্তু কর্তব্য এখনো শেষ করতে পারি নি। বিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না আমার পক্ষে। তোর ভাইও যে তোকে বোনের মত দেখবে বিশ্বাস হয় না। তুই চলে যা।

বাবা এ কথাগুলো বলার সময় কাঁদলেন না, কিন্তু গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকমের ভারি। বাবার অমন গম্ভীর কণ্ঠ আমি কোনদিনই শুনি নি। আমার কান্না দেখে তিনি সান্ত্বনা দিলেন না, কিছু বললেন না, শুধু কুড়িটি টাকা হাতে গুঁজে দিলেন,

এই আমার হাতে এখন আছে, যা হয় এই দিয়েই করিস। আল্লার হাতেই তোকে তুলে দিলাম।

আমাদের ওখান থেকে এখন দুটো মেয়ে ঢাকায় আসছিল। আমার পরিচিত ওরা, একই পাড়ায় বাড়ি। অনেকদিন খেলেছি ওদের সাথে, অনেকটা ছেলেবেলার বন্ধু। ওরা ঢাকাতেই থাকে এখন, কয়েক বছর আগে এসেছে, চাকুরি করে দু'বোনই। বড় বোন গীতা, ছোট বোন সীতা। দু'বোন বলল,

চল, ঢাকায় তোকে আমরা চাকুরি জুটিয়ে দেব। আশ্রয় পেলাম যেন, নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে খুব খুশি হয়ে গীতার সঙ্গে চিমায়ে যখন চেপে বসি, তখনও বুঝতে পারি নি; এই আমার জন্মভূমি, তোমার কাছে আমার আর কোনদিন ফিরে আসার সুযোগ হবে না, অধিকার থাকবে না, তুমি আমাকে জন্ম দিয়ে কলঙ্কের বোঝা বাড়ালে শুধু।

ঢাকায় পৌঁছলাম দুপুরে। উঠলাম কোন এক পাড়ায়, তার নাম আমার জানা নেই। আমি জানতে চেষ্টা করেছি সেখানকার ঠিকানা ওদের কাছে, কিন্তু ওরা কোনসময়েই বলেনি। উলটে বলেছে,

ঠিকানা জেনে লাভ কি, আমাদের সঙ্গে আছিস, সেটাই জানা থাক। বেশি কিছু জানতে চাস না।

ভালো লাগত না ওদের কথাবার্তা। এক বেলার মধ্যেই গলার স্বর এমন পাল্টে যাবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সেইদিন বিকেলেই এক ভদ্রলোক এলেন, গীতা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল,

আমার সবুর ভাই। আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন, আপন ভাইয়ের মতো আদর করেন।

বিশ্বাস হলো না, কোনদিনও এদের এমন ভাই-এর নাম শুনি নি। এ আবার কোথেকে এল! মুখে কিছু বলতে সাহস পাই নি। কিন্তু ভীষণ ভয় করতে লাগল। তবে কি গীতা সীতার অধঃপতন ঘটেছে? আমার অনুমান মিথ্যে নয়। ওরা আমাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইল। আমি রাজি হই নি। এর ফল ফললো রাতে। সবুর, গীতা ও সীতা আরো তিন চারজন লোক নিয়ে বাসায় এসে মদ খাওয়া শুরু করল।

আর, ভাবতেও কেঁপে উঠছি, মানুষ কত নিচে নেমে গেলে এত বিশ্রী ও জঘন্য আচরণ করতে পারে। এ আমি কোথায় এলাম, এর চেয়ে আমার জন্মভূমিতে মাথা খুঁড়ে মরলেও শান্তি ছিল। কিন্তু কি করি! উপায় কি। ভাবতে পারছিলাম না, কাঁপছিলাম থর থর করে। গীতা এসে বলল,

আয়, আমরা যা করি তাই তোকে করতে হবে।

না, আমি তা পারব না।

ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

আচ্ছা অপেক্ষা কর।

ঘরে গিয়ে আমি সাজগোজ করতে লাগলাম। গীতা বুঝল, আমি সেজে গুজে ঠিকই আসবো। ওরা তখন মদ খেয়ে বৃন্দ হয়ে এসেছে। সেই ফাঁকে আমিও এক দৌড়ে পালিয়ে এক বাড়ি গিয়ে উঠলাম। চিনি না, জানি না, কিছু আশ্রয় মিলতে পারে, এমন একটি বাড়ি গিয়ে দরোজায় ধাক্কা দিতে এক বুড়ি দরোজা খুলে দিল।

এইখান থেকে আমার জীবন আরেকটি বাঁক নিল। বিশ্বাস এল, পৃথিবীতে তখনো ভালো মানুষ আছে, এবং এ জন্যেই দুনিয়া যথানিয়মে চলছে। বুড়ি সব গুনল আমার কাছে। আশ্রয়ও দিল। ভয় তখনকার মত কিছুটা কমলেও নতুন করে ভয় হল, কদিন রাখবে এই বুড়ি। এক সময় না একসময় বিরক্ত তো হবেই, তখন আবার আমি দাঁড়াবো কোথায়? কি করলে বুড়িকে খুশি করা যায়। সকালে দেখলাম, বুড়ির উপার্জনের পথ কাটা-কাপড় সেলাই করে পারিশ্রমিক নেওয়া। আমার সেলাইয়ে ডিপ্লোমা আছে। মন প্রাণ দিয়ে খেটে বুড়িকে খুশি করার কাজে লেগে গেলাম। তবুও ভয়, ওরা যদি আমাকে আবার ধরে নিয়ে যায়? কিংবা বুড়ি বের করে দেয়? আমি ভাবতে পারি নে, আমার সমস্ত চেতনা লোপ পেতে চায় একসঙ্গে। হা খোদা, তুমি তামাশা দেখ, আর আমি কিনা তার শিকার। মনে হয়, এ আমার ব্যর্থ আর্তনাদ বা প্রতিবাদ, কার কাছে জানাব এ কথা। আত্মা তো নিজে এসে আমায় আশ্রয় দিয়ে যেতে পারে না। মানুষ যদি তামাশা দেখে মজা পায়, তাহলে দশচক্রে আত্মার ভূত হতে কতক্ষণ?”

মেয়েটির দীর্ঘ জীবন ইতিহাসের এইটুকু আমরা পেয়েছি। লক্ষ করলাম মা আর নীনার চোখমুখ বেশ ভারি। স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে, এরা কেঁদেছে মেয়েটার সাথে। বললাম,

মেয়েটি কতক্ষণ এসেছে?

গোটা দশকের ওদিকে। পাশের বাসার ভদ্রলোক পাঁচটা টাকা দিয়েছেন।

মেয়েটি কি সাহায্য চাইতে এসেছে?

না, একটা চাকুরি চায় মেয়েটি।

চাকুরি!

বুঝতে পারলাম আবেদন উঁচুদরের। তাহলে কি মেয়েটি সত্যি অভাবে ও বিপদে পড়েছে? হবে হয়তো। নচেৎ এমন একটি করুণ কাহিনী শুনিয়া কিছু সাহায্য চাইতে পারতো। চূপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। মা বললেন,

মেয়েটিকে ডাক দেই?

দাও।

ধীরে ধীরে মেয়েটি এল। ধারণা ছিল বেশ বয়স্ক হবে। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়, বয়স এখনো কুড়ি পার হয় নি। চিন্তা-ভাবনায় বয়স কিছুটা লাফিয়ে বেড়ে গেলেও সৌন্দর্যের সীমারেখা পার হতে পারে নি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা, মাথার কাপড় দিয়ে থাকার জন্যে চুলগুলো কোন সময়েই দেখতে পাই নি। হাতে একটি ছোট বাগ। এমন একটি মেয়ে পথে বেরুতে পারে, এটা ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠল। মেয়েটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলাম,

আপনার নাম কি?

শাহানারা বেগম।

বাড়িঘরের কথা যা যা শুনলাম তা সব ঠিক?

জি।

আপনি এখন কি করতে চান?

যা পাই, তাই করবো। এখন মাথা গুঁজবার মত একটা ব্যবস্থা চাই শুধু।

চাকুরি হলো তো পেট চলবে, থাকবেন কোথায়?

মেয়েটি অসহায়ের মতো মুখের দিকে তাকাল। মুখটা শুকনো, চিন্তা ভাবনায় চেহারা অনেকটা পাংগু হয়ে এসেছে। হঠাৎ মনে হল মেয়েটি যে কাহিনী শোনাল, এর কতটা সত্য? মেয়েটি অভিনয়ে যে পারদর্শিনী নয় তাই বা কে বলবে? তাহলে কি উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছে? এই অবস্থায় টাকা পয়সা না চেয়ে চায় চাকুরি ও আশ্রয়। আশ্রয় দিলে আমার কোন ক্ষতি করবে না তো? আমার যদি পরিবারের সম্মান নষ্ট হয় তাতে? অনেকগুলো চিন্তা ঘুরে ঘুরে অনবরত পাক খেতে লাগল আমার মনে। কিছু জিজ্ঞেস করতে মুখের দিকে তাকাতেই দেখি, মেয়েটির চোখে পানি, স্যাভেলের আগা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। জেরা করতে সাহস হল না। তার চেহারা ও অভিব্যক্তিই যেন তার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে দিচ্ছে। মেয়েটি বলল,

আপনি আমার বড় ভাই, আমাকে বাঁচান। আবার কবে আসবো বলুন।

প্রতিটি শব্দে ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা। বললাম,

শুক্রবার দিন আসবেন, আপনার জন্যে আমি চেষ্টা করব।

ঘরে এলাম, নীনাকে ডেকে চারটে টাকা দিলাম মেয়েটিকে দিতে। দরোজার বাইরে থেকে মেয়েটি সালাম জানিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

মেয়েটির গল্প এবং আমাদের ভূমিকাসহ কাহিনী এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু পরে যেভাবে গড়িয়েছে তাতে মেয়েটির কোন ভূমিকা নেই; তার চরিত্র আমরা, আপনারাও বাদ পড়েন নি। আর এর ফলটা যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে আমরা সভ্য, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও বিংশ শতাব্দীর মত সভ্য শতাব্দীতে আমাদের বাস। আশ্চর্য

এ যুগের মানুষ; মজা দেখবে, তামাশা দেখবে, অন্যের দুঃখকে খেলার সামগ্রী
হিসেবে পেতে চাইবে। প্রথমে কথা তুলল নীনা,
দাদা, আপনার সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেই।
তা মন্দ নয়, আমার সঙ্গে মানাবে ভাল।

মা বললেন,

এমন একটি মেয়েকে আশ্রয় দেওয়া তো পুণ্যেরই কথা।

মার বিচার পাপ-পুণ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে।

রসিকতায় মেতে উঠলাম আমি আর নীনা—মেয়েটিকে বিয়ে করলাম, সে আমার
বৌ হল, এমনি কত কি। আমার এমন একটি অপ্রত্যাশিত বিয়েতে একজন বললেন,
বিয়েতে যখন খরচ লাগবে না, তখন মামলার টাকাগুলো জোগাড়
করে রেখো।

ভয়াবহ সাবধান বাণী। আমি মেয়েটির জন্যে চেষ্টা করেছিলাম, সবাই হাসে।
আমার চেষ্টা দেখে, আপনারা যদি মনে করেন আমি মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছি,
তা হলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি, কেননা আপনাদের ছেড়ে যাবো এতটা সুস্থ মানসিকতা
আমার নেই, হলে আমার যুগকে অপমান করা হয়। যথারীতি বাড়ি ফিরে এসে এ
কাজে ও কাজে ডুবে যাই, হঠাৎ মনে হলে মেয়েটিকে আমার বৌ বানাই, তারপর
মনে অজান্তেই কখন ভুলে যাই জানি না। কেউ দিল না আশ্রয়, আমিও না।

মেয়েটি শুক্রবারের দিন ঠিকই এসেছিল। ভেবেছিলাম আসবে না। তার ব্যবসাই
যখন ওই করুণ কাহিনী শুনিয়া টাকা উপায় করা তখন পাশাপাশি দুই বাড়ি থেকে
যখন নয় টাকা উপায় হয়েছে তখন যথেষ্ট। কিম্বা যদি আমরা পুলিশে খবর দিয়ে
রাখি! এই ভয়েও মেয়েটি আসবে না, এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে গুনলাম
মেয়েটি সকাল থেকে বসে ছিল। নীনা মিথ্যে করে বলেছে,

দাদা রাত্রে ওদিকে আসবেন, অতক্ষণ থাকতে পারবেন?

আমার সঙ্গে দেখা করে রাত্রে ফেরা মেয়েটির পক্ষে সম্ভব নয়। মেয়েটি বুঝতে
পেরেছিল। বলেছে,

আবার করে আসবো?

আসবেন আরেক দিন।

সে কথায় কোন আন্তরিকতা ছিল না। একটা জবাব না দিলে নয়, তাই দিয়েছে
নীনা।

মেয়েটি আর আসে নি।

আমরা এখনো মেয়েটিকে নিয়ে রসিকতা করি।

একটি অভদ্র ভদ্রলোক

আমার পাশে জনৈক ভদ্রলোক। পেছনের সিটে একজন পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির পাশের সিটে দুজন লোক। বন্ধুটুকু হবে। সামনে একটি ইংরেজ দম্পতি। আমাদের কোণাকুণি আরেকটি দম্পতি। বাঙালি। আরো অনেকেই আছি। যাক্ছি করাচী।

আমার পাশের ভদ্রলোকটি বছর পঁয়ত্রিশের। বিচিত্র পোষাক তার। পরণে প্যাণ্ট, গায় লাল টকটকে জামা ও মাথায় জিন্মা টুপি। সিটে বসে আশা করেছিলাম হয়ত কোন সঙ্গিনী, নচেৎ কোন, অন্তত আলাপি বন্ধু। আর যা হোক পথটা গুল্লে কাটানো যাবে। বিরক্তই হয়েছিলাম, অমন একজন পার্শ্ববর্তীকে পেয়ে।

খুলি খুলি চোখ মেলে লোকটি তাকাল আমার দিকে। খুঁটে খুঁটে দেখল। হঠাৎ করেই আবার নিচের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠল, চমৎকার। আশেপাশের সবাই লোকটাকে এক দৃষ্টি দেখে নিল। চমৎকারই বটে। প্রেনে চড়ে বাংলাদেশের সৌন্দর্য দেখা সে এক অপূর্ব জিনিস। কিন্তু চমৎকারিত্ব অমন চিৎকার করে প্রকাশ করতে হবে, সেটা অভদ্রতা। লোকটির অতসবে ক্রম্বেপ নেই। আবার আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল,

বাড়ি কোথায়?

পাৰনা।

যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

করাচী।

কে আছে?

বন্ধু।

বন্ধু!

ঐ কুঁচকে গেল তার। আবার স্বাভাবিক হল।

ও, নাম কি?

রশীদ হায়... ..।

‘দার’ বলার সুযোগ আমি পাই নি। নিজেকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সমস্ত প্রেনটা এক রকম কাঁপিয়ে তুলে চিৎকার করে উঠল লোকটি,

শাট আপ ইওর মাউথ।

চমকে গেছি আমি। চমকে গেছে সবাই। এয়ারহোস্টেস ছুটে এল। ট্রেন হলে
পথের মাঝে থামান যেত। প্রেন চলছে। হোস্টেস এসে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই
লোকটা মাথাটা নিজের হাঁটুর ভেতর নিয়ে গেছে। কারো মুখে কথা নেই। একটু
পরেই লোকটি মুখ তুলল। তুলেই বলল,

না, তুমি কি অন্যায় করেছ।

অবাক হয়ে গেলাম। মিনিট দশেকও যায় নি। এরই মধ্যে 'তুমি' সম্বোধন!
বিশ্বয়ের ভাবটা কাটিয়ে উঠবার আগেই লোকটি বলল,

আমাকে প্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পার?

বলে কি লোকটা! কত হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছি জানি না। এখান থেকে
নিচে পড়লে ও লোকের অস্তিত্ব থাকবে কোথায়! উদ্ভট অনুরোধ। বুঝতে পারছি
লোকটি একটি আস্ত পাগল। লোকটিও বুঝতে পেরেছে আমি ওকে পাগল ঠাউরেছি।
একটু হেসে বলল,

আসলে পাগল লোকগুলোই আমাকে পাগল বলে। এই দেখ আমি
ঠিক ভাল মানুষ। এটা আমার ডান হাত, এটা বাম হাত, এখন ঘড়িতে সাড়ে তিনটে
বাজে। দেখ সব ঠিক ঠিক বলে ফেলছি।

লোকটি যে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা পাগল তাতে কোন প্রকার
সন্দেহ নেই। কিন্তু পাগলই হোক আর যাই হোক আমার নাম শুনে অমন বিকট
চিৎকার করে উঠল কেন সে। একটি প্রশ্ন আমাকে খোঁচাচ্ছে তখন থেকে। ইতিমধ্যে
লোকটির প্রতি আমার সমবেদনা জেগেছে। আমি উপলব্ধি করছি আমার নামের
সাথে এর জীবনে নিশ্চয়ই কোন ঘটনা জুড়ে আছে। সাহস পাচ্ছি নে, জিজ্ঞেস করতে।
আরেকবার অবাক হওয়ার পালা আমার। আমার মনের কথা ঠিক ধরতে পেরেছে
সে। বলল,

নিশ্চয়ই তুমি আমার প্রথম ব্যবহারের কথা ভাবছ?

অস্বীকার করতে পারলাম না আমি। সে বলে যেতে লাগল,

জানো, আমি রশীদ নামের কোন লোককে দেখতে পারি না।

তা হলে আমাকেও...

হ্যাঁ, তোমাকেও দেখতে পারা উচিত নয়। কিন্তু পাশেই যখন বসে রয়েছ।

কেন সামনে গেলেই পারেন।

দৃষ্টিতে অমন তীব্রতা থাকতে পারে আমার জীবনে ওটাই প্রথম দেখা। টের
গেলাম, নিজেকে সংযত করল লোকটি। একেবারে খাদে গরা নামিয়ে বলল,

দেখোতো পেছনে সিট খালি আছে নাকি?

না।

থাক এ-সিট ও-সিট করা অভদ্রতা।

এ বোধটুকু যে লোকের আছে সে কেন যে নাম শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সেটাই তো বুঝিনে।

সিমেট ধরাল লোকটি। আমাকে দিল একটি। হা হা করে হেসে উঠল হঠাৎ এবং বলল,

জানো যেদিন আমি প্রথম সিগারেট খেতে শিখি, সেদিন সিগারেট ধরাতে গিয়ে আমার গৌফ পুড়ে গিয়েছিল। কি বিশ্রী দেখা যেত!

হ্যাঁ গৌফ পুড়ে গেলে হাসির কথাই অবশ্যি। কিন্তু অমন হা হা করে হাসার কোন কারণ থাকতে পারে। সারল্য আছে এ হাসিতে, তাই অমন প্রচণ্ড ধমকের পরেও আমার সমবেদনা জেগেছে লোকটির প্রতি। আমার প্রশ্ন,

ঠিক তোমার কৌতূহল বাড়ছে, তাই না?

আপনি বুঝলেন কি করে?

চাল কলা দিয়ে এম, এ পাশ করি নি।

গর্বের হাসি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

তা না হয় না করলেন। কিন্তু আমার মনের কথা জানতে হবে
ভেমন ...

সাইকোলজির নাম শুনেছ?

অবশ্যই।

সেইটে ছিল আমার সাবজেক্ট। কিন্তু...।

সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। পোড়া কাগজের মত কুঁকড়ে এল তার সারা শরীর।
মিনিট কয়েক পার হয়ে গেছে। আন্তে আন্তে বলল,

মাষ্টার ডিগ্রি নিয়েও একটি লোককে আমি চিনতে পারি নি।

আন্দাজ করেছিলাম এমনই একটা কিছু হবে। তবুও জিজ্ঞেস করলাম,
তবে কি...

শেষ করতে দিল না আমার প্রশ্ন। পান্টা প্রশ্ন করল,
বিয়ে করেছ?

না।

কটা বন্ধু জোগাড় করেছ?

তা প্রায় ঢেরগুলো হবে।

কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই তো?

চমকে উঠলাম আমি। কিন্তু লোকটি জবাব দেবার সুযোগ ছিল না।

আসলে জেনো, পৃথিবীতে নিজের চেয়ে বড় কেউ নেই।

এটা তো বহু পুরনো কথা।

তাই সবাই ভুলে বসে থাকে।

আপনি ভুলে গিয়েছিলেন বুঝি?

তুমি কেমন করে বুঝলে হে?
আপনিই তো বলে দিলেন।
মিথ্যে কথা। কোন সময় বলি নি।

প্রতিবাদ করার সাহস হল না। তবুও জিজ্ঞেস করলাম,
কৈ সেই কথাটা বললেন না তো?
কোনটা?

ঐ যে আমাকে ধমক দিয়েছিলেন।

লোকটি চেপে ধরেছে আমার হাত। শক্ত করে। আঙ্গুল দিয়ে বুঝি পিষে ফেলবে
আমার হাতটা। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি আমি। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম।
পারলাম না। এক সময় লোকটি নিজেই হাত ছেড়ে দিল। বাতাস আঁকড়ে ধরতে
গেল সে। হাত দুটো মুঠো হয়ে এসেছে। বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সমস্ত শিরা-উপশিরা।
কী ধীর, শান্ত, গভীর কণ্ঠস্বর,

রশীদ নামে আমার একটি বন্ধু ছিল। অন্তরঙ্গ বললে কম বলা হয়।
বুঝতে পারো নি এখনো?

তাড়াতাড়ি বললাম,
হ্যাঁ হ্যাঁ সব বুঝতে পেরেছি।
বেশ।

কেউ কেই আপনার?
হাউমাউ করে কেঁদে উঠল লোকটি,
একটা ছেলে আছে।
কোথায়?
কোথায় জানি নে।
বেঁচে আছে?
আছে জানি।

সম্মুখের ইংরেজ দম্পতি হা করে চেয়ে রইল দুই সিটের মাঝখানে দিয়ে।
পেছনের পাঞ্জাবি ও বন্ধু গোছের লোক দু'জন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। অদূরের
বাঙালি দম্পতি ঘৃণায় চোখ মুখ সরিয়ে নিল। বললাম,
তা হলে?

মরে গেলে সংবাদ পেতাম।
বেঁচে আছে তারই বা কি প্রমাণ?

কি যে বল! এত বড় সাইকোলজিস্টের ছেলে তার পরিচয় কেউ জানে না বলতে
চাও?

এটারও জবাব আমি দিতে পারি নি। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,
আজ্ঞা আপনি করাচী যাচ্ছেন কেন?

হতবাক হয়ে সে তাকাল আমার দিকে ।

তাইতো কিসের জন্য যাচ্ছি!

প্লেনের জানালা দিয়ে দূরে বহু দূরে আকাশের কাছে প্রশ্ন করে পাঠাল, কিসের
জন্মে যাচ্ছে সে । আপন মনেই বলে চলেছে,

সিলেট থেকে চিটাগাং, চিটাগাং থেকে খুলনা কেন গেলাম? করাচীই
বা কেন যাচ্ছি?

শেষের কথাটা ধরে আবার আমি বললাম,

করাচী কেন যাচ্ছেন?

মানুষের চিংকার যত চড়া পর্দায় উঠতে পারে, ততটা জোরে চিংকার করে
লোকটি বলল,

ওকে না দেখে থাকতে পারি নে বলেই ওর পেছনে পেছনে সব
জায়গায় যাই ।

গলার স্বরটা ছিঁড়ে গেছে তার । হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে । তর্জনীটা
বাড়ানো । বিশেষ একটা কিছু নির্দেশ করা । বাঙালি দম্পতির স্ত্রীটিই তার লক্ষ্য ।

কামুকী

পাড়ার সবাই হাসে। কেউ মিট মিট করে, কেউ আলোচনায় একটা রসের সন্ধান পেয়ে হো হো করে, আবার কেউ ঘৃণায়। আমিও হাসি, সকলেই হাসে, তাই।

হাসির কারণ আছে। সে কারণ বললে, আপনাদের অনেকে হেসে বলবেন, বুড়ো বয়সে পিরীত করে বিয়ে করেছে, মাগির সখ দেখো না।

আবার কেউ কেউ সরাসরি এ কথা বলতে ছাড়বেন না, করেছে তো কি হয়েছে? আমার মানব চরিত্র সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত ক্ষীণ বলে বিরক্তি বা রাগবশত হাসবেন এই দলভুক্ত লোকেরা।

যাই বলুন, আপনাদের হাসির খোরাক আছে এতে।

সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। দেখতে সুন্দরী, স্বাস্থ্য ভালো এবং এ জন্যেই বয়সের সীমারেখা তিরিশের এদিকে টানা যায়। মাথায় চুল আছে যথেষ্ট, চোখ দুটো ডাগর ডাগর। কাজল পরলে আরো সুন্দর দেখায়। নাম রাহেলা।

রাহেলা খাতুন ওরফে রাহু ওরফে আমাদের পাড়ার প্রায় সকলেরই রাহুভাবি। তিনি বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম স্বামী মারা গেছেন যখন ভাবির বয়স আঠারো কি উনিশ। সেই সময়ের একটি ছেলে আছে তাঁর।

পাড়ার মানুষের আপত্তিই ওখানে,

হারামজাদি, বিয়ে করলিতো সেইকালে করলি না কেন? এখন তোর ছেলে বিয়ে দিয়েছিস, তোরই সামনে ছেলে-বৌ ঘুরে বেড়ায়, আর তুই কিনা আরেক পুরুষের সাথে ফটিনটি করে বিয়ে করলি?

এমন একটা কাল ছিল, যখন রাহু ভাবিকে অনেকেই আবার বিয়ে দিতে চেয়েছেন। ভাবি রাজি হন নি। পাড়ার লোকেরা রাজি না হওয়ার সম্ভোষণক একটা কারণ খুঁজে পেয়েছিল,

রাজি হবে কেন? ভাতারখাকী মাগি, স্বত্তর-শাউড়ি মারা যাওয়ার পর সয়সম্পত্তিগুলো হাত ছাড়া করতে চায় না, বুঝলে?

অকাট্য যুক্তি সন্দেহ নেই। রাহুভাবির বুড়ো স্বত্তর-শাউড়ি তখনো বেঁচে। শোকে শোকে তারা যেন পাথর হয়ে গেছেন। বুড়ো অন্ধ, বুড়ির চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে। ভাবি আমায় একদিন ডেকে বললেন,

আল্লা ভাই তোমরাই বল, আমি নাকি বুড়ো-বুড়ির সব সম্পত্তি হাত করার জন্যে রয়ে গেলাম। তুমি গিয়ে গেন্দার বৌ, আহমদের বৌকে বল, সব সম্পত্তি তারাই পাবে। এই বুড়ো-বুড়িকে টানতে হবে তাদের।

আমার এই পরিণত বয়সে এখনো স্পষ্ট মনে আছে, কেউই রাজি হয় নি; উলটে বলেছিল,

মাগির দেমাক দেখো!

অথচ রাহুভাবি কেন বিয়ে করলেন? আমাদের আড্ডায় তার কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। যুগের এমন একটি ক্রান্তিকালে আমাদের বসবাস, আমরা বিচার না করে সরাসরি রায় দেই,

রাতে উঠে যেত। ঐ জামগাছের আড়ালে নাগর অপেক্ষা করত।

ঘটনাটি মিথ্যে নয়। আমাদের পাড়ার লোকই সে, রোজই দেখি। বেশ লম্বাটে, কালো, মাথার চুলগুলি ঝাঁকড়া, চোখ দুটো লাল। দেখলে ভয়ই করে। আমি তো ছোটবেলায় তাকে দেখলে পঞ্চাশ হাত দূর দিয়ে দৌড়ে পালাতাম। মা এখনো বলেন,

ছোটবেলায় তাকে কুতুব মিয়ার কথা বললে তুই বালিশের তলায় মুখ গুঁজে রাখতি।

অথচ কুতুব মিয়ার বৌটি কিছু দেখতে মিষ্টি। আমি গেলেই কিছু না কিছু হাতে দিত; না খেয়ে কোনদিন আসতে দিত না। সেই কুতুব মিয়া আমাদের রাহুভাবির দ্বিতীয় স্বামী। আইনের চোখে, সমাজের চোখে সে অবৈধ সম্পর্কে রাহুভাবিকে বিয়ে করেছে।

ঘটনাটি কি কেউ টের পেয়েছিল? পেয়েছিল রাহুভাবির পুত্রবধূ, জামালের বৌ। সে বলে নি, কাউকে না। সেদিন যদি কোনক্রমে কথাটা কারো কানে তুলে দিত, তাহলে মাতব্বর সাহেবের কানে যেতই, ব্যবস্থাও হত একটা। কেউই জানে না, রাতের অন্ধকারে একটি তিরিশোস্তর স্বামীহীনা মহিলা উঠে যায় আরেকটি পুরুষের কাছে। পাশের ঘরে তার পুত্র ও পুত্রবধূ রয়েছে; লাজ, ভয়, মান-সম্মান সম্পর্কে কোন ভোয়াকা না করে কেমনভাবে চলে যেতে পারে একজন মা-শ্বাশুড়ি, তার প্রশ্ন আমাদের মত হৃদয়বানদের কাছে অবশ্যই হাস্যকর মনে হবে।

আসলে আমরা রসিক। বিয়ের পরে রাহুভাবিকে বড় একটা বাইরে দেখা যেত না। আমরা বাড়ির আশপাশ দিগে ঘুরঘুর করতাম, 'পিরীতে মজিল মন' বলে চিৎকার করে পান পাইতাম আর কুতুব মিয়াকে দেখলেই দূর থেকে শিটি বাজাতাম। জামাল আমাদের দৌরাচ্ছে টিকতে না পেরে দু' তিন দিনের মধ্যে বৌ নিয়ে গাঁ ছেড়ে কোথায় যে গেল, কেউ তার হদিস পেল না। পরে শোনা গিয়েছিল, ঢাকায় নাকি কি একটা কাজ পেয়েছে। রাহুভাবি আমাদের মন্তব্য সব শুনতেন; একদিন আমায় একা পেয়ে বললেন, বৌ দেখবো কবে?

কপালে থাকলে দেখবেনই।

আমার মত কপালে-বৌ এনো না আবার।

আমি বুঝতে পারিনি সে কথার অর্থ। ভাবি ঘরের মধ্যে চলে যেতেই একটা প্রকট উল্লাসে চিৎকার করে রাস্তায় এসে আড্ডার বন্ধুদের খবরটা জানিয়ে দিলাম। মা শুনলেন কথাটা।

হারামি মাগি, তুই স্বামী খেয়েছিস বলে সব বৌ তোর মত স্বামী থাকি হবে? তোর কপালে ঝাঁটা, শিলনোড়া, পোড়া কাপড়ের পুঁটলি বেঁধে দেব।

মার গালাগালি শুনে অর্থটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল তখন। আমি মরে যাই একজন ফুটন্ত যৌবনা মেয়েকে বিধবা করে, সেও রাহুভাবির মত কেলেক্কারি করে বিয়ে করুক আর কি।

বছর খানেক পরে।

রাহুভাবি আত্মহত্যা করেছেন। প্রথমে গায় কেরোসিন ঢেলে দিয়েছিলেন, পরে আগুন ধরিয়েছেন। আশ্চর্য মহিলা, আগুনের যন্ত্রণায় একটুও চিৎকার করেন নি, এমন কি কোন প্রকার উল্লাসও নয়। শান্ত, আত্মসমাহিতা হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পাড়ার লোকে বলেছিল,

যৌবন জ্বালায় টিকতে না পেরে মাগী আগুনের জ্বালায় মরল।

ভাবির যখন মৃত্যু হয়, তখন আমি আমার জেলার বাইরে। ঢাকায় থাকি, কাজকর্ম করি, জামালের সঙ্গে একদিনও দেখা হয় নি। হলে রাহুভাবির কথা মনে পড়ত। খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদটি।

কেলেক্কারি করেই করুক আর যা করেই করুক, রাহুভাবির বিয়েতে আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল,—বিয়ে করলেন কেন! সবই তো ছিল তাঁর। যুবক ছেলে, বেটার বৌ, বছর খানেক দেড়েক দেরি করলে নাতি-নাতনির মুখ দেখতে পেতেন। দাদির সখ মিটিয়ে, নাতি-নাতনিকে আকাশের চাঁদ দেখিয়ে, ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে, রান্ধস খোন্ধসের গল্প বলে, মাথায় তুলে নিয়ে, দোলনায় দুলিয়ে মনের সাধ পূরণ করতে পারতেন। একজন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কি চান? আমি বলি, আপনারাও বলবেন,

শান্তি, নিবিড় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য।

রাহুভাবি ইচ্ছে করলে সহজে পেতে পারতেন। আরো পেতে পারতেন স্বস্তুর শান্তির বেশ কয়েক বিঘা জমি, মৃত্যুর পূর্বে বিধবা পুত্রবধূর নামে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িটা তাঁর নামেই হয়েছিল; চাই কি, আপন ইচ্ছায় রাজরানির মত থাকো। আমার মানব চরিত্র সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত ক্ষীণ বলে আমি বলব; ঘৃণ্য মহিলা, শুধু দেহগত দাবি মেটাবার জন্যই ছেলে-বৌয়ের সামনে নির্লজ্জের মত বিয়ে করলেন। আমার তখন কিন্তু রাহুভাবির সেই সব কথা আদৌ কানে ঢোকেনি। তিনি বলেছিলেন,

বলত, একটা মানুষ জীবনে কি পেয়ে সবচেয়ে সুখী হয়?

চুপ করে রইলাম আমি।

বলতে পারলে না? বাড়ি, টাকা পয়সা, জমি-জিরাত ছেলে-বৌ, নাতনি, এই সব তো জীবনের লক্ষ্য।

আমি তখনো কথা বলি নি। লক্ষ করলাম, রাহুভাবি চোখ দুটো বড় হয়ে গেল হঠাৎ, মুখটা কঠিন হল নৃতভাবে, প্রায় কুঁজো হয়ে বসেছিলেন, সোজা হয়ে উঠলেন হঠাৎ এবং হঠাৎ করেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন,

আকাশের চাঁদ দেখেছো? গাছের ডালে পাখিরা গান গায় শুনেছ? সূর্যের আলো দেখেছ? নীল আকাশ দেখেছ? প্রখর আকাশের আলো দেখেছ? আকাশের চকচকে তারা দেখেছ? শুনেছ রাতের গভীরে স্বামীর স্ত্রীর বুকে মুখ রেখে কথা বলতে? দেখেছ স্ত্রীকে স্বামীর কাছে সোহাগ জানাতে? আমি চাই তেমন একটা জীবন; লোক-লাজ-ভয় কিছুই, কিছুই সেখানে অঙ্গুলি তুলে শাসন করতে আসবে না। চিন্তা করতে পারো তুমি, যখন সবাই আত্মসুখে নিমগ্ন থাকে, তখন আমি কেন যন্ত্রণার সাগরে অনবরত ডুবতে থাকি? আমার অন্যায়টা কোথায় দেখলে? তোমার বাবা যদি মরে যেতেন, গেদার বৌ যদি বিধবা হত, আহমদ যদি কুড়ি বছরের বৌকে রেখে মারা যেত, তাহলে?

একটানা অনেকগুলো কথা বলে রাহুভাবি হাঁপাতে লাগলেন। মাঝের অনেকগুলো নিস্তর মুহূর্ত, যেন পৃথিবীর কোন পরিবর্তন নেই সেই অসাধারণ নিস্তরতায়; আমি উপলব্ধি করতে পারছি আমার পারিপার্শ্বিক জগত, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না। রাহুভাবি সেই নিস্তরতা ভাঙলেন হেসে,

অনেক বাজে কথা বলে ফেলেছি। ছিঃ ছিঃ কি সব কথা বলেছি। তওবা, তওবা।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভাবির মৃত্যু সংবাদ দেখে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তিনি বিয়ে করেছিলেন, কারণ খুঁজে পাই নি। পাগলিনীর মত চিৎকার করে কি সব আবোল তাবোল বকেছিলেন, তাতে আমি বলব,— একজন কামুকী মহিলার আত্মবিলাপ। আমার চোখে কি তার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি বা সমর্থন আছে? বিশ্বাস, নেই। থাকলে ‘পিরীতে মজিল মন’-এর নতুন সুর সংযোজন করতাম না।

তিনি মরে বেঁচেছেন। কিন্তু সেই চিৎকারগুলো আমার কানে যে আরো তীব্র হয়ে উঠছে,— ‘আমি বাঁচতে চাই।’ কী সেই আকৃতি, চঞ্চলতা, তীব্র, সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। রাহুভাবি বুঝতে পেরেছিলেন,

সন্তোষ বল আর যাই বল, আমার অস্তিত্বের অবমাননা কি করে করি? দেখো, প্রতিটি মুহূর্তেই মনে প্রশ্ন জাগত, যদি আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি, লোকে কি মুখে থুথু দেবে? তা হয়ত দেবে না, কেননা দ্বিতীয় বিয়ে তো হর-হামেশাই হয়।

তবে আমার বয়েস হয়েছে ঢের, লোকে অকথা কুকথা বলতে ছাড়বে না। বলুক, আমার সুখে সবাই ঈর্ষান্বিত হতে পারে, দুঃখে কি কেউ ভাগী হবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাহুভাবি আত্মহত্যা করলেন কেন। কুতুব মিয়া কি ছেড়ে দিয়েছিল? মারধোর করত? প্রথম স্ত্রীর প্রতি কি মন ঘুরে গিয়েছিল? পাড়ার লোকেরা কি জ্বালিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল? জামাল কি ফিরে গিয়ে মাকে অপমান করেছে? একটানা অনেকগুলো প্রশ্ন আমার মনের খাতে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে গেল।

হতে পারে। কুতুব মিয়া একটা আস্ত পাষাণ। চোখ দুটো গাঁজাখোরের মত লাল, আর যা গাটাগোটা চেহারা, তাতে রাগ হলে পশু হয়ে যাওয়া তার পক্ষে বিচিত্র কিছুই নয়। রাহুভাবির নামের সব সম্পত্তি হাত করার ইচ্ছে হয়ত জানোয়ারটার ছিল, তা সফল হয় নি। সে-জন্যেই ছেড়ে দিয়েছে। হয়ত সম্পত্তি পাওয়ার জন্যে, তার নামে লিখে দেবার জন্যে মারধোর করত। একবার ওর প্রথম স্ত্রীকে নাকি এ জন্যে খুব মেরেও ছিল। স্বস্তরের দেবার কথা ছিল অনেক কিছু, না পেয়েই নাকি অত্যাচারের সূত্রপাত। বড় বৌটাও তো মিষ্টি; মানুষকে কথায় এত সহজে আপন করে নিতে পারে যে মুহূর্তেই মনে হবে বহুদিনের চেনা। সে নিশ্চয় মিষ্টি কথায় স্বামীর মন ভুলিয়েছে, হয়ত হাতে পায়ে ধরেছে, কান্নাকাটি করেছে, রাহুভাবিকে ছেড়ে দেবার জন্যে। নচেৎ গেন্দার বৌ, আহমদের বৌ, আরজানের মার নিন্দের জ্বালায় মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছিল রাহুভাবির। কিংবা জামাল ফিরে গিয়ে বাড়িতে গাঁট হয়ে বসেছে, মাকে কৃতকর্মের জন্যে যাচ্ছেতাই বলেছে, যা সহ্য করা রাহুভাবির পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এর কোনটিই সত্যি না। রাহুভাবির মৃত্যুর পূর্বে পাড়ার অতি উৎসাহী লোকেরাও ভুলে গিয়েছিল যে পাড়ায় একটি ঘটনা ঘটেছিল। স্বাভাবিক, সব কিছুই স্বচ্ছন্দে চলছিল। তবুও রাহুভাবি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে মরে গেলেন। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে; একটি অগ্নি-প্রজ্বলিত দেহ, ঠোঁট দুটি হাসি হাসি, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রতি এক অব্যক্ত ঘৃণায় কঠিন আকার ধারণ করেছে। এটা আমার অনুমান মাত্র। তিনি বলেছিলেন,

মানুষকে কোনদিন বিশ্বাস করেছ?

কেন করব না!

মানুষকে অবিশ্বাস করা মহাপাপ।

অর্থাৎ তুমি অকৃত্রিম বিশ্বাসে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারো।

ভাল কথা। তবে পারতপক্ষে কর না।

কেন? কেউ যদি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে তবে কেন করব না?

সে জন্যেই করবে না।

আশ্চর্য হেঁয়ালি কথা। আমি যদি কাউকে ভালবেসে, বিশ্বাস করে আমার জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারি, তাহলে?

ঐ সুন্দর শব্দটিই আমার অপরিচিত। তুমি বিশ্বাস করতে পারো, একটা মানুষ ও একটা পশুতে কোন পার্থক্য নেই? আকাশের ঐ চাঁদ, সূর্য, তারা,

পাখিদের গান, এই জীবন আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। আমি প্রমাণ করতে পারব না, কেন, কেন জীবন সম্পর্কে এই হতাশা? কিছু পেতে চাই আপন করে, প্রথম যৌবনে যেমন পেয়েছিলাম। কিন্তু বলতে পারো, মানুষের নিজের জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্মালে বেঁচে থাকার অধিকার হারায় কি জন্যে?

আসলে রাহুভাবি দ্বিগের পর দার্শনিক হয়ে গেছেন। কথা বলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে, এক সময় হাঁপিয়ে ওঠেন, চুপ করে যান আপনা থেকেই।

জীবনের সব কিছুই একটা পূর্বাপর যোগসূত্র আছে। রাহুভাবি আত্মহত্যা করেছেন কোন কারণ না দেখিয়ে। কেউ খুঁজে পায় না হেতু। পুলিশ অনেক জিজ্ঞাসাবাদেও কুড়ুব মিয়ার কিছু করতে পারে নি। শুনেছি পুলিশ বহু চেষ্টা করেছে, তথ্য সংগ্রহ করতে পারে নি। যে তথ্য মনে জমা রেখে রাহুভাবির মৃত্যু হল, সাধ্য কি পুলিশের তা উদ্ধার করার। আমাকেই অপরাধী মনে হল, কেন না ভাবির দার্শনিকসুলভ উক্তিগুলো আমি বাইরে এসেই বন্ধুমহলেও পাড়ায় বিকৃত করে প্রচার করেছিলাম।

বিধাতার দরবারে

মানুষের হাত যে অত ঠান্ডা হতে পারে এটা আমি কখনো ভাবতে পারি নি, বিভিন্ন উপমার সাহায্যে বর্ণনা দিয়েও আপনাদের বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার অর্ধচেতন মন সেই ঠান্ডা হাতের স্পর্শে মুহূর্ত-সময়ের মধ্যে সচেতন হয়ে চিৎকার করে উঠল, খুব সম্ভব দরোজা জানালাগুলো কেঁপে উঠেছিল, কাঁচের শার্সিতে কাঁপন জেগেছিল, আমার চারপাশের দেয়ালের সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে একটা ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছিল, তৎসত্ত্বেও সেই লোক দুটোর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখলাম না। অত্যন্ত স্বাভাবিক, শান্ত, অচঞ্চল মুখের অবস্থা, যেন কিছুই হয় নি। হয়তো তাই, কেন না বারান্দায় দারোয়ান ঘুমচ্ছে; যত গাঢ় ঘুমই হোক না কেন তার, আমার এ অন্তিম চিৎকার দরোজা ভেদ করে নিশ্চয়ই তার কানে পৌঁছুবে এবং সে জেগে উঠবে।

কিন্তু সে জাগে নি এবং আমার সে ভয়াবহ সময়ে আমাকে সে সাহায্য করতে আসে নি। লোক দুটো ভীষণ লম্বা, প্রায় আট ফুট হবে। সমস্ত শরীরটা সাদা ধবধবে কাপড়ে জড়ানো, মুখে কোন প্রকার মানবিক আবেদন নেই, এমন কি রক্ত আছে কি না তাও মনে পড়ে না।

আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে এরা আমার ঘরে এলো কেমন করে। বিরাট একটা ঘর, চারপাশে চেয়ার টেবিল, সর্ব মোট তিনটে বালব, দুটো ক্যান, একটা বড় জানালা, দুটো দরোজা। দরোজা দুটোই শক্ত কাঠের তৈরি, ভেঙে ঘরে ঢুকতে বহু শক্তির প্রয়োজন। জানালাটাও তাই।

আমি সে রাতে বাসায় ফিরতে পারি নি। দূরে গির্জার ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে দুটো ঘণ্টা পড়ল তখন আমার আর বাসায় ফিরে যাবার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে দুই একটা গাড়ির শব্দ কানে আসে, পথচারীর কথা শুনে পাই, তবুও সেই নিকৃপ পৃথিবীর বিশালতায় আমাকে ছেড়ে দিতে বড় ভয় করে। আমি কালোর অসীম রাজ্যে কোন সময়ই হারিয়ে যেতে চাই নে; একটু আলো, একটু সুন্দর রূপ আমার চোখের সামনে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকুক এই আশার আমি অফিস ঘরে টেবিলের উপর শুয়ে নিজেকেই উপলব্ধি করছিলাম আরো একটি সস্তার সাথে মিলিয়ে।

আমি তনুয় হয়ে গিয়েছিলাম, আমাকে আমি গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম, ঠিক তখনি আমার গায়ে সেই অবর্ণনায় ঠান্ডা হাত পড়ল, আমি চিৎকার করে উঠলাম।

কিন্তু সে চিৎকার হয়তো আমার গলা দিয়ে আদৌ বের হয় নি, গলার সীমানাতেই
ওমরে ওমরে মরেছিল। আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

কে, কে আপনারা?

আমাদের পরিচয় জেনে লাভ নাই।

কেন?

কেন না আমরা পরিচয় দেব না।

তা হলে কেন এসেছেন?

তোমাকে নিতে।

আমাকে নিতে! কোথায়?

বিধাতার কাছে?

কেন?

তা জানি নে।

নিতে এসেছেন, অথচ কারণ জানেন না?

অত কথা শুনতে চাইনে, তোমাকে যেতে হবে।

আমি যাবো না।

যেতে হবে।

না, যাবো না।

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ এমনি লাফালাফি করে, কিন্তু ফল হয়
না।

আমি দারোয়ান ডাক দেব।

কোন লাভ নেই।

আপনারা কি তাকে হত্যা করেছেন?

না কিছুই করি নি। তবুও সে উঠবে না। বিধাতার উদ্দেশ্য সফল
করার জন্যে তাকে আজ রাতের মত বলতে গেলে মৃত্যুমুখে মজিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিষ্ঠুর বিধাতার চ্যালা কোথাকার।

চূপ হিঁচকে মানুষ। আর একটা কথা বলতে পারবি নে।

আমি অনেককণ কথা বলতে পারলাম না, আমার সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত হয়ে
নিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে বললাম,

চলুন।

তোমাকে হত্যা করে নিয়ে যাওয়া হবে।

কেন?

তাঁর ছলচাতুরী, তাঁর সৃষ্টিরহস্য তুমি জেনে নাও, এটা তাঁর উদ্দেশ্য

নয়।

কেন, কেন?

আমি এ প্রশ্নের কোন জবাব পাই নি। আমি স্পষ্ট দেখলাম, মানুষ দুটোর চারটে কঠিন হাত এগিয়ে এল আমার গলার দিকে। তাদের হাতে তখনো বীভৎস রক্তের চিহ্ন, একজনের হাতে কিছু পূজ দেখলাম, দুজনের চোখ ভাটার মত জ্বলছে, মুখের পূর্বকার অবস্থা পালটে গিয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, ওরা আমার গলা টিপে ধরেছে, দুঃসহ যন্ত্রণা আমার সমস্ত শিরা উপশিরায় চারিয়ে যাচ্ছে। আমি যে কালোর ভয়ে বাসায় ফিরতে ভয় পাই, তারই এই জঘন্য রূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হচ্ছে। আমি ঠিক বলতে পারব না মৃত্যু মানুষের জীবনে কি আনে, আমার যখন মৃত্যু হল তখন আমিও বুঝতে পারলাম না বিধাতা আমাকে কি দিলেন।

তেমনি বিধাতার দরবারে এসে যখন হাজির হলাম, তখন বুঝতে পারলাম না রাত না দিন, চারদিকে সোনার গাছগাছালি, মণিমুক্তোর ফল ধরে আছে, 'চির সুখের পাখি' চিকন গলায় শিশু দিয়ে গান গাইছে, আরো আরো যে কত কি তা আমি বলতে পারব না।

পৃথিবীর জন্যে আমার করুণা হল, কিন্তু ঘৃণা করতে পারলাম না; আমার তখনকার মানবিক সত্তা আমাকে যে সুখ ও ঐশ্বর্যের রাজ্যে নিয়ে গেছে, সেখান থেকে পৃথিবীকে করুণা করাতে আমার বড় হাসি পেল, নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

সেই লোক দুটো এক জায়গায় এসে ধেমে গিয়ে বলল,

তুমি এখন যাও।

আপনারা?

এর পরে আমাদের যাওয়ার অধিকার নেই।

তা হলে আমি যাবো কেমন করে?

সোজা যাও। আগে লোক আছে, নিয়ে যাবে।

আমি এগুছি, দু পাশে তাকাছি, মণি-মুক্তা ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে আমার চোখ ধাঁধিয়ে আসছে, আমি দিশেহারা হয়ে পেলাম। ঠিক তখনই দেখতে পেলাম আরো দুজনকে। তাঁরা বললেন,

তোমাকেই আনতে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবী থেকে।

কেন জানেন কিছু?

সে জবাব বিধাতাই দেবেন। ঐ যে সামনে বিশাল পর্দা রয়েছে, সেটা তুলে ভেতরে গেলেই দেখতে পাবে।

আমি ভেতরে ঢুকে কিছুই দেখতে পেলাম না। হঠাৎ একটা পক্ষীর কণ্ঠস্বর কানে এল,

তোমাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল কেন তা জান?

আপনি কে বলছেন?

আমি বিধাতা।

বলুন মহাপ্রভু।

তোমাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল আমার কাজে ।

আপনার কাজে আমি লাগব মহাপ্রভু?

হ্যাঁ, ঐ যে নারী সত্তার সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে তোমাকে তুমি যখন ভালবাসছিলে, তখন ভালভাবে টের পেলাম, তুমি যথার্থ রসিক পুরুষ । জানো আমার করুণার পাত্র জীব মানুষ, আমি মাঝে মাঝে পৃথিবী থেকে এ রকম রসিক মানুষ নিয়ে আসি । অনেক দিন থেকে তোমাদের সাথে রসিকতা করছি, প্রায়ই আমার রসের ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসে । তাই, কি আর করব, পৃথিবী থেকেই আমদানি করতে হয়, যারা আমার রসিকতা অনন্তকাল চালিয়ে যাওয়ার জন্যে সাহায্য করবে ।

বুঝতে পেরেছ?

জি মহাপ্রভু ।

আমি বেরিয়ে এলাম দরবার থেকে । এসে দেখি, দুটো লোক আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে উপস্থিত । বললাম,

এখন কোথায়?

এস ।

তারা আমায় নিয়ে গেল এমন একটি জায়গায়, যেখানে আমার মত বহু পরিচিত মানুষের দেখা পেলাম । ভেবেছিলাম, বিধাতার অনুগ্রহপুষ্ট বলে আমাদের আদৌ কষ্ট করতে হবে না, কিন্তু এরা পরিশ্রম করছে, বেঁচে থাকার তাগিদে সংগ্রাম করছে । আমি প্রতিবাদ জানাতে চাইলাম । ওরা বলল,

তোমার প্রতিবাদে ফল হবেনা ।

তবুও চিৎকার করে বললাম,

কেন, কেন আমাদের চাতুরী করে তুমি বিধাতা ভুলিয়ে রাখতে চাও?

আমার কণ্ঠস্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল; ঠিক তক্ষুণি দারোয়ানের ধাক্কা খেয়ে উঠে বসলাম । আমি জেগে উঠেছি । বিধাতার দরবার থেকে ছিটকে যেন পৃথিবীতে এসে পড়েছি । যেখানে আমি ও আপনারা সবাই ভালবাসতে, বেঁচে থাকতে, সব কিছুতেই বিধাতার রসিকতার শিকার হয়ে রয়েছে ।

ধ্রুবতারার স্থানচ্যুতি

লোকটি এগিয়ে চলেছে পায় পায়, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে আশে পাশে তাকান্ধে দ্রুত দৃষ্টিতে, কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করছে, পরমুহূর্তে আবার শুরু করছে দ্রুততাহীন যাত্রা। লোকটির গায়ে একটি কালো লম্বা কোট, পরনের প্যান্টটি কালো, পায় কালো রাবার সোলের জুতো। কোটের ডান পকেটে একটি পিস্তল, বাম পকেটে দুটো গুলি।

তখন গভীর রাত। দুটো আড়াইটে হবে। পৃথিবীর বর্তমান রূপ ও অবস্থাই যদি চিরকালের জন্য স্থায়ী হতো, মনে হতো, কালো কাফন পরিহিত একটি গোলাকার মৃতদেহ। জীবনের কোন চাঞ্চল্য বা সাড়া নেই; দূরে যদি কোন কুকুর অথবা রাতজাগা পাখি কঁকিয়ে ডেকে ওঠে, মনে হবে প্রাগৈতিহাসিক কালের কোন প্রেত অথবা প্রেতাত্মা চিৎকার করে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। সত্যিই একটি কুকুর ডেকে উঠল, লোকটি যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল তারই শ' দুয়েক হাত দূর থেকে। থমকে দাঁড়াল সে। বুঝল, কুকুরটি আসলে তাকে দেখে ডাকে নি; দেখলে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসত। নিজের মনেই হাসল সে। আবার শুরু হল তার চলা।

সে রাতে আসলে মানুষ ঘুমিয়েইছিল গভীরভাবে। কোন যাদুমন্ত্র নয়, ঐশ্বরিক ক্রিয়াকলাপ নয়, শুধু দিনের প্রচণ্ড গরমের পর রাত্রে ঠান্ডাটা নেমেছিল আশীর্বাদের মত। অথচ বিকেলে আকাশে মেঘ করেছিল। কেউ লক্ষ্য করে নি সে মেঘের আকস্মিক আবির্ভাব; যেন সকলে হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল, আকাশ কালো বসনে নিজেকে আবৃত করেছে শোক করে অশ্রু ঝরাবে বলে। কিন্তু আকাশের অশ্রু ঝরল না, মুখ গোমরা করে রইল সেই সঙ্কো থেকে; এখন গভীর রাত, তবুও সে মুখ ঝুলল না।

লোকটির পক্ষে এটি অবশ্যি আশীর্বাদ। আকাশের গায়ে যদি তারার মেলা জমে থাকত, হয়ত লক্ষ করা যেত তাকে। আকাশের অন্ধকার, প্রকৃতির অন্ধকার এবং লোকটির অন্ধকার পোষাক যেন তাকে মিশিয়ে ফেলেছে নিজেরই অস্তিত্বে। নিজের কথা মনে হতেই হাসি পেল তার। ইচ্ছে করল প্রচণ্ড অট্টহাসিতে সমস্ত লোকালয় কাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু তা সে করল না। পরিবর্তে পকেটে রাখা পিস্তল ও গুলিতে হাত দিয়ে ঠোঁটের কোণে একটি নিষ্ঠুর হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

একটি গলির মুখে এসে লোকটি আরেকবার, শেষবারের মত আশেপাশে তাকিয়ে দেখল। না কোথাও কেউ নেই। গলির অনতিদূরের একটি বাড়িতে একটা শিশু কঁদে উঠল, কঁদে উঠেই থেমে গেল; আরেকটি বাড়িতে এক বুড়ো খক খক করে কয়েকটি কাশি দিয়ে ঝিম মেরে গেল। পৃথিবীর সীমাহীন নিস্তরতার রাজ্যে এই দুটি শব্দের তরঙ্গ তার মনে মুহূর্তকালের জন্যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু বিচলিত করে নি। এবারে লোকটির চলায় দ্রুততা এলো। আশেপাশে আর তাকাল না। বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটে, একটি বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে, আবার চারপাশে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল।

একটি একতলা বাড়ি। অন্ধকার রাত্রিতে বাড়িটির রং চেনবার উপায় নেই। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি মাঠ, মাঠটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, দুদিক থেকে বৃত্তাকারে আগত প্রাচীরটির সংযোগ রক্ষা করেছে একটি গেট। লোকটি গেটটি খুলল প্রথমে। এগিয়ে গেল বাম কোণের ঘরটির দিকে। সে ঘরে তখনো একটি নীল আলো জ্বলছিল। বাড়ির অন্যান্য সমস্ত ঘর অন্ধকার। লোকটি এবারে অতি সন্তর্পণে আলো-জ্বালা ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে, ভেতরে উঁকি মারল।

সুসজ্জিত ঘরটি। এক কোণে একটি খাট, এক পাশে আলনা, টেবিল, চেয়ার; দেয়ালে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্বলিত ছবি; পশ্চিম দিকের দেয়ালে একটি ক্যালেন্ডার। ঘরটিকে সাজানো হয়েছে আসল ও নকল ফুলে। খাটে, মশারিতে, দেয়ালে, এখানে সেখানে ফুলের ছড়াছড়ি। পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু ভালবাসত লোকটি, তার মধ্যে ফুল অন্যতম। অথচ আজ সে ফুলের প্রতি দুর্বল হতে পারল না; সেখানে কৃত্রিম ফুলের কথা মনে হতেই পকেটে রাখা পিস্তল ও গুলিদুটো হাত দিয়ে স্পর্শ করল।

খাটে শুয়ে আছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বিয়ে হয়েছে ওদের আজ। ফুলশয্যার রাত। তাই ফুলের এত ছড়াছড়ি। পাতলা মশারি ভেদ করে দৃষ্টি যায়; দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ছেলে ও মেয়ে দুটি জেগে, কোন কথা বলছে না, হাসছে না, শুধু তাকিয়ে আছে একে অপরের দিকে। লোকটির চোখে অসহ্য এ-দৃশ্য। এবং অসহনীয় বলেই রাতের গভীরে নিজেকে কালো পোশাকে আবৃত করে এসেছো ওদের হত্যা করতে। ডান পকেটে হাত চালিয়ে পিস্তলটা বার করল, বাম পকেট থেকে বার করল গুলি দুটো। দুটি গুলিই যথেষ্ট। একটি মেয়েটির জন্যে, আরেকটি ছেলেটির। গুলি দুটো ভরল পিস্তলে। একবার তাকাল ওদের দিকে। আরেকবার লক্ষ্য করল গভীরভাবে, গভীরতরভাবে।

সম্ভবত এত অকৃত্রিম ও আন্তরিকভাবে লোকটি কোন দিন মেয়েটির প্রতি তাকায় নি। যেন মেয়েটির অন্তর ভেদ করে তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে তারই বিচরিত এক অতীত রাজ্যে; যেখানে, তার বিশ্বাসে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সকালে ঘুম থেকে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্যে এসে দাঁড়াতো কল্যাণী, যেন অনুভবে তাকে স্পর্শ করত আলতোভাবে, গভীরভাবে, হৃদয়ের কোমলতম প্রদেশের অভল

গহ্বর থেকে মণিমুক্তো আহরণ করে এনে সাজিয়ে, গুছিয়ে। ক্রমে বেলা বাড়ত, সূর্য তাপ ছড়াত ধীরে ধীরে; লোকালয়ে, পথে-ঘাটে যখন কর্ম চঞ্চল মানুষের ভিড়ে পৃথিবীটা ক্লান্ত ও মলিন হয়ে উঠত, তখন তার কল্যাণী যেন কল্যাণময়ী রূপ নিয়ে তাকে আশ্রয় দিত বধূর, প্রেমিকার। আবার সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে কালি মিশে অন্ধকারটা যখন গাঢ়তর হয়, তখনও কল্যাণীর উজ্জ্বল রূপ তাকে উজ্জ্বলতর করে রাখে।

একটি মানুষের সবচেয়ে পবিত্র কামনা কি? একটি অপরিচিতা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া নয়; স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব সম্পাদন করে সন্তানসন্ততির পিতা হওয়া নয়, নিজের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মকে সম্পাদন করা নয়। লোকটির অন্তত তাই ধারণা। একটি মানুষের স্বল্পপরিসর জীবনে কেউ যদি কল্যাণময়ীর স্পর্শ না বুলিয়ে দিল, তাহলে অবশ্যই কাম্য—হে মৃত্যু তুমিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। লোকটি তাই আদর করে মেয়েটির নাম রেখেছিল কল্যাণী।

কল্যাণী তাতে সাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। জীবনকে নতুন করে ব্যঞ্জনা দেবার বাসনায় কল্যাণী উঠেপড়ে লেগেছিল। কল্যাণী যেন বুঝতে পারত—তার বন্ধুর আজ মন খারাপ, যেন বুঝতে পারত এক শূন্যতার রাজ্যে সে আজ বিচরণ করছে, যেন বুঝতে পারত অসহায়ত্ব তার জীবনসঙ্গীকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। মন স্থির করে ফেলত; কিভাবে কথা বললে, কেমন ব্যবহার করলে, সান্তনা দিলে, হাসলে, চাইলে, ছেলেটি জীবন-জিজ্ঞাসার নতুন অর্থ খুঁজে পাবে।

ওদের প্রেম সম্পর্কে কারো কোন সংশয় ছিল না। কল্যাণীর বান্ধবীরা ও ছেলেটির বন্ধুরা বারবার উস্ত্যক্ত করছিল—কবে বিয়ে! যেদিনই হোক কল্যাণীর বিয়ে হল, তবে এই লোকটির সঙ্গে নয়। আর যার সঙ্গে হল, তাকে কল্যাণী আগে থেকে চিনত কি না তা লোকটি জানে না।

সম্ভবত পাগল হয়ে গেছে লোকটি। তাই রাতের গভীরে এসেছে খুন করতে। তার এই আকস্মিক অন্যমনস্কতা তাকে আবার একটি নিশ্চূপ ও নিষ্ঠুর হাসি হাসাল। পিস্তল তুলল সে। গুলি করবে। হঠাৎ মনে হল তার—কিভাবে ওদের খুন করা যায়। ওরা দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছে—একটি গুলি যদি ছেলেটার কান লক্ষ করে ছোঁড়া যায়, তাহলে মাথার ভেতর দিয়ে মেয়েটির গায়ে গিয়ে লাগবে? তার চেয়ে একটা একটা করেই মারবে—দুজনের মাথা লক্ষ করে, মাথার ঘিলু ছড়িয়ে ছিটকে পড়বে খাটে ও মেঝেতে। সেই দৃশ্যটাই হবে চমৎকার। যত বীভৎস, ততই আনন্দ। না, তার চেয়ে বুকে মারবে। তাতে মৃত্যু হবে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন নিয়ে, পরে সেটা দেখে, আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠবে তার মন। সিদ্ধান্ত নিল সে, তাই করবে।

আরেকবার মনে হল, নিয়ম মাস্টিক ওদের গুলি করবে। পৃথিবীর সব কিছু যেহেতু নিয়মের মাঝ দিয়ে চলে, সেজন্য সেই পথ অনুসরণ করবে। সে তাদের মারবে। সে তাদের মারবে ওয়ান, টু, থ্রি বলে। মনে মনে উচ্চারণ করল—ওয়ান।

সে ভাবছে আর কয়েকটা মুহূর্ত পরে তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না সারা পৃথিবীতে। মানুষের মৃত্যু আসে কি ভাবে? কখনো জানান দিয়ে, কখনো বিনা নোটিশে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। সমস্ত আনন্দ, কোলাহল মুহূর্তে কোথায় যে চলে যায়, তা যদি এখন ঐ ছেলে ও মেয়েটি জানত, তাহলে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠত।—টু। আশ্চর্য, আর কয়েকটা সেকেন্ড। মৃত্যু ওদের জানলায় অপেক্ষমান, অথচ তাদের চোখে মুখে তার কোন ছায়া পড়ে নি। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে নতুন জামাই বলে উঠল,

সত্যি?

সত্যি আমি খুঁটব খুশি হয়েছে।

মেয়েটি খুশির আতিশয্যে উত্তর দিল।

নিজের হাতে দুই কান চেপে ধরে, হন হন করে ফিরে চলে গেল লোকটি।

ওরা যখন ঘুমে

লোকটির নাম হাজি হাছেন আলী সরদার । সংক্ষেপে হাছেন সরদার; হাজি সরদার; হা হা সরদার ।

সে রাতে হাজি সাহেব অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন । কিছুদিন থেকে তিনি রাত করে বাড়ি ফিরছেন; ব্যবসায় টাকা পয়সার হিসেব নিকেশ সেয়ে ফিরতে দেরি হয় তাঁর । ইদানীং তাঁর গাঁট কাপড়ের ব্যবসায় বেশ দু'পয়সা আসছে; তিনি সিক্কের লুঙ্গি পরেন এবং পাঞ্জাবির বুকে সোনার বোতাম দেখা গেল । সে রাতে স্ত্রী খোদেজা খাতুনকে সিন্দুকে টাকা না তুলতে বলে কিছুটা রসিকতা করে বললেন,

তোক আজ এ্যাকটা মজার জিনিস দেখাবো ।

কি ।

তুই রাগ করবু না নে, কথা দে ।

কন না কি ।

আগে কথা দে!

আচ্ছা দিলেম ।

দ্যাখতো আমার আঙ্গুলি কি?

ও! আংটি । খুব সোন্দর তো ।

দাম কতো কবের পারিস?

খোদেজা খাতুন এ প্রশ্নের জবাবে চট করে কিছু বলতে পারলেন না । লষ্ঠনের আলোটা আরো বাড়িয়ে দিলেন, হাজি সাহেবের বাম হাতের মধ্যমা আঙ্গুলটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আলোর অতি নিকটে ধরে ধীর কণ্ঠে বললেন,

পারলেম না । কিনলেন?

হঁ ।

আপনে বুড়া মানুষ, তারপরে হাজি মানুষ, সোনার গয়না পরলি ওনা হয় না?

ঘ্যানর ঘ্যানর করা বাদ দিয়ে ভাত দে ।

আমাক আংটিটা দিবেন না?

দেব ।

খোদেজা খাতুনের বয়শ চল্লিশের নিচে। চুলে পাক ধরেছে কি না বোঝা যায় না, ভাল করে লক্ষ করলে গায়ের চামড়ার ভাঁজ হয়ত আবিষ্কার করা যাবে, দাঁত এখনো আগের মতই রয়েছে; প্রয়োজনে তিনি দাঁতে চেপে অনায়াসে সুপুরি ভাঙতে পারেন। তিনি যেন হঠাৎ বালিকা হয়ে উঠলেন। দ্রুত পায়ে আলনা থেকে গামছা নিয়ে, কলসি থেকে বদনার পানি ভরে বারান্দায় দিয়ে এলেন।

ভাত খাওয়ার সময় হাজি সাহেব কোন ভূমিকা না করে শুরু করলেন,
মনে নিয়েত করিছি, তোক কিছু সুনার গয়না বানা দেব। তুউ বুড়া
হয়া যাচ্ছিস, শ্যাম বয়সে মনের সখ পুরা না করলি আর কবে করবু।

আপনের যে কথা। আমার ব্যাটার বৌ আসপি আর দুই দিন পর,
আমি বুড়াখাড়ি গয়না পরি। ছিকো!

বিশ্বেস কর, আমি খালেছ দেলে কচ্ছি, তোর সখ পুরা করবের না
পারলি আমি গোরেও শান্তি পাব না।

যখন বয়েস ছিলে, তখন দ্যান নাই।

তখন দ্যাওয়ার মতো অবস্থা থাকলি সত্যিই দিতেম।

খোদেজা খাতুনের চোখ চকচক করে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে না, হাজি সাহেবের
সাথে তাঁর বিয়ের পরে এত গভীর আন্তরিকতার সাথে স্বামীর দিকে তাকিয়েছেন কি
না। বিয়ের সাতদিনেও তিনি স্বামীর চোখের দিকে চোখ রাখতে পারেন নি, স্বপ্তর
বাড়ির ছোট ছেলেমেয়ের দিকেও চোখ তুলে কথা বলতে পারেন নি। দু'তিন দিনের
মধ্যেই বাড়ির কানাঘুসা শোনা গেল,

বৌ কানা। চোখ তুলবের পারে না। চোখে ছানি পড়েছে তাই কেউ
দেখে ফেলবি ভয়ে চোখ খোলেও না, তাকায়ও না।

খোদেজা খাতুন সব শুনতেন। কান্না দলা দলা হয়ে তাঁর গলার কাছে এসে
অপেক্ষা করত; যদি তখন মুখ খুলতেন, বাড়ির লোক নির্ঘাৎ টের পেত নতুন বৌ
অকারণে কাঁদছে। হাজি সাহেবের খারাপ লাগতো খুব। মনটা ভীষণ দমে যেত যখন
মা চাচি ফুকুরা একবাক্যে বলতেন,

এত পছন্দ করা বৌ যে কানা হবি, এ আর আল্লার দুনিয়ায়
দেখেছিলাম না।

এক এক সময় হাজি সাহেবের মনে হত, সত্যিই তাই। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট মনে
আছে, আমীরপুর দিয়ে তিনি সাইকেলে আসছিলেন; হঠাৎ চোখ পড়ল একটি মেয়ে
বৈঠকখানা ঝাঁট দিচ্ছে। নেমে পড়লেন তিনি। মেয়েটি প্রথমে খেয়াল করে নি।
মাটির দিকে চেয়ে কোমর বাঁকা করে মেয়েটি আপন মনে কাজ করে চলেছে।
চুলগুলো মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। কাজ করতে করতেই মেয়েটির চোখ পড়েছে রাস্তায়;
চমকে তাকাল সামনে; একটি পর পুরুষ দাঁড়িয়ে। ঝাঁটা তুলেই তীক্ষ্ণ গলায় বলল,

এই গুলামের ব্যাটা গুলাম, তোর মা বুন নেই? ঝাঁটা দিয়ে চুপা ছেঁচে দেব।

সে উত্তর শোনার অপেক্ষা করে নি। বিদ্যুতের মতো পালিয়ে গেল। কিন্তু সেই ক্ষণমুহূর্তের বিদ্যুতপ্রবাহে হাজি সাহেব লক্ষ করেছেন তার সারা শরীর যেন একটি অখণ্ড স্বর্ণখণ্ড, চোখে সমুদ্রের গভীরতা, চুল যেন বেয়ে-পড়া জলপ্রপাত।

তাই তিনি ভাবেন, আমীরপুরের মেই মেয়েটির চোখ সত্যিই বুঝি অন্ধ। কিন্তু সে তো দেখেছে তাঁকে, দেখে গাল দিয়েছে এবং দৌড়ে পালিয়েছে। এক রাতে তিনি বলেই বসলেন,

সত্যি কি তুমার চোখে দোষ আছে?

আপনের কি মনে কয়?

আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু উরা যে কয়, আমার তাই শুনে মনের মদি যে কেমনি করে তা তুমি বোঝ না?

আমার লজ্জা করে।

লজ্জা করা সত্ত্বেও খোদেজা খাতুন তাকিয়েছিলেন হাজি সাহেবের দিকে। বিয়ের পরে সে রাতেই তিনি চকচকে চোখে তাকিয়েছিলেন। ছ'সাতদিনের আধ-জাগ্রত ও আধ-নিদ্রিত চোখ একবারে খোলা পেয়ে যেন সমুদ্রের অনন্ত আস্থানে উদ্বেল হয়ে উঠল; হাজি সাহেব আল্লার কাছে শোকর গোজারী করেছিলেন হাজার বার।

প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর খোদেজা খাতুনের মনে পড়ছে, তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়েছেন নতুন বৌয়ের লজ্জা-নম্র চোখে। হাজি সাহেবের খাওয়া তখন প্রায় শেষ।

তুই কি কি গয়না চাস?

আপনে যা পছন্দ করে দিবেন, তাই লেব।

আমার ইচ্ছে তোক আবার নতুন বোর মতো করে সাজাই। গলায় মালা, নাকে নাকছাবি, কানে মাকড়ি, কপালে টিকলি, হাতে দুই গাছা চুড়ি, সব দেই। এখনো তুই এগুলো পরিস যদি, কিডা কবি পাঁচ ছাওয়ালের মা।

আনন্দের চোটে খোদেজা খাতুন কথা বলতে পারেন না। তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে, কিন্তু তাঁর মনের সাধ আহ্লাদ যে এখনো শেষ হয়ে যায় নি, এই মুহূর্তে তাঁর বেশি করে মনে হয় সেটা। চোখের সামনে আনন্দদায়ক মুহূর্ত সমূহ ছায়াছবির মতো একে একে ভেসে যাচ্ছে, তিনি তাতে অনবরত অবগাহন করে নতুন যৌবন লাভ করছেন।

হাজি সাহেব খাওয়া শেষে গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছে ধীর কণ্ঠে বললেন,

আজ সুনার কামারের দোকানে বানাবের কয়া আইছি।

সত্যি?

বিশ্বাস হচ্ছে না?

কবে দিবি?

দিন সাতেক পর ।

এই আংটিও বানালেন?

না ।

কিনলেন?

না ।

তাহলি?

হাজি সাহেব কয়েক মুহূর্ত চোখ বুঁজে ভাবলেন । খোদেজা খাতুন চোখের দিকে তাকালে দেখতে পেতেন, হাজি সাহেবের চোখে অনেকগুলো সংশয়াকুল প্রশ্ন গভীর ছায়া ফেলেছে বলে পাতাগুলো পিট পিট করছে ।

আমাক একজন দেছে ।

খোদেজা খাতুন এ উত্তরের কোন অর্থ না বুঝে কেবল চেয়ে রইলেন তাঁর প্রৌঢ় স্বামীর দিকে । তাঁর মান্যবর স্বামীকে কেউ খুশি হয়ে কিছু দিয়েছে, এটা নতুন নয় । তিনি গ্রামের মাথা, তিনি হাজি সাহেব, তিনি আল্লার পিয়ারা নবী রসূলে করিম সাল্লুত্লামে আলাহেস সালামের পবিত্র জন্মভূমি মক্কা শরীফ ঘুরে এসেছেন, কাবা দেখেছেন, মদিনায় রসূলের কবরে জিয়ারত করেছেন । শুধু এ নেহালগঞ্জ কেন, আশে-পাশের পাঁচখামেও তাঁর মত পরহেজগার লোক আছে কিনা সন্দেহ । এ গাঁ ছেড়ে সে গায়ে শালিস-ফরিদ বসলে হাজি হাছেন আলী সরদার সাহেবের ডাক পড়ে সর্বাত্মে । এ জন্যে প্রায়ই তিনি এটা ওটা পেয়ে থাকেন; সেটা পারিশ্রমিক বা ঘুষ নয়, আন্তরিকতার নিদর্শন । খোদেজা খাতুন তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করেন,

কিডা?

সোনাপাড়ার ঝাঁ ।

সে আবার কিডা ।

তুই ডাক চিনিস নে ।

এত খুঁয়ে আংটি দিলে ক্যা?

হাজি সাহেব ঢোক গিলছেন । কণ্ঠনালিটা দ্রুত ওঠা নামা করছে । গলাটা খাঁকারি দিয়ে, পরিষ্কার করে, স্ত্রীর মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন,
আমি বিয়ে করিছি ।

ধনুকের ছিলা জিঁড়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ সোজা হওয়ার মতো খোদেজা খাতুন সোজা হয়ে বসলেন । সামনে তাঁর স্বামী, তাঁর পাঁচটি সন্তানের জনক, তাঁর দেহ ও মনের একমাত্র অধিকর্তা, তাঁর রক্ষক, তাঁর ইহকাল পরকালের সাথি । তিনি বিয়ে করেছেন । তাঁর স্বামী তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করেছিলেন । পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন তিনি । বৈঠকখানায় সেই প্রথম দেখার পর তিনদিন যেতে না যেতেই লোক এল; খোদেজা খাতুনের স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই বৈঠকখানায় তার বাপের সঙ্গে কথা হচ্ছে, মিয়া সাহেব, কথাটা চিন্তা করে দ্যাখেন ।

আজিমুদ্দিন মিয়া আল্লার ওপর সবুর দিয়ে বললেন,
আল্লার কলম থাকলি কেউ রদ করবের পারবি না ভাই। সারা দুনিয়া, সারে
জাহানের লোক বিপক্ষে গেলিও কারু বাবার সাধ্য নেই।

তাতো সত্যি! আল্লা কার রুজি যে কোনে বাঁটে থোয়ছে, তা কওয়া কি মানষির
কাম? তো হাছেন পাতুর হিসেবে বড় সরেস। বাপের যা জমিজুমা আছে সবই তার।
জমি কতখানিক?

ঘটক মাথা চুলকে, চিন্তাটা বেশ বিলম্বিত করে বলল,
তা প্রায় বিঘে পঁচিশেক।

একটু দম নিয়ে আজিমুদ্দিন মিয়া বললেন,
ছাওয়ালের অবস্থা ভালই তো জানি। কিন্তু একটা কথা কি জানেন? ঘরে মেলে
না বলেই তো আমি কোন কথা দিবের পারতিছি না।

সিডা আমরাও চিন্তা করছি। তয় ইডাও মনে ভাবে থুইছি, ট্যাকা দিয়ে যদি
উপর ঘরে উঠা লাগে, তাও রাজী। আর শোনে মিয়া সাহেব, আপনে তো আর পর
না; আপনেক সব কথা খুলে কওয়া যায়। ছাওয়ালডার মুখির দিক তাকানে যায় না।

খোদেজা খাতুন বেড়ার আড়াল থেকে সব শুনেছিলেন। নিজের চোখকে তিনি
শাসন মানাতে পারেন নি বলে দরোজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে
দেখেছিলেন, ঘটক তালগাছের পাশ দিয়ে, বাবলা গাছগুলোর নিচে দিয়ে হেঁটে বড়
রাস্তায় উঠল। তিনি দেখেছিলেন, ঘটক রাস্তায় উঠে তাঁদের বাড়ির দিকে একবার
যেই ফিরে তাকিয়েছে, অমনি তিনি বসে পড়েছিলেন টুপ করে। সেদিন তাঁর পরনে
ছিল লাল শাড়ি।

বিয়েতে নাকি মেয়েরা লাল শাড়ি পরে। খোদেজা খাতুন জানতেন না, আজ তাঁর
বিয়ের পয়গাম আসবে। পাড়ার আর সব মেয়েরা দল বেঁধে গীত গেয়েছিল, একটা মিথ্যে
মিথ্যে বিয়ে বাড়ির সৃষ্টি করেছিল। রাগ করে তিনি লাল শাড়িটা খুলে ফেলেছিলেন।

ঘটক আর একদিন এল।

ঘটক আরো একদিন এল।

খোদেজা খাতুন হাছেন আলী সরদারের স্ত্রী হয়ে নেহালগঞ্জে গেলেন। হাছেন
আলী সরদার তখনো হাজি হন নি।

খোদেজা খাতুন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর চোখের সামনে লষ্ঠনের
উজ্জ্বল আলো, ভাতের এঁটো থালা, কাঁসার গ্লাস, অ্যালুমিনিয়ামের ডিসে নওলা মাছের
তরকারি, কাঁসার বাটিতে মসুরের ডাল রান্না, পাতিলে দুধ, টিনের ছোট থালায়
আখের গুড় সবই যেন ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতে লাগল। তিনি একটি পিঁড়ি পেতে বসে
ছিলেন। খপ করে চেপে ধরলেন সেটি। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন হাজি সাহেব।
তাড়াতাড়ি বৌয়ের এক হাত চেপে ধরে বললেন,

তুই অমনি করতিছিস কি কামে?

আমার গাও ছুয়ে কন তো।

এই তো গাও ছুয়ে কছি।

আমার মাথা ছুয়ে কন তো।

এই তো ছুলেম।

আমার চোখ ছুয়ে কন তো।

বিশ্বেস হয় না?

ব্যাটা বেটির মাথায় হাত দিয়ে কন তো।

ধপ করে হাজি সাহেবের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। উদ্বেজনাটা হঠাৎ ধরে ফেলার মত হাতের মুঠোয় নিয়ে এসে কণ্ঠস্বরটা খাদে নামিয়ে বললেন,

এত রাত্তি আমি তোর সাথে মক্কা করবের বসি নাই।

খোদেজা খাতুন হাজি হাছেন আলী সরদারের ওই কণ্ঠস্বর আগে শুনেছেন, ওই কণ্ঠস্বরের সাথে সাথে ছোট হয়ে যাওয়া চোখও দেখেছেন। কিন্তু কোন জবাব এল না তাঁর মুখে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গীর দিকে। বিয়ের দিনে তিন কবুল করে যাকে বরণ করেছিলেন।

তাঁর মনে আছে, কবুল শব্দটি তাঁর গলা দিয়ে একবারও বেরোয় নি। মনে মনে তিনি আউড়েছিলেন অকৃত্রিমভাবে। ঠোট দিয়ে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কি যেন এসে তাঁর গলা আটকে ধরল; সেটা লজ্জা না ভয় তার নাম তিনি জানেন না এবং তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবু ঠোট নড়া দেখে উকিল ও সাক্ষী দুজন বর পক্ষকে গিয়ে জানানলেন, দুলহান দুলহাকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতে রাজী হয়েছে। বাস ওই টুকুই। মাত্র একটি শব্দের তিনবার পুনরাবৃত্তি। হাছেন আলী সরদার অধিকার লাভ করলেন আর খোদেজা খাতুন অধিকার দান করলেন।

এখন তাঁর দ্বিতীয়বার সদ্য বিবাহিত প্রৌঢ় স্বামীর সামনে বসে তাঁর বোধ হতে লাগল, লষ্ঠনের আলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, আলোর উজ্জ্বলতা এক সময় লাল হয়ে কালো রং ধরল। জীবনের যে সমস্ত দিন অতীতে আশ্রয় নিয়েছে, তার মধ্যে তিনি এই মুহূর্তে গভীরভাবে ডুবে যেতে চাইলেন; কিন্তু দেখলেন অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার। তাঁর ধারণায় জন্ম নিল—তিনি পায়খানায় ময়লার মতো, না ময়লায় যে পোকা জন্মে, তার মতো। না তার চেয়েও ঘৃণ্য, কেমন ঘৃণ্য তা তিনি আর বুঝে উঠতে পারলেন না, তবে স্বামীকে তিনি আর খুশি করতে পারবেন না, স্বামী তাঁকে ঘৃণা করবে। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

হাজি সাহেব ভেবে গেলেন না কি করবেন। কিছুকণ বিমূঢ়ের মতো বসে থেকে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে, জীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

তোর দিক তাকায়ই আমি আরেকটা বিয়ে করলেম। তুই কি মনে করিস আমি তোর শরীলের দিক খিয়াল রাখিনে? এত বড় সংসারের কামের চাপ তোর পর, তোক দম সেওয়ানের জন্যই ইডা করলেম।

হাজি সাহেব বুঝতে পারলেন না, তাঁর স্ত্রীর কানে কথাগুলো গিয়েছে কি না। তিনি খোদেজা খাতুনকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। সে ঝাঁকুনির উত্তরে খোদেজা খাতুন বোকার মতো হাজি সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শুধু। চোখের পাতা নড়ছে না, ঠোঁটে স্পন্দন নেই, শরীরে একটি শীতল প্রলেপ পড়েছে। হাজি সাহেব বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলেন,

শালার মহা মুন্সিলে পড়লাম। এ গনির মা, তোর হলে কি?

আমার কিছু হয় নাই তো।

খোদেজা খাতুনের পাতলা কষ্ঠস্বর আরো পাতলা হয়ে হাজি সাহেবের কানে বাজল।

তাহলি তুই অমনি করতিছিস কি কামে?

কৈ?

আমি খোদার কসম করে কছি, তোর মনে চোট দেওয়ার জন্য আমি বিয়ে করি নাই।

আমি চোট পাই নাই।

তুই আমার গাও ছুঁয়ে ক তো!

এই তো।

আমার মাথা ছুঁয়ে ক তো!

এই তো আপনার মাথা ছুঁয়ে কছি।

নিজের মাথা এগিয়ে দেবার সময় হাজি সাহেবের মনে হল, খোদেজা খাতুন যদি মাথায় হাত না দিয়ে গলা টিপে ধরে! মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর বসে পড়লেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারলেন না। খোদার ওপর বার রেখে তিনি প্রথম স্ত্রীকে আশ্বাসবাণী শোনালেও তাঁর মনে হল, এই বিছানাটা যেন তাঁর নয়। এটা যেন খোদেজা খাতুন নাম্নী এক মহিলার; আমীরপুর নিবাসী আজিমউদ্দিন মিয়ার মেয়ে; তিনি তাঁকে চেনেন মাত্র, আর কোন পরিচয় নাই।

মুসলমান তিনি। ঝাঁটি মুসলমান। যেবারে হজে যাচ্ছিলেন সেবারে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের একটি ক্ষীণ সম্পর্ক রেখে গিয়েছিলেন। অথচ সেই ক্ষীণ সম্পর্ক ও আজ রাতের সম্পর্কের মধ্যে কত পার্থক্য! হজে যাওয়ার আগের রাতে স্ত্রীকে কাছে ডেকে ভেজা গলায় বললেন,

আমি যদি আর ফিরে না আসি।

আপনে যে কি কন।

খোদার লেখন, কার মউত কোন জাগায় আছে।

আলাই বালাই।

মনে কর, আমি আর আসলেম না, তুই কি করবু?

আপনের দোহাই, ও কথা মুখে আনেন না।

শোন। হাদিসে আছে, স্বামী বিদ্যাশ গেলি যদি ফিরে আসার সুভাবনা না থাকে, তাহলি এক তালাক দিয়ে যাবি। আর যদি নাই আসে, তাহলি তিন তালাক হয়্যা যাবি।

সে রাত্রে খোদেজা খাতুন এমনি করে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। তিনি স্বামীর বুকে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলেন। হাছেন আলী সরদার বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা, যা সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন না, কেবল এটুকু বোঝেন, এই গ্রাম্য মহিলা স্বামী ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু বোঝে না।

হাজি হাছেন আলী সরদার একটা পান চিবুতে চিবুতে ঘুমিয়ে পড়লেন। মেঝেয় স্থবির হয়ে বসে থাকা পুরনো স্ত্রীকে ডাকার মতো সাহস হল না তাঁর।

হাজি সাহেব কথা ঠিক রেখেছেন। সাতদিন পর তিনি খোদেজা খাতুনের প্রতিশ্রুত গহনা নিয়ে এলেন। এবং ও দিন বিকেলেই তিনি ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁর দ্বিতীয় বৌ আনলেন। হাজি সাহেবের নজর সমান। সবাই দেখল, দুই বৌ সমান অলংকার পেয়েছেন।

সবাই আরো দেখল, খোদেজা খাতুন সত্যিই বেহায়া। মানুষ বলে, সতীনের সংসার, না দোজখের আগুন। এই আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে যাচ্ছে এই বয়স্কা মহিলা, অথচ তাঁর সাজের বাহার দেখলে মনে হয়—বিয়ে তাঁরই। তাঁর বঁড় মেয়ে ময়নার বিয়ের বয়স হয়েছে, অথচ তার সামনে বুড়ি মা কেমন নির্লজ্জের মতো সব গহনাগুলো একে একে পরলেন। পরে আবার তা আয়না ধরে ধরে দেখলেন। হাজি সাহেব, প্রথম বৌ খুশি হয়েছেন দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বারকয়েক তাঁকে তাকিয়ে দেখে পুলকিত ও লজ্জিত—দুটোই হলেন।

তখন অনেক রাত। ইদানীং যে অনেক রাতে হাজি সাহেব বাসায় ফিরতেন, তার চেয়েও অনেক, অনেক বেশি রাত। খোদেজা খাতুন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। পাশে তাকিয়ে দেখেন তাঁর বিবাহযোগ্যা মেয়ে ময়না হা করে ঘুমুচ্ছে, ছোট ছেলে আবুল পেশাব করে বিছানা ভাসিয়ে দিয়েছে, তার বড়োটা মকবুল দ্বিতীয় মেয়ে হালিমার পেটের ওপর এক পা তুলে রেখে ঘুমুচ্ছে। গনি ওর দাদির কাছে। তিনি লষ্ঠনের আলোটা আরো তীব্র করে জ্বলে দিলেন। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। গলায় মালা, নাকে নাকছাবি, কানে মাকড়ি, কপালে টিকলি, হাতে চুড়ি—সমস্ত আলো পেয়ে হেসে উঠল। খোদেজা খাতুনও হাসলেন।

তোষকের নিচে থেকে তিনি দেশলাইটা বের করলেন। ধীরে ধীরে দরোজাটা খুলে, বাইরে এসে দ্যাখেন, হাজি সাহেবের ঘরে একটি জানালা তখনো খোলা রয়েছে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। পায় পায় এগিয়ে গেলেন তিনি। খোলা জানালার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখেন, বিছানায় হাজি সাহেব ও জয়নাব বানু শুয়ে আছেন। লষ্ঠনের অল্প আলোয় গহনাগুলো ঝিকমিক করছে।

তিনি দেশলাই থেকে একটা কাঠি বের করলেন। জানালা দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলে অনায়াসে মশারি নাগাল পাওয়া যায়। দেশলাইটা জ্বাললেন তিনি। ওটা ভেতরে ছুঁড়ে দেবেন।

পরদিন সকালে খোদেজা খাতুনের পোড়া ক্ষত বিক্ষত মৃহদেহ পাওয়া গেল বাড়ির পেছনে।

আগুনে পুড়লে সোনা খাঁটি হয়। খোদেজা খাতুনের গহনাগুলোর উজ্জ্বলতা যেমন বেড়েছে, খাঁটিও হয়েছে শত গুণ।

বোধি

মনে পড়ছে রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখেছি। অথচ স্বপ্নটি যে কি তা মনে পড়ছে না। সকালে ঘুম থেকে জেগে অন্যান্য দিন বিছানায় শুয়েই একটি সিগারেট ধরাই, মশারিটা তুলে রাখি, চোখ বুঁজে সিগারেট টানি, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা দিয়ে চেপে-রাখা সিগারেটের ছাই ঝাড়ি এবং আবোল তাবোল কথা চিন্তা করি। পাশের ঘরে তখন ছোট ভাই-বোন উচ্চকণ্ঠে পড়াশোনা করে, মা নিম্নকণ্ঠে কোরান তেলাওয়াত করেন, বাসার পাশের মোট্রা দোকানদার উচ্চগ্রামে রেডিও ছেড়ে দিয়ে সিলোন রেডিওর হিন্দি গান শোনে, কাজের বেটি রোশনা কলের পাড়ে থালা বাসন ধোয়।

আমার সিগারেট খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ও-ভাবেই শুয়ে থাকি। কিন্তু আজ মনে থাকা সত্ত্বেও সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করল না। চোখ বুঁজে পড়ে রইলাম আর অনবরত ভাবতে চেষ্টা করলাম—কী যেন স্বপ্নটা। রাতে ঘুমের ঘোরে তো কত আজ্ঞে বাজ্ঞে, অর্থহীন বিচিত্র মজার স্বপ্ন দেখি; সেগুলো মনে রাখার কথা তো মনে হয় না! কিন্তু আজকের স্বপ্নটা আমাকে সত্যি ভাবিয়ে তুলেছে। কাউকে বলতে পারলাম না। এমন কি, মনে করে নিজেকেও যে শোনাবো তারও উপায় নেই।

স্বপ্নটা মনে হলে প্রথমে শোনাতাম মাকে। কিন্তু মা এখানে নেই। দেশের বাড়িতে গেছেন ছোট ভাইটিকে নিয়ে। আমার এখানে আছে আমার ছোট দুই ভাই ও এক বোন। ছোট বোন এসে ডাক দিল,

দাদুভাই, উঠবে না?

কটা বাজ্ঞে?

সাড়ে সাতটা।

মাত্র! আজ রবিবার, এত সকালে ঘুম থেকে উঠে কি হবে রে?

রবিবার বলেই তো তোমাকে এখন উঠতে বলছি। তুমি নিজে একটু বাজারে যাও।

জানিস হেনা, আজ আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি; অসাধারণ স্বপ্ন। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না এখন।

বুঝেছি, ঐ কল্যাণী আপনার কথাটথা হবে।

নায়ে।

আমার প্রতিক্রিয়াহীন জবাবের কোন পাত্তা দিল না হেনা। চলে গেল পৌরনীতির সংজ্ঞা আউড়াতে আউড়াতে।

বিছানা ছেড়ে উঠে গোলাপি ব্রাশে সবুজ রঙের পেষ্ট লাগিয়ে দাঁত ফমলাম বেশ অনেকক্ষণ ধরে। দাঁত ঘষা শেষ করে ঘাড়ভাঙা ঘটিতে পানি নিয়ে মুখ ধুলাম, খ্যাক খ্যাক করে জিবের ময়লা পরিষ্কার করলাম, হাতে পায়ে পানি দিয়ে ঘরে বসে তৌয়ালে দিয়ে হাত-পা-শরীর মুছে হেনাকে ডাক দিলাম,

হেনা, বাজারের টাকা দে।

কিছু না খেয়েই যাবে?

মতির দোকানে গিয়ে চা খাব।

টাকা নিয়ে বাজারে রওনা দিলাম। স্বপ্নের কথাটা তখনো মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু মনে পড়ছে না কিছুতেই। মতি দোকানদারের কর্মচারী হিরু বলল,

স্যার দুধ নেই।

দুধ ছাড়াই দে।

আমার হুকুম পাওয়ার পর পরই হিরু ছুটে গিয়ে মিনিট খানেকের মধ্যে চা নিয়ে এল। জ্বাল পড়তে পড়তে লিকারটা কালো হয়ে গেছে। চায়ের কালো রং দেখেই চট করে মনে পড়ল স্বপ্নটার কথা। কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে, ধোঁয়ায় আমার চশমার কাঁচ দুটো কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে; সেই কুয়াশার আবছা অন্ধকারে আমার মনে পড়ল— আমি গত রাতে হেঁটে যাচ্ছি সেগুন বাগানের চিড়িয়াখানার সামনের রাস্তা দিয়ে। তখন অনেক রাত। হাতে ঘড়ি ছিল কি না মনে নেই; তবে অনুমান করলাম আড়াইটে-তিনটে হবে। অত রাতে ঐ রাস্তা দিয়ে কেন আমি যাচ্ছিলাম, তারও কারণ নেই। একেবারে নির্জন রাস্তা, অথচ আমার মোটেই ভয় করছিল না। আপন মনে এগুচ্ছি আমি চিড়িয়াখানার দিক থেকে হাইকোর্টের দিকে। হঠাৎ দেখি একটি লোক আমার বিপরীত দিক থেকে আসছে। আমার চোখকে আমি বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না, এত লম্বা একটা লোক হয় কি করে। প্রায় সাড়ে সাত ফুট আট ফুট হবে। লোকটির পরনে কালো আলখাল্লা, প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। একে গভীর ও অন্ধকার রাত, তার ওপর সর্বাঙ্গীন কালো পোশাকে আচ্ছাদিত বিশালাকার লোকটিকে দেখে আমি ভয় পেলাম না। লোকটির ছিল অসাধারণ উজ্জ্বল চেহারা। দিনের আলোয় যদি তাকে দেখতাম, হয়তো কাঁচা হলুদের সঙ্গে তুলনা করা যেত।

চেহারার ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিনতে পারলাম, লোকটি হজরত সুলেমান। কিন্তু আমি জানি না, আমি তাঁকে চিনলাম কি করে। খ্রিষ্টান ধর্মের বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকায় হজরত সুলেমানের যে ছবি দেখেছি, এমনকি সুলেমানরূপী ইউল ব্রাইনারকে চলচ্চিত্রে জ্যান্ত দেখেছি, তাদের কারো সঙ্গে এই স্বপ্নের সুলেমানের কোন মিল নেই। তিনি যেন সত্যিই আত্মার নবি, যেমনটি করেক হাজার বছর আগে ছিলেন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি

আমার সামনাসামনি খেমে গেলেন। একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর অতি ধীরে বললেন,

আমি তোমাকে কিছু জ্ঞান দান করব।

আমার মনে পড়ল, হজরত সুলেমান পৃথিবীর চিরকালের সমস্ত মানুষের মধ্যে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ। তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই দেখতে পারেন, পড়তে পারেন। তিনি পারেন পতপাখির ভাষা বুঝতে, তিনি পারেন মানুষের চিন্তার অগম্য জগতের তথ্য পরিবেশন করতে। সেই জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হজরত সুলেমান আমাকে জ্ঞান দান করবেন, আমি আনন্দ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

আমি নিজেকে প্রভুত্ব করেছি জ্ঞান গ্রহণ করার জন্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল,

তুমিও যেমন, ঐ ভণ্ডের কথা বিশ্বাস কর? চল, যত রাজ্যের খাণ্ডা।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে মনটা ঘুরিয়ে ফেললাম তার দিকে। কিন্তু সে যে কে, তা আমি দেখি নি। শব্দগুলো এলো আমার কানের পাশ থেকে।

আমার ঘুম ভেঙে গেল। বেশ অনেকক্ষণ আমি অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত রেখে স্বপ্নের কথাটা ভাবলাম। এই স্বপ্নটা আমি কেন দেখলাম। জীবনে আমি এমন কিছু পুণ্য কাজ করি নি, যার জন্যে এমন মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখব। কিন্তু দেখেই বা কি লাভ হল, তিনি আমাকে যা দিতে চাইলেন, তাতো নিতে পারলাম না! দিক্কার এলো পার্শ্ববর্তী অদৃশ্য ব্যক্তির কথার মনোযোগ দেবার জন্যে। স্বপ্নটা দেখার পর আমি আরেকবার ঘুমিয়েছিলাম। হয়ত সে জন্যেই সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত মনে আনতে পারছিলাম না।

স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে চা খাওয়া হয় নি। এদিকে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চায়ের পয়সা দিয়ে, কোনমতে বাজার সেরে প্রায় দৌড়ে বাসায় এসে দরোজার কাছ থেকেই চিংকার করে ডাক দিলাম,

হেনা, স্বপ্নের কথাটা মনে পড়েছে।

আবার টেলিগ্রাম এসেছে।

টেলিগ্রাম! দেখি।

হেনা তীত সজ্জ পায়ে টেলিগ্রামটা এনে দিল।

ওর হাত কাঁপছে। টেলিগ্রামটা পড়বার আগেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুতের কষাঘাত হল। দ্রুত পড়ে ফেললাম টেলিগ্রামটা। না, আবার তেমন গুরুতর কোন সংবাদ দেন নি। কেবল বলেছেন, 'খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এস। সকালের প্রেনেই আসতে চেষ্টা কর।' কোন নির্দিষ্ট সংবাদ নেই, কিন্তু তার গুরুত্ব আছে। নিশ্চয়ই আমাকে কোন প্রয়োজন পড়েছে তাঁর, তাই নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘড়ি দেখলাম। তখনো আধ ঘণ্টা সময় আছে। কোন রকমে সেরে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাসা থেকে বিমানবন্দর অবধি যে কথাটা বারবার মনে হচ্ছিল,

সেটি হচ্ছে—আমি বাড়ি যাচ্ছি সে-কথাটা কল্যাণীকে জানানো হল না। অথচ আজ ওকে নিয়ে ছবি দেখার কথা। আড়াইটের ওদিকে কোন এক বান্ধবীর বাসায় যাওয়ার নাম করে সোজা চলে আসবে আমার বাড়ি; তারপর সেখান থেকে ম্যাটিনি শো'তে। কল্যাণী নিশ্চয় আসবে, আমাকে না দেখে ক্ষুব্ধ হবে হয়ত এবং কি ভাববে জানি নে। হাতে আর কিছুটা সময় থাকলে ওর বাসা হয়ে ঘুরে যাওয়া যেত। কিন্তু সম্ভব নয়; যদি প্লেন না পাই! কপাল ভাল বলতে হবে। একটি চান্স টিকেট পেলাম।

প্লেনে বসে কল্যাণীর কথা বেশি মনে হল না। কল্যাণীর স্থানটা দখল করেছে টেলিগ্রাম। আক্বা কেন এত জরুরি টেলিগ্রাম করেছেন। শুনেছি ছেলেকে বিয়ে দেবার আগে পিতা-মাতা প্রায়ই এ-ধরনের টেলিগ্রাম করে থাকেন—মাদার অথবা ফাদার সিরিয়াস, কাম শার্প। ছেলে শঙ্কিত মনে গিয়ে হাজির হয়, যাবার আগে পরিচিত লোকজনকে জানিয়ে যায়, মা অথবা আক্বাকে বুঝি আর পাবো না গিয়ে। অথচ ফিরে আসে হাসতে হাসতে, লজ্জার আবীর মেখে সারা গায়ে চোখে মুখে। আক্বাও মনে হয় সেইজন্যেই আমায় টেলিগ্রাম করেছেন, আমাকে বিয়ে দিবেন। আক্বা মা প্রায়ই বলতেন, এখনো বলেন,

আমরা মরে যাবো, আর বেটার বৌ দেখব না?

যখন সময় হবে তখন আপনিই দেখবে।

সময় কবে হবে?

সত্যি সময় যে কবে হবে, সেটা আমিও জানি নে। মাঝে মাঝে যখন তাদের অনুরোধের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন নিরুপায় হয়ে বলি,

বড় ভাই বিদেশে, তিনি বিয়ে করেন নি, আমি কেন বিয়ে করবো?

এ কি মেয়ে যে ছোট বোনের আগে বিয়ে হলে বড় বোনের বিয়ে হবে না? আইবুড়ো থাকবে?

অকাট্য যুক্তি। তাঁরা অজস্র প্রমাণ দেখান কোর্ট-কাছারি-হাইকোর্টের উকিল-এ্যাডভোকেট-ব্যারিস্টারের মত। আমি অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাই, সময় চাই।

এবারে হয়ত আমার আবেদন গ্রাহ্য হবে না! সকল মুকুর্বি মিলে ধরবেন, আমি কিছুতেই না করতে পারবো না। চট করে মনে পড়ল, কল্যাণীর বাড়িও তো আমার জেলাতেই। এবং কল্যাণীর সঙ্গে আমার মেলামেশার কথা মা জানেন। তিনি নিশ্চয় আক্বাকে বলেছেন, আক্বা কথা-বার্তা চালিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্লেনে এয়ার হোস্টেস নেই, ষ্টুয়ার্ড এসে বললেন,

টফি প্রিজ।

চিন্তার মোড়টা ফিরে গেল। গোটা তিনেক টফি তুলে নিলাম। সেগুলো একটা একটা করে মুখে দিচ্ছি আর দেখছি আমার মাতৃভূমিকে। যেন ছবির মত করে কোন নিপুণ কারিগর গাছপালা, বাড়িঘর, নদীনালা সাজিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এ সৌন্দর্য আমার ভাল লাগল না। টেলিগ্রামটার লালচে কাগজে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে

টাইপ করা নির্দেশটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। নিশ্চয়ই আবার অসুখ। অথচ আকাই তো টেলিগ্রাম করেছেন। এমনও হতে পারে আবার নামে অন্য কাউকে করেছে। টেলিগ্রামে তো আর হাতের লেখা থাকে না। চিন্তাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। আবার বয়স হয়েছে, মৃত্যুর নোটিশ পাওয়া অসম্ভব নয়।

আমার পিতা, আমার জনক, পৃথিবীতে আমার পথপ্রদর্শক। তাঁর মৃত্যু হবে এবং আমি গিয়ে তাঁকে নিজ হাতে শুইয়ে আসবো অপরিচিত রাজ্যের পরিচিত ঠিকানায়। আমি কি পারবো সেটা সহ্য করতে? আমি যেন নিজের মনের কাছে কান এগিয়ে নিয়ে শুনে পেলাম—পারতে হবে, পৃথিবীর চিরন্তন নিয়মে সেটা মানতে আমি বাধ্য। আচ্ছা, আকা না হয়ে যদি মা মারা যান? বিচিত্র নয়। মা যখন এখান থেকে গেলেন, তখন তাঁর শরীর তেমন ভাল যাচ্ছিল না। কিছু ওষুধ-পত্র সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম। সম্ভবত তাতে কাজ হয় নি। আকা কি চেষ্টার ক্রটি করেছেন? আর মৃত্যু হলে চেষ্টা বা মূল্যবান ওষুধপত্রও কিছু করা যায় না। সবই সাধারণ ও মানার মত যুক্তি। হতে পারে অথবা নয়।

প্রেম থেকে দেখলাম, যমুনা নদী পার হয়ে গেলাম, যমুনার এপারে ঢাকা ওপারে পাবনা—আমার নিজের জেলা। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখলাম সবুজ ধানের নিস্তরঙ্গ নৃত্য। আমাদেরও ধানের মাঠে নিশ্চয়ই এমন সবুজ ধানের মেলা বসেছে। আচ্ছা, আকা জমিজমার গুণগোলের জন্যে যেতে বলেননি তো? বেশ কিছুদিন থেকে চাচাদের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে ভেতরে ভেতরে মন কষাকষি চলছিল। পরিস্থিতি বর্তমানে হয়ত বেশ জটিল হয়ে উঠেছে, তাই আমার ডাক পড়েছে। অথবা ছেলদের মধ্যেই তিনি জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেবার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। আমি কিছুতেই পারছি নে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে। আমার জ্ঞান এতই সীমাবদ্ধ, বা ধারণা এতটা সীমিত যে হজরত সুলেমানের মত অতীত-ভবিষ্যৎ একবারে জানা সম্ভব হবে।

আসলে আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। মনে হয় হতে পারে এটা, অথবা নয়। অসম্ভব কিছুই নয় ওটা ঘটনা, আবার হলে অসম্ভব বলে চিন্তা করতে পাগল হয়ে যেতে হবে।

প্রেম ঈশ্বরদী পৌঁছল। মোটর পাবনা পৌঁছল। রিকশা ক্রমশ আমার বাড়ির নিকটবর্তী হচ্ছে। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির কাছে এসে একজন পরিচিত লোকের দেখা পেলাম। সে আনায় কিছু বলল না। কেবল চোখ তুলে চাইল, সে চোখে অর্থহীনতার ব্যঞ্জনা। অন্য বার এলে এবং দেখা হলে হেসে বলে,

কখন এলে? বাড়িতে কদিন থাকবে? লেখাপড়া শেষ হয়েছে?

আমি কিছু বুঝতে না পেরে শুধু বোবা হয়ে চেয়ে রইলাম এখনকার নিষ্ক্রিয় আচরণ দেখে। দোষ দিলাম না তাকে। আমি ঢাকা থেকে গিয়েছি, তার তুলনায়

আমার পেটে বিদ্যে আছে অনেক বেশি, আমি পুনে চড়ি, আমি দামি জামা-কাপড় পরি, একটার পর একটা সিগারেট খাই ও আরো কত কিছু করি যা তাদের ধারণায় আসে না। আমার নিজের উপরই রাগ হল। কিন্তু তখন আমি অনেকদূর চলে গেছি। নছির মোল্লার সাঁকোর কাছে গিয়ে মান্নানের সাথে দেখা। মান্নান সাইকেল চড়ে আসছিল। কাছাকাছি গিয়ে দেখা হল। আমি হেসে চাইলাম। ও হাসির উত্তর না দিয়ে কেবল বলল,

টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ।

মান্নান আমাকে অতিক্রম করে অনেকদূর চলে গেছে। আমি ক্রমশ রহস্যের গভীরে নিমজ্জিত হচ্ছি। দুজন পরিচিত লোকের একজনও আসল কথা না বলে যেন ইচ্ছে করেই তারা পাশ কাটিয়ে গেল।

আমার রিকশা বাড়ির কাছে এসে গেছে। ফুফাতো ভাই লুৎফর বলল,

তোর জন্যেই অপেক্ষা করা হচ্ছে।

আমার জন্যে, কেন?

টেলিগ্রামে কিছু লেখেনি?

না তো!

চল।

কি হয়েছে?

লুৎফর জবাব দিতে পারল না। সবই সে জানে, বুঝতে পারলাম, উত্তর জোগাল না তার মুখে।

আমি ছুটে বাড়ির মধ্যে গেলাম। মাকে দেখলাম না, আক্বাকে দেখলাম না, অঞ্চ পরিচিত অন্যান্য বহু লোক দেখলাম। বাড়িতে চিৎকার করে কান্নাকাটি হচ্ছে। আমার ছোট ভাই মারা গেছে। পানিতে ডুবে। বাড়ির পাশেই পুকুর, গোছল করতে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। যখন ফিরল, তখন সে আর বেঁচে নেই।

তার শরীরটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। আমার ছোটভাই; আমি নিজের হাতে আসার আগে ওকে জুতো কিনে দিয়েছি, দামি কাপড়ের প্যান্ট দিয়েছি। সবচেয়ে ছোটভাই বলে প্রায়ই আমার গলা ধরে ওয়ে থাকত। সবচেয়ে বেশি দুই ছিল বলে সকলের চেয়ে বেশি আদর পেত। আমার সেই আদরের ছোটভাই। সাদা কাপড়ে আবৃত। সে এখন যাত্রী মানুষের জ্ঞান-বহির্ভূত একটি রাজ্যে।

গতরাত্ত্রের স্বপ্নের কথাটা মনে হল। কালো পোশাকে আবৃত সেই বিশালাকার লোকটি আমায় বলছেন,

আমি তোমায় কিছু জ্ঞান দান করব।

আমার জানে কালো পোশাক ও সাদা পোশাকের কোন পার্থক্য ধরা পড়ে না

অচেনা

ইউসুফ সাহেব প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে, মহা সমারোহে, ধুমধাম করে, বহু গণ্যমান্য অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি একমাত্র ছেলের বিয়ে দিলেন। সাধারণত শহরের বাড়িতে উৎসবের জের একদিনের বেশি থাকে না, কিন্তু তাঁর বাড়িতে উৎসব লেগে রইলো প্রায় সাতদিন, আত্মীয় অনাত্মীয়ের আতিথ্য, আনাগোনা, আগমনে মনে হলো এ বাড়ি থেকে উৎসব বুঝি কোনদিন থামবে না।

পরিচিত মহলে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো,

মা-হারা ছেলের বিয়েতে ভদ্রলোক দেখালেন বটে।

দিল দরিয়া লোক, সন্দেহ নেই।

করবেনা কেন, একমাত্র ছেলে, তার ওপর বড়লোক। থাকতো যদি পাঁচ সাতটা, তবে বুঝতো দিন কোনদিক দিয়ে যায়।

সব কথাই কানে আসে ইউসুফ সাহেবের। লোককথাকে তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেন নি, আলোচনা করেন নি, উচ্চবাচ্য করেন নি, তাই এ সমস্ত মন্তব্যও সাধারণ বাতাসের মতো তাঁকে স্পর্শ করে গেলো, অভিভূত করলোনা। তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পরপরই তো মা চাচি বোন সবাই ধরে বসেছিলো,

তোর আবার বিয়ে করা উচিত।

ভেবে দেখি। অত্যন্ত শাস্ত কণ্ঠে জবাব দেন ইউসুফ সাহেব।

এর মধ্যে আবার ভেবে দেখার কি আছে? একদিনের ছেলে রেখে মা মরে গেলো, ছেলে মানুষ করতে হবে না?

ভেবে দেখি। পুনরাবৃত্তি করেন তিনি।

মা, চাচি বোন অনুমান করে স্ত্রীর মৃত্যুটা সহজে ভুলতে পারছেননা ইউসুফ। এবং সাথে সাথে সিদ্ধান্তেও আসে, কিছুদিন গেলে আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ছেলে মানুষ করবে কে?

ছেলে ইউসুফ সাহেব কাউকে দিলেন না। নিঃসন্তান চাচি যখন চূড়ান্ত কথা জানার জন্যে ইউসুফের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ছেলের দিকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে শিশু, পালের এক পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে একটা সাদাটে রেখা পড়েছে, পেশাব করে ভিজিয়ে রেখেছে কাঁথাটা, আর এমন হাঁ করে

নিশ্বাস নিচ্ছে যে মনে হচ্ছে নিশ্বাসের সাথে মা মা করে ডাকছে। ইউসুফ সাহেব কিছু অনুভব করতে পারেন না, শিশুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের সামনে একটা ধোঁয়াটে রেখার সৃষ্টি হয় তিনি দেখতে পান, ইউসুফ সাহেব নয়, তাঁর স্ত্রী নয়, এমন কি শিশু পুত্রও নয়, তিনজনের সমন্বয়ে একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

এবং সেই মুহূর্তে চাচিকে চমকে দিয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন,
পাবেন না ছেলে, যান, বেরিয়ে যান।

ইউসুফ কি পাগল হয়ে গেলো? চেহারা, কথাবার্তা, আচার আচরণে কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই, তথাপি ইউসুফ যেন পাগল, বৌয়ের শোকে একেবারে মুহ্যমান। আবার আত্মীয় স্বজনের আলোচনা সভা বসল—ইউসুফের এই রোগ মুক্তির উপায় কি।

কিন্তু পুনরায় সকলকে আশ্বস্ত হতে বলে ইউসুফ সাহেব ছেলেকে কোলে করে নিজের ঘরে গিয়ে মায়ের আদরে ঘুম পাড়াতে লাগলেন।

ইউসুফ সাহেবের এই সেই ছেলে শুভ; মায়ের আদর পান নি, কিন্তু বাবা তাকে মানুষ করেছে মায়ের অধিক স্নেহ দিয়ে, আদর যত্ন করে। গ্রাম থেকে অতি বিশ্বাসী, পরিচিত একজন বৃদ্ধাকে এনেছিলেন দেখাশোনার জন্যে, কোন যুবতীকে আনলে কানাঘুষো শুরু হতে পারে—সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন অতিশয় সচেতন। বহুদিন অফিস কামাই করেছেন, জরুরি কাজে যাননি ও আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের বাড়ির আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণ করেছেন প্রত্যাখ্যান। নাম রাখার জন্যে কারো সঙ্গে আলাপ করেন নি, কারণ রানি ও ইউসুফ দুজনে মিলে আগেই নাম ঠিক করে রেখেছিলেন। ইউসুফের প্রস্তাব,

ছেলে হলে শুভ, মেয়ে হলে ক্ষমা।

প্রথমেই মেয়ের নাম ক্ষমা, না, ভালো শোনায় না।

দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে রানি জবাব দেয়। কোন বিষয়ে দৃঢ় মতামত পোষণ করে মন্তব্য করতে গেলে রানির চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন ইউসুফ সাহেব বলেছেন,

তুমি কোন বিষয়ে দৃঢ় মতামত না জানিয়ে কেবল চোখ বুঁজলেই আমি বুঝতে পারবো।

রানি হাসে। স্ত্রী-সুলভ অঙ্গভঙ্গি করে।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ইউসুফ কোন রসিকতা করেন না। রানির দৃঢ়তর জবাবেই তিনি পাল্টা জবাব দেন,

তুমি বুঝতে পারছোনা, ক্ষমা নামে আমি যে বাচ্চা-কাচ্চা আর না হয় তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি, আসলে তা নয়। ক্ষমা যার নাম হবে, সে হবে একজন ক্ষমার প্রতীক, ক্ষমার মতো একটা মহৎ গুণের অধিকারিণী হবে সে।

রানি কোন জবাব দেয় না। প্রত্যন্তরে মিটমিট করে হাসে। কিন্তু তার পরই সে এমন একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করে, যা শুনে ইউসুফ কোন প্রকার হাসি বা মন্তব্য ভুলে গিয়ে বিমূঢ়ের মতো স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন।

আমার হাতে আছে, বাচ্চা হওয়ার সময় আমি মরে যাবো। এই দ্যাখো, লাইফ লাইনের ঠিক মাঝখান দিয়ে ক্রস, যার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।

বেশ অনেকক্ষণ পর জবাব দেন ইউসুফ,

গণক বলে নি যে একবার মরলে আর বাঁচবে না?

তুমি না হয় বিশ্বাস করোনা, কিন্তু আমি করি।

হঁ। আমার হাতেও তো ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পেনেই চড়তে পারলাম না।

পরম ধর্মিকের মতো জবাব দেয় রানি,

তুমি বিশ্বাস করোনা, তাই হয় না।

রানির মৃত্যুর পর ইউসুফ সাহেব এই একটা কথাই বারবার ভেবেছেন, সত্যিই কি রানি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলো? মাত্র দেড় বছরের জন্যে রানি ইউসুফের জীবন অধিকার করে থাকবে, এ-কথা যদি তার অন্তরাত্মা আগেই জানতো, তবে ইউসুফকে ভালোবেসে বিয়ে করার কোন সদযুক্তিই খুঁজে পান না ইউসুফ। তখনই তাঁর মনে হয়, রানি স্বার্থপর। এবং তার পর থেকেই একে একে তাঁর মা, বোন চাচি সকলকে রানির সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে দেখা তাঁর একটা রোগের মত দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেটা? রানিতো বলে গেছে,

যদি আমি মরে যাই, তাহলে বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিও।

বাজে কথা বলো না। ধমকে ওঠেন ইউসুফ।

আচ্ছা, তা যদি না দাও, তবে বড়বুর কাছে দিও। যত্নে মানুষ হবে।

এর কি জবাব দেবে ইউসুফ? যে অন্ধবিশ্বাস তাকে দিনরাত ক্ষয় রোগের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে, তা থেকে সে তাকে কেমন করে উদ্ধার করবে! স্বার্থপর না কে? সে নিজেও তাই। নইলে তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন সবাইকে দূরে সরিয়ে আজ সে একটি শিশু-পূজায় মগ্ন, কাউকে আসতে দেয় না, যেমন শিকারি পাখির আক্রমণ থেকে মুরগি তার বাচ্চা পেটের নিচে আগলে রাখে।

এবং সেই একই স্বার্থপরতার শিকার হয়ে ইউসুফ সাহেব নিজের ঘরে পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দেন নি। এমনকি শুভকেও ঢুকতে হলে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হতো। নিজের ঘরটা কোণায়, মাঝে দুয়িং ক্রম, বাইরের ঘরটা শুভ'র থাকা ও পড়াশুনো, রান্নাঘরের পাশে গ্রানের সেই বৃদ্ধা মহিলা। একদিন বাবার অনুমতি না নিয়ে শুভ ঘরে ঢুকেছিলো। ইউসুফ সাহেব যেন মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেক রাত, পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, শুভও পড়াশুনো শেষ করে রাতে পেশাব করতে যেতে দ্যাখে, বাবার ঘর অন্ধকার, অথচ দরোজা খোলা। বাবা কি

ঘুমিয়ে পড়েছেন? বাবা ঘুমিয়ে, চুরি হতে পারে, দরোজার কাছে গিয়ে শুভ ডাক দ্যায়,

বাবা, বাবা।

কোন জবাব নেই।

বাবা, তুমি কি ঘুমিয়েছো?

তবুও কোন জবাব নেই।

তখন শুভ ঘরের মধ্যে গিয়ে লাইট জ্বালাতেই চিৎকার করে ওঠেন ইউসুফ সাহেব,

আলো নেভাও।

খতমত খেয়ে হঠাৎ যেন পাথর হয়ে যায় শুভ।

আলো নেভালে না?

আমি ভাবলাম তুমি দরোজা খুলেই ঘুমিয়েছো। ভীত ও পাতলা কণ্ঠে জবাব দ্যায় শুভ।

না, আমি অতোটা পাগল হই নি যে এই সং দেশে দরোজা খুলে ঘুমোবো।

আর তারপরেই শুভকে চমকে দিয়ে ইউসুফ সাহেব প্রশ্ন করেন,

তুমি কি এজন্যেই এ-ঘরে এসেছো?

হ্যাঁ।

না, অন্য কোন উদ্দেশ্য?

না।

তুমি হয়তো ভেবেছো, বাবা একা একা কি করে, কেন কাউকে ঢুকতে দ্যায়না, কেন এই গোপনীয়তা আর কীই বা রহস্য!

মুহূর্তে দেখতে পান ইউসুফ সাহেব, শুভ যেন একজন পরিপূর্ণ যুবক, দায়িত্বশীল মানুষ। বাবার কণ্ঠের সঙ্গে সমতা রেখে সেও জবাব দ্যায়,

সেটাই যদি ভাবতাম, তাহলে তোমাকে ডাক দিতামনা। বহু দিন বহু সময় পেয়েছি, তোমার ঘর খুলে তন্ন তন্ন করে সব কিছু দেখতে পারতাম, কিন্তু আমি দেখি নি।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেননা ইউসুফ সাহেব। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন তার একমাত্র মাতৃহীন পুত্রের দিকে, যে শিশু ও কিশোরকালে তার বুকের ওপর শুয়ে থেকেছে, শৈশবে বহু বহু দিন পায়খানা পেশাব করে দিয়েছে, সাথে সাথে অফিসে গেছে, দিনে একটা মুহূর্তের জন্যেও কাছ ছাড়া হয় নি, সেই শুভ। ছোটবেলায় চাচির আবেদনের উত্তরে কল্পনায় যে একজন অচেনা মানুষকে সে দেখতে পেয়েছিলো, সে-ই যেন এখন তার সামনে তার প্রতিভূর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। একভাবে তাকিয়ে রইলেন। তিনিও একসময় সচেতনভাবে লক্ষ করলেন, শুভ তার সামনে নেই।

দরোজা শুভও আটকায়নি। ঘর অন্ধকার, যেন পিতার ঘরের পরবর্তী জীবনের অংশ এখানে অভিনীত হচ্ছে। ইউসুফ সাহেব আলো জ্বাললেন, দেখলেন, শুভ'র সারা শরীরটা কলা পাতার মতো না না করে কেঁপে চলেছে। মাথায় হাত রাখলেন তিনি। ক্ষণস্থায়ী বাতাসে সামান্য কেঁপে-ওঠা-পর্দার মতো শুভ কেঁপে স্থির হয়ে গেল।

উঠে আমার সাথে আয়।

কোথায়?

আয়।

ঘরে নিয়ে তিনি আদর করে শুভকে পাশে বসালেন। কোন প্রকার ভূমিকা নয়, শুধু করলেন তিনি,

অন্ধকার আমার বড্ড প্রিয়; আলো দেখলে নিজের শরীর দেখা যায়, চেহারা দেখা যায়, আমার ভীষণ ভয় করে। তুই দেখিস না, আমি সারাদিন কেমন আচ্ছন্নের মতো ঘুমাই? রাতেও কি ঘুমাই? না, অন্ধকার ঘরে জেগে বসে থাকি।

এবার স্বাভাবিক হয়ে যায় শুভ'র কণ্ঠ।

কেন, গতরাতে অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলেছে।

যেদিন নিজেকে বোঝা মনে হয়, সেদিন রাতে বই পড়ি। কালরাতে, এই দ্যাখো, তুমি বড় হয়েছেো, দ্যাখো, আমি হ্যাভলক এলিস পড়েছি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে শুভ, মানব জীবনের জটিল যৌন মনস্তত্ত্ব বিষয়ক বই এখন বাবার সঙ্গী। সে শুনেছে তার জন্মের সময় তার মায়ের মৃত্যু, বাবা আর বিয়ে করেন নি। দিনের পর দিন বাবাকে সে দেখে এসেছে, কিন্তু মনে পড়েনা, বাবার কোন বিকৃত রুচির পরিচয় সে কোনদিন পেয়েছে কিনা। কী কঠিন বর্ম দিয়ে বাবা নিজেকে আগলে রেখেছেন, যে বর্মের উপাদান তার জানা নেই। এই মুহূর্তে তার মনে হয়, বাবা হয় একটা ফেরেশতা, কিংবা একটা পশু।

হঠাৎ তার চিন্তাধারা ছিন্ন হয়ে চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল মূর্তি ভেসে ওঠে। ইউসুফ সাহেব খাটের নিচে থেকে আগাগোড়া কাগজে মোড়ানো একটা ছবি বের করে আনেন।

তুমি তোমার মাকে দ্যাখো নি, এই দ্যাখো, তোমার মা।

ছবিটার কোন পরিবর্তন হয় নি, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে মানুষ-প্রশাগ যে ছবিটি তিনি এনলার্জ করে যক্ষের ধনের মতো সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেইটি ছেলের সামনে মেলে ধরে বললেন,

দ্যাখ, তুই রাগ করেছিস বলে তোর মা মিটমিট করে হাসছে।

শুভ অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে।

আমাকে এতোদিন দ্যাখাওনি কেন?

তোর মায়ের ইমেজে আমি তোর পর হয়ে যাবো, এই ভয়ে।

স্বার্থপর তুমি।

অনেকক্ষণ পর ইউসুফ সাহেব মনে করতে পারেন, শুভ তাকে স্বার্থপর ছাড়া আর কিছু বলে নি। তার ভীষণ হাসি পায়।

ছেলের বিয়ের আগে ইউসুফ সাহেব দোতলা করলেন মাত্র একটা ঘর বানিয়ে। নিজের মনেই যুক্তি তৈরি করলেন—আমার নিঃসঙ্গ জীবনে এই একটি ঘরই তো যথেষ্ট। চারদিকে জানালা রাখলেন, যাতে পৃথিবীর আলো বাতাসের কোন অভাব না হয়। ‘হ্যাঁ, একটি ঘরই যথেষ্ট।’ কথাটা আপন মনে পুনরাবৃত্তি করতেই তার টলস্টয়ের ‘একটা মানুষের কতটা জমির প্রয়োজন’ গল্পটা মনে পড়ে। বুড়ো একটা ক্লাস গল্প লিখেছে বটে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রযোজ্য এত বড় একটা সত্যি অথচ সাধারণ কথা নতুন করে জানিয়ে দিয়ে বুড়ো যেন প্রত্যেককে আরেকটি জগতে নিয়ে যায়। মনে পড়ে তার বাবার কথা। জীবনে অসংখ্য জমিজমা করেছিলেন, অথচ ঐতো সাড়ে তিন হাত জায়গা। আর রানি? অনেকদিন বলেছে,

তুমি একটু জমিও কিনলে না।

টাকা কোথায়?

ধার দেনা করেই না হয় কেনো। টাকায় জমির দাম দিন দিন যা বাড়ছে, আর কিছুদিন পর হাতই দেয়া যাবেনা।

আমি ইউরোপ-আমেরিকার সিস্টেমে ছাদ কিনবো।

রানি বুঝতে পারে ইউসুফের রসিকতা এটা। অভিমান করে, অনুযোগ করে, কিন্তু দুজনের একজনও উপায় না দেখে চুপ করে থাকে। রানির আর বাড়ি তৈরির জন্যে নতুন জায়গার দরকার কি। ও-ও তো সাড়ে তিন হাত জায়গার একটা বাড়ি পেয়েছে। তার ধর্মকর্মে মন নেই, তথাপি সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশে একটি মন্তব্য করে,

মূর্খ।

শুভকে ডেকে নিয়ে তিনি প্রায় একই কথা বলেন,

আমার জন্যে এই ঘরটিই যথেষ্ট। এতো বড় না হলেও চলতো, কিন্তু এইসব বইপত্র নিয়েই হয়েছে আমার যতো জ্বালা।

বাবা, মনে হয়, তুমি আমার থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

তোমার ভুল হলো। বলো যে আরো উপরে উঠে যাচ্ছি। তোমার চেয়ে আমি বড়, তোমার আগে আমার মৃত্যু হওয়াই স্বাভাবিক। আর জানানো, মানুষ মরলে তার আত্মা উপরে উঠে যায়?

শুভ বুঝতে পারে, তার বাবা তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। অনেক দিন ইচ্ছে করেছে, এই অতি আপন অথচ অপরিচিত-পিতার স্নেহ থেকে মুক্ত হয়ে সে চলে যাক কোথাও, কিন্তু যাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি যে লোকটা পাগল না ভালো মানুষ, তাকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে!

ইউসুফ সাহেব নিজেই ব্যাখ্যা দ্যান,

বর্তমান ইনডিভিডুয়ালিস্টিক সোসাইটিতে একা থাকাই ভালো।

তাহলে তোমার সংসারে আমার থাকা উচিত নয়। শুভ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দায়।

কথাটা আর দুদিন পর আগো সত্য বলে প্রমাণিত হবে। যেহেতু বর্তমানে আমার আর কেউ নেই, সেজন্যে তুই চলে গেলে আমি ঠিক মুখ খুবড়ে পড়ে মরে যাবো।

তার বাবা তার উপর এতটা নির্ভর করে? অথচ সে কথা তো কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি, যেমন আজ প্রকাশ করলো! বাবার উপর ভীষণ করুণা হয় তার, তাঁর চোখের দিকে তাকাতে পারেনা শুভ।

এরপর থেকে শুভ পারতপক্ষে বাবার সঙ্গে এড়াতে চাইতেনা। সময়ে অসময়ে খোজ খবর নেয়, তত্ত্বাবধান করে, বাবার দোতলায় উঠে যাবার আগে যতটা পর তিনি ছিলেন, এখন যেন আর তা নেই, ঠিক এই সময়ই ইউসুফ সাহেব ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। মাতৃহীন একমাত্র ছেলের বিয়েতে ইউসুফ সাহেব খরচের ক্রটি করেন নি, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এককালে যে ব্যবহার করেছিলেন তা বিস্মৃত হয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন সবাইকে, হয়েছে ধুমধাম, মহোৎসব। আর শুভ যখন নিয়ে করতে যাবে ও বিয়ে করে এলো, তখন রানির ছবির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বললেন,

মনে মনে স্বরণ করো। তাকিয়ে দ্যাখো রানি তোমাদের দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসছে। ও নিশ্চয়ই খুব মজা পাচ্ছে। ও যে শান্তি দিয়েছে!

যেন একটা উচ্চমার্গীয় রসিকতা করেছেন, এই ভেবে ইউসুফ সাহেব হা হা করে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় খেয়াল করেন, ঘরের সবাই চুপ, অনেকের চোখই অশ্রুসিক্ত, আর শুভ'র চোখ দিয়ে দ্রুত পানি গড়িয়ে পড়ছে। অপ্রস্তুত হয়ে তিনি কোন কথা বলেন নি, ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আর সমস্ত আত্মীয় স্বজন চলে যাবার পর ইউসুফ সাহেব একদিন শুভকে ডেকে নিয়ে বললেন,

আমি এবার পূর্ণ ছুটি নিতে চাই তোমার কাছ থেকে।

বাবা, তুমি তো উপরেই উঠে আছো।

হ্যাঁ, তা আছি, তবে একেবারে ছুটি দিতে পারোনা?

আর্তনাদ করে ওঠে শুভ,

তুমি কি আমাকে আর সহ্য করতে পারছোনা বাবা?

না, তা নয়। এটা তোমার জীবনের এমন একটা মুহূর্ত, যখন এনজয় করবে, হস্ত হয়ে যাবে। তাই আমি বলছি, আমি উপরে থাকলেও তোমার সঙ্গে আমার বড় একটা দেখাশোনা নাও হতে পারে। আমি আরো আত্মস্থ হয়ে যেতে চাই। যদিও আমি ইনডিভিডুয়ালিস্টিক সোসাইটিতে বিশ্বাস করি, তবুও তুমি যদি নেহাতই আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও, রাখতে পারো, তবে সেটা প্রত্যক্ষভাবে নয়।

সেটা কেমন?

আজ একটা অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, ডিষ্টোফোনে কথা বলছে। আগেও অবশ্য দেখেছি, কিন্তু আজ দেখে আমার মনে হলো, জিনিসটা তোমার ও আমার ঘরে বসিয়ে নেয়া যায়। দেখা অবশ্য হবে না, কিন্তু কথা-টথা হতে পারে।

শুভ'র মুখ দিয়ে কোন প্রকার অব্যয় ধ্বনি পর্যন্ত বেরোয় না। তার বুদ্ধির পর থেকে দেখে আসছে, তার বাবা নামক আশ্চর্য জীবটি কেমন যান্ত্রিক জীবনযাপন করে আসছে, আর এখন আসল যন্ত্রটিকেই সম্পর্কের মাধ্যমে হিসেবে স্থাপন করতে চাইছে। কী জবাব দেবে শুভ!

যেহেতু বাবার চরিত্র সম্পর্কে শুভ খুব ভালো অবহিত সে জন্যে সে কোন প্রতিবাদ করেনা ডিষ্টোফোন বসাতে। প্রথম প্রথম ইউসুফ সাহেবই উৎসাহভরে কথা বলতেন, কিন্তু বহু ব্যবহৃত পরিধেয় বস্ত্রের মতোই সেটা এখন তাঁর কাছে আকর্ষণহীন।

কিন্তু আজ শুভ'র কাছেই ফোনের আকর্ষণটা বেড়ে গেল। কারণ, বিকেলে বাসা থেকে বাইরে বেরুতেই দ্যাখে, ইউসুফ সাহেব ঢুকছেন, অত্যন্ত ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও রোগাক্রান্ত চেহারায়ে মনে হচ্ছে যেন সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তার বয়স যুগ যুগ পেরিয়ে গেছে। চমকে ওঠে শুভ। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে,

বাবা তোমার অসুখ?

হ্যাঁ, জ্বর তিনদিন থেকে।

আমাকে বলো নি তো?

আমার অসুস্থতার জন্যে তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হোক, আমি চাইনে।

তবে কি খোঁজ-খবরও নেওয়া যাবে না?

তুমি যদি মনে করো, নিতে পারো। বাট, হ্যাভ এ গুড টাইম। হাত নেড়ে ছেলে ও বৌকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইউসুফ সাহেব নিজের ঘরে চলে এলেন।

শুভ ভেবেছিলো, তার বাবার খোঁজ সে নেবে না। কিন্তু মতিচ্ছন্ন মানুষটার জন্যে তার হঠাৎ এতো মমতা হয়, ইচ্ছে করে, ছুটে যায় তার ঘরে। কিন্তু সে মতিচ্ছন্ন মানুষটি যদি তার আকুতি অনুভব করতে না পারে! ডিষ্টোফোনটি অন করে শুভ,

বাবা ঘুমিয়েছো?

না।

রাত সাড়ে দশটা বাজে, তুমি অসুস্থ।

একটু পরেই ঘুমবো।

আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি শুভ। কিন্তু শেষ রাতের দিকে শুভ ও তার স্ত্রীর আদিম ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে খেয়াল হয়, দোতলার জানালা দিয়ে আলো লনের ওপর প্রশস্ত হয়ে শুয়ে আছে; সে বুঝতে পারে, তার বাবা তখনো জেগে। অন করে ডিষ্টোফোন,

বাবা তুমি এখনও ঘুমোও নি?

না।

রাত প্রায় চারটে বাজে।

আমার সামনে ঘড়ি আছে।

বাবা, তুমি তো অসুস্থ। প্রিজ, ঘুমোও তুমি।

আম্মা।

আর কোন কথা শোনা যায় না। বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ তিনটি লাইন পড়ে যখন উঠতে যাবেন, হঠাৎ শোনেন, ডিষ্টোফোনে পুত্র ও পুত্রবধূর কথা শোনা যাচ্ছে।

শুভ তাহলে কোন অক্ষ করেনি? ভুলে গেছে? আপন মনে বলে ইউসুফ সাহেব যখন সেটি অক্ষ করতে যাবেন, তখন স্পষ্ট অনুভব করেন, রানি তার হাতটা সরিয়ে নিলো, গভীর রাতে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে যেমন করে কথা বলে স্বামী-স্ত্রী, তেমনি যেন কোনোর ভেতর দিয়ে ভেসে আসতে লাগলো তাদেরই কথা, তাদেরই পরিচিত ধ্বনি, শব্দ, অক্ষুট কথা, চাপা উল্লাসের গোঙানী। কানটা তিনি নিয়ে যান কোনোর গায়ে, আরো জোরে চেপে ধরেন কর্ণকুহরে। শুভ আর ইউসুফ, শরৎক্য কোথায়? তার শরীর থেকে যার জন্ম, কে সে? ঘরের আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ইউসুফ সাহেবের অন্তরাখ্যা পর্যন্ত যেন নগ্ন করে ফেললো; তিনি বুঝতেও পারলেন না, কখন যে নিচে নেমে এসে দরোজার ফাঁক বা জানালা দিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূর সে মহৎ দৃশ্য দেখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

কে, কে জানালার ওখানে? চোর।

লাফ দিয়ে উঠে যায় শুভ জানালার কাছে। চোর পালায় না। জানালার পাল্লা দুটো সম্পূর্ণ ঝুলে দিয়ে সবিস্ময়ে শুভ দ্যাখে, বাবা দাঁড়িয়ে।

পরবর্তী সকাল থেকে ইউসুফ সাহেবকে আর কোথাও দেখা যায় নি।

মাতা

তারেক প্রতিবারই বিজয়ীর মতো বেরিয়ে আসে। কোন কোন সময় কিছুটা গ্লানি বা ধিক্কার কুয়াশার চাদরের মতো তার মনটা আচ্ছন্ন করে ফেললেও, সে আবছা অন্ধকার বিজয়ের রৌদ্রালোকে দূর দূরান্তরে মিলিয়ে যায়। সে যে জয়লাভ করেছে; হাসিনার প্রবল বাধা বিপত্তি নিষেধ সত্ত্বেও নিজেকে যে বিজয় গৌরবে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেইটিই বড় হয়ে দেখা দেয়। তখন তার মনে পড়তে চায় না, হাসিনা কেমন বিষণ্ণভাবে খাটের ওপর বসে ছিল; স্মৃতিতে হাসিনার ক্লান্ত চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে সেই বিশেষ আনন্দপূর্ণ মুহূর্তকে বিষাদভারাক্রান্ত করার পক্ষপাতি সে আপাতত নয়। একটি ইংরেজি ছবির দৃশ্য তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। নায়ক একটি মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে, তার সঙ্গসুখ গভীরভাবে উপভোগ করে যখন সে ফিরছে; সে অনুভব করছে বারবার নিজের হাত নাকের কাছে নিয়ে; এই হাতে মেয়েটির স্পর্শ আছে। তারেক ঠিক তেমনটি না করে বাতাসে হাসিনার গায়ের গন্ধ পেতে চায়। একবার সে বলেছিল,

মেয়েদের গায়ের গন্ধ মহুয়া ফুলের মতো।

তাই নাকি! তুমি জানলে কি করে?

কলেজের গেটের সামনে মহুয়া ফুলের গাছে গন্ধ পাও নি?

না বাবা, আমারতো সাহিত্যিকের নাক নয় যে কার গন্ধ কার মতো খুঁজতে যাবো।

তারেক ও হাসিনা দুজনেই হেসেছিল প্রচুর। হাসিনা এই হাসিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেনি; যা দেখে তারেক শুধু বিস্মিতই হয় নি, পুলকিতও হয়েছে।

তাই মনে হয়, হাসিনার বিষণ্ণভাবে বসে থাকা একটা ভান মাত্র। নইলে পরে যখন সে আবার হাসিনার বাসায় যায়, মনেই হবে না গত একটি রাতে তারেক কী অমার্জনীয় অমানুষী শুরু করেছিল; মনে হচ্ছিল ঝড়ের দৈত্য রাজা সমস্ত শক্তি বুঝি বা এই অবিবাহিত তরুণ যুবকটিকে বর স্বরূপ দান করেছেন। মুহূর্তে চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। হিতাহিত বলে অভিধানে যে একটি শব্দ আছে, সেটা হাসিনা হয়তো ভোলেনা, কিন্তু তারেক ভুলে যায়। সেই মুহূর্তে সে যদি তাকে আয়নায় প্রতিফলিত দেখতে পেতো, তাহলে হয়ত নিজেকেই চিনতে পারতেনা। সে অনুমান করে তার

চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে; সারা মুখ গিরগিটির গায়ের মতো রক্তিম। সে অনুভব করে, কপালের রং স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, ফুলে মাটি খাওয়া কেঁচোর মতো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লম্বমান এবং সমস্ত শরীরে একটা হিমবাহ দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। হাসিনা এক সময় ক্লাস্ত হয়ে, খাটের উপরে লুটিয়ে পড়ে যখন কল্পনভাবে তারেকের কাছে রেহাই প্রার্থনা করে, তখন তারেকও আসলে ক্লাস্ত। সে ক্লিম মেরে বসে থাকে, সিগারেট টানে এবং একসময় বিজয়গৌরবে তীব্র আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে হাসিনাদের বাসা থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপরে সে খোঁজে আত্মসমর্থন। ওদের বিয়ে হয় নি, অথচ মেলামেশা হচ্ছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সামাজিক ও ধর্মীয় স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই স্বামীস্ত্রী। যেহেতু তারেকের সঙ্গে হাসিনার বিয়ে ষোলআনা নিশ্চিত, সে জন্যে তারেকের হাসিনাদের বাড়িতে সময়-অসময় অবাধ যাতায়াত এবং বিরতিহীন গল্পগুজব। অতএব স্বামীস্ত্রী সুলভ আচার আচরণ করতে দোষ নেই। কিন্তু বিয়ের পরে অবশিষ্ট থাকবে কি? সে নিজেই আবিষ্কার করেছে; বিয়ে-পরবর্তী জীবন সকলেরই জানা, সেটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায়না। তিনবার কদুল করলেই পারম্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে কেউ কোন মতামত পোষণ করবে না। অথচ এখন একটি আলাদা আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে, ভয়, শিহরণ এবং রীতিমতো এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ আছে। হাসিনার বাড়িসুদ্ধ লোকের চোখে ধূলো দিয়ে এই যুবকটি রাজকন্যে উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেল, এটা কি কম গৌরবের কথা? সে আরো গভীরভাবে ভাবতে থাকে, আগামীতে হাসিনার সঙ্গে কিভাবে আচরণ করবে।

এবারে মাত্রাটা সত্যিই বেশি হয়ে গিয়েছিল। না, যৌনাচার নয়; তার প্রাথমিক উত্তেজনাপূর্ণ প্রত্নতি। ঠিক সেই মুহূর্তেই, শ্রিংয়ের পুতুলের মতো লাফ দিয়ে উঠে, লাইট জ্বালিয়ে দিয়েই হাসিনা পিনের ন্যায় তীক্ষ্ণ চোখে তারেককে খুঁচিয়ে যেন অস্থির করে তুলল। কেমন যেন ভয় করতে লাগল। তার মনে হতে থাকে, হাসিনা বুঝি বিলম্ব না করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে খামছে সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। সে লক্ষ করল, হাসিনার দুই হাতের নখ যথেষ্ট বড়। অনেকদিন বলেছে,

তুমি নখ কাটোনা কেন?

আমার ইচ্ছা।

আমার নখগুলো মানুষদের দেখতে ইচ্ছে করে না।

কাটি না কেন, জানো?

কেন?

তোমাকে খামচানোর জন্যে।

হাসিনার সেই রসিকতা এখন কি সত্যি সত্যি কার্যে রূপান্তরিত হবে? তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তারেকের আছে। কিন্তু যে বীভৎস পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তাকে প্রতিরোধ করবে কে? তার মনে হয় সে কোন এক অপরিচিতার সামনে বসে, বিচারের

রায়ের অপেক্ষা করছে। বিচারক বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। সামনে উপবিষ্ট থেকেও এক অনিশ্চয় ফলাফলের নিয়ন্তা হয়ে তিনি যেন ক্রমশ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন। মনে হয়, হাসিনা হঠাৎ এক সময় চোঁট খুলে যে আদেশ প্রদান করবে, সেটিই তার জীবনের শেষ প্রাপ্য। সে ক্রমশ রহস্যের গভীরে নিমজ্জিত হতে থাকে।

জঘন্য!

তারেক চকিতে মুখ তুলে হাসিনার পাথরে খোদাই করা মুখ দেখতে পায়। মনে করতে পারেনা, দীর্ঘ দুই বছরের আলাপ-পরিচয়ে এই কঠিন মুখ সে দেখেছে কিনা। তার মুখ দিয়ে কোন জবাব বেরোয় না, গুহার মুখে একটা বিশাল প্রস্তরখণ্ড পড়ে সমস্ত মুখটাই যেন আটকে রেখেছে।

আমি জানতাম না, তুমি এই ধরনের।

তারেক যেন চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করে ধরণটা জানতে চায়।

ছি ছি ছি, তুমি এত ইতর?

আর আর কি বলবে হাসিনা? একটা পুরুষ মানুষকে পর্যুদস্ত করার জন্যে ঐ জঘন্য ও ইতর শব্দ দুইটি যে যথেষ্ট, সেইটি, এই মুহূর্তে অনুভব করে তারেকের মনে হতে লাগল, পৃথিবীর সমস্ত ধিকার-ধ্বনি দূর প্রান্ত থেকে বৃষ্টির শব্দের মতো শব্দ করতে করতে ধেয়ে আসছে। তার চোখের সামনে তীব্র ইলেকট্রিকের আলো, যেন তীব্রতর আগুনের আকার ধারণ করে তাকে গ্রাস করতে চাইছে; মাথার ওপরকার দ্রুততমগতিসম্পন্ন ফ্যান প্রকৃতপক্ষে তারই মাথার অংশবিশেষ। সে কান দুটো চেপে ধরে মাথা নুইয়ে বসে থাকে।

রহস্যময় জগত থেকে হাসিনার কণ্ঠ ভেসে আসে।

তারেক!

তারেক কোন জবাব না দিয়ে আগের মতোই বসে থাকে।

তারেক!

এবারে সে মুখ তুলে ডাকায়।

তুমি আমাদের বাসায় আসো কেন? তুমি জানো; তোমার আসাটা কেউ বড় একটা পছন্দ করে না?

না, জানিনা।

জানোনা, জেনে রাখো। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এই জন্যে কেউ কিছু না বললেও তুমি যে আচরণ করছ, কেউ দেখে ফেললে তুমি কি ভেবেছ সেটা সহজভাবে নেবে?

না।

তাহলে? মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এটা যেন খেয়াল থাকে।

আমার ভুল হয়েছে।

ভুল হবে কেন? আর কিছু ভুল হয় না, এটা ভুল হয় কেন?

আমি দুঃখিত ।

আমিও দুঃখিত হবো, ভবিষ্যতে যদি এই ভুল আবারও হয় । এখন যাও ।

একজন পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা নীচু করে তারেক হাসিনাদের বাড়ি থেকে বেগিয়ে এলো ।

তখন বেশ রাত । সাড়ে নয়টা দশটা হবে হয়তো । তখনো রাস্তায় লোক চলাচল করছে; রিকশা, বেবিট্যাক্সি, মোটরের আনাগোনা নাগরিক জীবনকে ব্যস্তসমস্ত করে রেখেছে; আশপাশের দোকান ও রাস্তার আলোয় রাতের পরিবেশ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার । কিন্তু তারেকের মনে হতে লাগল, সমস্ত পরিবেশটাই যেন অপরিচিত এবং পেছনে হাসিনাদের দোতারা বাসাটা একটা রহস্যময় দূর্গের মতো দণ্ডায়মান । যেন সে ঐ বাসার প্রবেশাধিকার হারিয়ে চিরকালের জন্যে লোম ওঠা কুকুরের মতো রাস্তায় নেমে এসেছে । তার মনে পড়ছে সে যখন সিড়ি দিয়ে নিচে নামছিল, তখন যেন অনন্তকাল ধরেই অন্ধকার জগতে এক পা এক পা করে পা ফেলছে । এই মুহূর্তে যে সিড়ি থেকে সে পা নামালো, তার শক্তি নেই পাটা আবার পরিত্যক্ত ধাপে তুলে রাখে । বুঝি জীবনটাই এরকম । শুধু ফেলে আসা, কেবল ছেড়ে যাওয়া । হাসিনার সঙ্গে পরিচয়ের পর কতদিন সে যে এই বাসায় এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই । কিন্তু কোনদিন তো এ রকম মনে হয়নি । হাসিনার সঙ্গে অনেকদিনের অসঙ্গত আচরণে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু এমনভাবে রিত্ত, নিঃস্ব মনে হয় নি । রাস্তায় অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তারেক । একসময় একটা সিগারেট ধরালো । বিবাদ লাগলো সেটা । তার পায়ের কাছে বৃষ্টির পানি জমে আছে । সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল সে । হ্যাৎ করে একটা শব্দ হলো । তারেক নিজেরই অজান্তে চমকে উঠল একটু ।

সত্যিই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে তারেক । বহির্বিশ্বের কেউ তা বুঝতে পারল না ঠিক, কিন্তু হাসিনার সামনে তার আগের বিজয়ীতাবের যথার্থ মূল্য কোথায় । কিন্তু সে তো পারতো নিজের পৌকষকে সেই সময় প্রমাণ করে আসতে । কোন মরণোন্মুখ জানোয়ার উপায়ান্তর না দেখে মরণ-কামড় দেওয়াটাই যখন সে শ্রেয় মনে করে, তখন তারেকও যদি চরমতম প্রতিশোধটি নিতো, তাহলে এই আত্মধিকারে প্রবহমান নাগরিক জীবন স্রোতে বহু পচা ডোবার মতো পরিত্যক্ত হয়ে থাকতো না । অথচ আজ সে ভেবেছিল হাসিনার সঙ্গে যে আচরণ করবে, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হবে বৈকি, কিন্তু দুজনের সম্মতিতেই সেটা ঘটবে বলে সমাপ্তি হবে মধুর ।

আজ ওদের ছবি দেখার কথা ছিল । দুজনে অনেকদিন ছবি দেখে নি । ভালো ছবি আসেনি বলেই দেখার ইচ্ছে হয় নি । সেই রকম একটি ছবি আসবে, যা দেখে উভয়েই আনন্দ পাবে প্রচুর । আকাঙ্ক্ষিত একটি ছবি এসেছে বলাকায় । ছবিটি তিনটি অঙ্কার পুরস্কার প্রাপ্ত । বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনীত ছবিটির জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল ওরা । কথা ছিল, আজ ছবি দেখে বাইরে থাকবে এবং কিছুটা ঘুরবে ।

আরো কথা ছিল ছবিটা দেখাবে হাসিনা, খাওয়ানোর খরচা তারেকের। হাসিনা টাকাও দিয়ে দিয়েছিল অগ্রিম টিকেট করে রাখতে। এবং বলেছিল, টিকেট করে টেলিফোনে যেন জানিয়ে দেয়। কিন্তু বেলা দেড়টার মধ্যে তারেক একবারও ফোন করে নি।

ফোন হাসিনাই করল।

তারেক সাহেব আছেন?

কথা বলছি।

এতক্ষণ ফোন করো নি কেন?

এত ব্যস্ত ছিলাম যে ফোন করার সময়ই পাই নি।

খুব এ্যাটেনটিভ অফিসার হয়ে গেছ দেখছি। সে থাকগে, টিকিট করো নি?

ওহ্ হো! একদম ভুলে গেছি।

ভুলে গেছ?

বিশ্বাস করো, আমার একবারও মনে হয় নি যে টিকেট কাটতে হবে।

কেন কাটো নি আমি তাই জানতে চাই।

বলছি তো ভুলে গেছি।

মুহূর্তে হাসিনার কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়ে যায়। ফোনের ভেতরেই তারেক অনুমান করে, হাসিনার গলার রং ফুলে উঠেছে রাগে, রোষে। যদি সে সামনে থাকতো, সে নিশ্চয়ই উপভোগ করতো এমন মজার দৃশ্যটি। মাঝে মাঝে সে অকারণে হাসিনাকে রাগিয়ে দিয়েছে, এবং নিজে আদৌ না রাগার জন্যে হাসিনা আরো বেশি করে রেগেছে দেখে কৌতুক অনুভব করেছে। এই মুহূর্তে সেই রকম একটি পরিস্থিতি অনুমান করে তারেক রসিকতা করার চেষ্টা করে,

আচ্ছা, ছবিটা আজ যে রকম দেখাবে, কাল কি অন্য রকম দেখাবে?

জানি না।

তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

অত ফাজলামো শোনার সময় আমার নেই। আমি কেবল জানতে চাই, তুমি টিকিট করো নি কেন?

বললাম তো মনে ছিল না।

এতকথা মনে থাকে, আর এটা থাকে না?

তারেক এবারে শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়,

বেশতো, কাল দেখবো।

না, আমি দেখবো না।

প্লিজ রাগ করো না!

বলছি আমি দেখবো না। আমাকে চেন না তুমি।

খুব ভালো চিনি। দু বছর ধরে চিনছি, চেনা আরো বাকি আছে?

কিছুই চেনো নি তুমি। আমি আর কথা বাড়াতে চাইনে। তুমি যদি টিকেট করো, তাহলে আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো। দেখে নিও।

তাই নাকি? ওড।

হাসিনা আর কথার জবাব দেয় নি। খট করে ফোন রেখে দিয়েছিল।

তারেক বুঝতে পারে, হাসিনা যতটা রাগ করেছে তার চেয়ে বেশি করেছে অভিমান। আজকে ছবি দেখার যে মানসিক প্রস্তুতি সে নিয়েছিল, সেটি এমনভাবে ভেঙে যাওয়ায় তার পক্ষে স্ক্রু হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু তারেকের পক্ষে আজ টিকেট করা সত্যি সম্ভব ছিল না। সত্যি যদি মনে না থাকতো, তাহলে অপরাধটা সে মাথায় তুলে নিতো। অভাববোধ কি মানুষকে মিথ্যেবাদী করে? মানুষের সুন্দর প্রবৃত্তিগুলি নষ্ট করে দিতে সাহায্য করে? হয়ত করে বলেই তারেক কিছুতেই অকপটে স্বীকার করতে পারল না, হাসিনার টাকা দশটা দিয়ে সে আজ রেশন তুলেছে। সকালেই রেশন না তুললে দুপুরে ভাত জুটবে না। সেক্ষেত্রে ছবি দেখাটাই গৌণ—কথাটা চিন্তা করে তারেক আগেই ভেবে রেখেছিল, অভিনয় করে সে একটা চরম মিথ্যা কথা বলবে। হাসিনা রাগ করবে জেনেও সে সত্যি কথা বলতে পারে নি। একটা বিপরীতমুখী স্রোতের ধাক্কায় তার জিভ যেন বার বার আটকে যাচ্ছিলো।

কিন্তু তার খারাপ লাগে না। লাগে না বলেই সে নতুন একটি অভিনয়ের প্রস্তুতি নেয়। সে অনুমান করে, তার অভিনয়ে হাসিনা আরো বেশি রাগ করবে এবং সত্যি কথাটা যখন প্রকাশ পাবে তখন যে একটি মজার দৃশ্যের সৃষ্টি হবে হাতে সন্দেহ নেই। আচ্ছা হাসিনা কি ধরনের রাগ করবে? নিশ্চয়ই তার সঙ্গে বলতে চাইবেনা। হয়তো বলবে, কিন্তু এমন মাপা কথা যে মনে হবে সবেমাত্র কেউ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, কথার অভাবে কথা এগুতে পারছে না। এমন যদি না হয়, তাহলে সম্ভবত টিকেট ছিঁড়ে ফেলে দেবে, বলবে, দরকার নাই আমার ছবি দেখা। অথবা এসবও যদি না ঘটে তাহলে হাসিনা হয়ত দেখাই করতে চাইবে না। তৃতীয় সম্ভাব্য ঘটনাটি দমিয়ে দিল তারেককে। অসম্ভব কিছু নয়। যে আদরে সে লালিতা-পালিতা, তাতে এমনতরো ব্যবহার বিচিত্র কি। হাসিনা একটাবার বোঝার চেষ্টা করলো না, ভুল তো মানুষেরই হয়, সত্যিই যদি টিকেট করার কথা ভুলে গিয়ে থাকে। না, হাসিনা না বুঝে ভালোই করেছে। সে তো আসলে মিথ্যা কথা বলেছে। মিথ্যেবাদীর সবচেয়ে বড় শাস্তি, তাকে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আর সত্যিই যদি ভুল হতো এবং হাসিনা বুঝতে না চাইতো, তাহলে তারেকের স্ক্রু হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল।

নিজেকে ঝেড়ে তুলে একটি বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে সে। আজ হাসিনার সঙ্গে যে আচরণ করবে, সেটি এর আগে সে কোনদিন করে নি। মনে হলো, সেই মুহূর্তে তার চেহারা পাল্টে গেছে। একটি সিগারেট ধরালো তারেক।

যখন সে হাসিনাদের বাসায়, তখন রাত আটটা মতো। হাসিনা সে সময় নিজের পড়ার ঘরে, ওয়ে ওয়ে ‘অন্তরঙ্গ’ পড়ছিলো। ঘরে ঢুকেই, কোন প্রকার ভূমিকা না করে তারেক টিকেট এগিয়ে দিয়ে বলে,

এই যে টিকেট।

রেখে দাও।

কোথায়?

যেখানে খুশি।

তোমার ব্যাগে রেখে দিলাম।

হাসিনা জবাব দেয়না। কিন্তু উঠে বসে। বসে হাত বাড়িয়ে টিকেটে ছবির সময় লক্ষ করে। হঠাৎ প্রশ্ন করে,

একটা টিকিট কেন?

আমি দেখবো না।

অবিশ্বাস্য চোখে হাসিনা তারেকের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন জীবনের সরল গতি পথে একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারেনা। তারেক মনোযোগ সহকারে হাসিনাকে লক্ষ করতে থাকে।

তুমি আসলেই একটা ছোটলোক।

বিশ্বাস করো, আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছেনা।

কি হয়েছে?

কেন যেন অসুস্থবোধ করছি। আগামীকাল একটু বিশ্রাম নিতে চাই।

কাল ছবি দেখে পরশুদিন বিশ্রাম নেওয়া যেত না?

তা যেত। বেশ তো তুমি একাই দেখে এসো। ভালো ছবি, পরে নিশ্চয়ই আসবে। তখন না হয় দুজন দেখবো।

চিৎকার করে ওঠে হাসিনা। তারেক লক্ষ করে, হাসিনার চোখের ওপরে শিশির বিন্দুর মতো পানি টলটল করছে। সে হাতের টিকেটটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফ্যানের বাতাসের তীব্রতায়, টিকেটটি শুকনো পাতার মতো উড়তে উড়তে খাটের কোণায় গিয়ে পড়ে যায়। পরিস্থিতির উপলব্ধি গুরুত্ব করে তারেক পকেটে হাত দিয়ে, নিজের টিকেট বের করে বলল,

ওহ্, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। মনের যে কি হয়েছে, টিকেট কেটেও ভুলে গেছি।— বলে হা হা করে হাসে। এ ধরনের একটা চরম রসিকতায় অন্যপক্ষের কোন সাড়া না পেয়ে ধমকে তারেক হাসিনার মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করে, হাসিনা বেলুনের মতো ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে; যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে।

হাসিনা ফাটলো ঠিকই, কিন্তু বিস্ফোরণ নেই। চট করে খাট থেকে নেমে তারেকের চুলতালো এলোমেলো করে দিয়ে,, পিঠের ওপর একটা কিল মেরে বলল,

আমাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলে কেন?

আপনি কষ্ট পেয়েছেন নাকি? আমি তাতো বুঝি নি। এরকম এক আধটু কষ্ট পাওয়া ভালো।

হাসিনা ও তারেক দু'জনেই হাসতে থাকে। হঠাৎ এক সময় হাসিনা বলে,

সত্যি করে বলো তো, আজ টিকেট কাটোনি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারেনা তারেক। তার মনে থাকা সত্ত্বেও সে টিকেট করতে পারে নি, সেই অপরাধবোধটা মুহূর্তে তাকে পছন্দ করে ফেলল। সে কি সত্যি কথা বলবে? না, এই পরিস্থিতিতে, অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখিয়ে বলবে, সে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। তারেক বিবস্তিত হয়ে ডুবুরির মতো উত্তর খুঁজতে থাকে।

বললে না?

তোমার টাকা দিয়ে রেশন ভুলতে দিয়েছি সকালে।

বিকালে টাকা পেলে কোথায়?

নিউমার্কেটের বিকালের ব্যাঙ্ক থেকে ভুলে নিয়ে এলাম।

সত্যি কথাটা দুপুরে বললে কি হতো?

সব কথা কি বলা যায় হাসিনা? তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, অনেক কথা অতি বড় শ্রিয়জনকেও বলা যায় না। বললে হয়ত দোষ নেই, কিন্তু এমন একটা সঙ্কোচ এসে বাধা দেয় যে মানুষ নিজের স্বাভাবিকত্ব পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস করো, আমি টেলিকোনে যখন বার বার বলছি যে টিকেট করতে ভুলে গেছি, আমার বারবারই মনে হচ্ছিল, তোমার কাছে সত্যি কথা বলতে দোষ কোথায়, কিন্তু আমি পারি নি।

হাসিনা কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে বসে সে নখ দিয়ে মেঝেতে কি সব অদৃশ্য হিজিবিজি নকশা আঁকতে থাকে। এক সময় মুখ তুলে হেসে বলে,

কাল কিন্তু খাওয়াতে হবে।

রাজি, তবে এক শর্তে।

কী?

একটা প্রশ্ন দিতে হবে।

আসোই তো ওই জন্যে। বদমাইশ কোথাকার।

এ্যাও লেট মি ফ্রন্ড।

তারেকই, হাসিনার বাধা সত্ত্বেও লাইট নিভিয়ে দেয়। এবং এবারে মাত্রাটা সত্যিই বেশি হয়ে গিয়েছিল।

অভাব-অপরাধ-মিথ্যা, এরা কি সহোদর ভাই? পাড়ার কিনা গ্রামের অথবা অন্য লোকের সঙ্গে মারামারি লাগলে বেমন সবতাই দল বেঁধে বেরিয়ে আসে, তেমনি মানুষ অজাবে পড়লে অপরাধ ও মিথ্যা কি বোপ দেয়? তারেক প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। সত্যিই যদি সকালে পকেটে টাকা থাকতো, তাহলে আজ রাতে হাসিনাদের বাসায় তাকে আসতে হতো না। ছবি দেখে, বাইরে খেয়ে, কিছুটা ঘোরাফেরার দু জনেই ক্লান্ত থাকতো, এতটা বাড়াবাড়ি হতে পারতো না। কিন্তু এখন কি করা যাবে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি পথ সে চলে এসেছে। দূর থেকে লক্ষ করল, ট্রাফিক সিগনাল লাইটপোস্টের লাল আলোটা দব্দবে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ হল তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করলো,

তখনো তাকিয়ে। ওটা কি খারাপ? না তারেকের দিকে ইচ্ছে করে অমন করে রয়েছে? তার মনে হলো, যারা পরাজিত, তাদের দিকে সবাই অমন করেই তাকায়।

তারেক বাসায় ফিরে আসে।

সে সিদ্ধান্ত নেয়, আগামীকাল সে ছবি দেখবে না। কাল অফিসে গিয়ে পিওন পাঠিয়ে টিকেটটি বিক্রি করে দেওয়াবে। সত্যিই যদি হাসিনা তাকে গভীরভাবে ভালবাসে, তাহলে সে নিশ্চয়ই সিনেমা দেখার সময়, দেখার পরে খাওয়া ও বাইরে ঘোরার সময়টা বারবার নানাভাবে চিন্তা করে দেখছে। ছবি দেখতে গিয়ে সে দেখে, তারেক আসেনি। ভাববে, এক্ষুণি এসে ডবে। দুজনের কাছে দুটো টিকেট, অতএব বাইরে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। হাসিনা তার সিটে গিয়ে বসবে। বিক্রীত টিকেটের অধিকারী ভদ্রলোক আগে থেকেই অথবা হাসিনা যাওয়ার পর আসন নেবেন দেখে মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত কল্পনা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সমস্ত আনন্দ মৃত্যু-বিষাদে পরিণত হবে। চকিতে মনে হবে, তারেকের অসুখ করেনি তো? তারেকের দুর্ঘটনা হয় নি তো? যদি অসুখ হয়, তাহলে তারেক নিশ্চয়ই হাসিনাকে জানাতো। দুর্ঘটনা ঘটলেও কি সে জানতে পেত না? তার ছবি দেখার সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে।

সবচেয়ে ভালো হয়, তারেক ছবিও দেখবে না, টিকেটও বিক্রি করবে না। হোকনা সাড়ে তিনটি টাকা নষ্ট। এ রকম টাকা অনেকবার অনেকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। সে মনে করবে, টাকাটা পকেটমার নিয়ে গেছে। হাসিনার পাশের সিট খালি থাকবে। প্রতিটি মুহূর্তে আরেকের আগমন প্রত্যাশা করে শেষ পর্যন্ত উৎকর্ষা যখন চরমে পৌঁছুবে, তখন, তারেক ভাবে, হাসিনার আনন্দরাশি তাকে উলটে সুইয়ের মতো খোঁচাবে। কোথায় থাকবে তিনটি অস্কার পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত ছবির সার্বজনীন আবেদন, খ্যাতিনামা শিল্পীদের অসামান্য অভিনয়-পারদর্শিতার নিদর্শন। জীবনটা আর যাই হোক, চলচ্চিত্র নয়। যে ধরনের চলচ্চিত্র তাতে পর্দার সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক, অনেকগুণ বেশি। হাসিনার আনন্দ ওইভাবে নষ্ট করে দেওয়ার মধ্যেই তারেকের সমস্ত বিজয় নিহিত। সে একটা গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং রাতে তার খুব ভালো ঘুম হয়।

সকালে অনেক হাঙ্কা বোধ করে তারেক এবং বোঝে উদ্ভাপের পরিমাণ বেশ কমে এসেছে। সে নতুন করে ভাবতে বসে। সে হাসিনাকে না জানিয়ে ছবি যদি দেখতে না যায়, তাহলে ফলাফলটা যদি গুরুতর আকার ধারণ করে? সে নিজে যেমন হাসিনার আয়ত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছে, তেমনি হাসিনা হয়তো এমন প্রত্যাখ্যানই করবে, যা কোনদিন পূরণ হবে না। তারেক আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করে।

এবারে স্থির হয়, ছবি শুরু হওয়ার একটু আগে সে ঢুকবে। হাসিনা আগে থেকে এসে বসে থাকবে; তারেককে দেখতে পাবে না এবং নানা দৃষ্টিভঙ্গি করবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট শাস্তি হবে মনে করে তারেক আপাতত স্বস্তি পায়।

যখন সে সিনেমা হলে, তখন ঠিক সাড়ে তিনটে। তারেক গুনতে পায়, ছবি শুরু হওয়ার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল। সে গেটকিপারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে,

ছবি কি ইন্টারভেলের পরে শুরু হবে?

হ্যাঁ।

খুশি মনে বাইরে, সোফায় বসে তারেক একটি সিগারেট ধরায়। এক সময় উঠে পায়চারি করে এবং চোখে মুখে চরম উদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে যেন কারো জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। গেটকিপার লক্ষ্যই করেনা তাকে। তখনো দর্শক আসছে, গেটকিপার তাদের টিকেট সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত। সে ওনাতে পায়, একটা ইংরেজি গানের সঙ্গে বিজ্ঞাপনী ছবির প্রচার চলছে। তারেকের উদ্বেজনা হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। সে দ্রুত আরেক গেটকিপারকে গিয়ে জিগেস করে,

ছবি কি ইন্টারভেলের পরে শুরু হবে?

হ্যাঁ।

না, কোন সন্দেহ নেই। এবারে সে নিশ্চিত ভাবে বাইরে অপেক্ষা করতে পারে। ইন্টারভেল হয়ে গেল। তারেক আরেকটি সিগারেট ধরায়। পরিচিত দ'চারজনের সঙ্গে দেখা হয়। মৃদু হেসে কিংবা চোখ দিয়ে সে তাদের কুশল প্রশ্ন করে। হঠাৎ দেখে, সামনে হাসিনা। হাসিনা বেরিয়ে এসেছে। তারেককে দেখে সে আবার ভেতরে চলে যায়।

সিগারেটটা শেষ হয় না। তারেক ভেতরে গিয়ে বসলো।

তুমি কি অনেকক্ষণ এসেছ?

কি জবাব দেবে তারেক? মিথ্যা কথা বলায় তার জুড়ি নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কি বললে তারেক জিততে পারে, হাসিনার অপেক্ষা করার শাস্তিটা বজায় থাকে। সে নিরুত্তর রয়ে যায়।

বললে না, কখন এসেছ?

ইন্টারভেলও হল, আমিও এলাম।

ও।

সিনেমা হলের আবছা আলোয় তারেক দেখল, হাসিনা নির্বিকারভাবে পর্দায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। সে আশা করেছিল, হাসিনা বলবে, তোমার দেরি দেখে ভাবলাম তোমার কিছু হলো নাকি; তোমার অসুখ করেছে নাকি, কিংবা অনুচ্চ-কণ্ঠে অভিযোগ করবে, কেন আমায় একা বসিয়ে রাখলে এতক্ষণ? তারেক যাদুঘরের মূর্তির মতো প্রস্তরীভূত হয়ে যায়।

সিরিয়াস ছবি ছিল সেটা। অথচ তারেকের মনে হলো, ছবির দৃশ্যগুলো কেবল এলো আর গেলো।

আর যখন শেষ হলো, জাতীয় পতাকা দেখানো হচ্ছে, তখন প্রথমবারের মতো, হাসিনা বলল—

তুমি নিচে গিয়ে দাঁড়াও। আমি আসছি।

কেন?

কেউ যদি দেখে ফেলে?

মা সিরিয়াস ।

কী?

হাসিনার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তারেক দ্রুত বেরিয়ে এসে, নিচে অপেক্ষা করতে থাকে ।

হাসিনা যখন এলো, তখন তার চোখ মুখ অন্য রকম । মুখের দিকে তাকিয়ে তারেক তৃপ্তি অনুভব করে কিছুটা । যে বিজয় গৌরবে সমৃদ্ধ হয়ে হাসিনা এতক্ষণ ছবি দেখছিল, সেটি ধূলিসাৎ হয়ে গেল দেখে তারেকের হৃত বিজয় গৌরব যেন ফিরে আসে ।

মার কি হয়েছে?

মাকে অত্যন্ত খারাপ দেখে এসেছি ।

আগে বলনি কেন?

তোমার ছবি দেখার আনন্দ নষ্ট হবে ।

টেলিফোন কর নি কেন?

আমি অফিস থেকে ফিরে বাসায় গিয়ে দেখলাম ।

হাসিনা দ্বিতীয় চিন্তা না করে বলে,

আমি মাকে দেখতে যাবো ।

কি জবাব দেবে তারেক এবারে । মার শরীর অসুস্থ ঠিকই, কিন্তু যতটা সিরিয়াসলি তারেক বলেছে ততটা তো নয়! তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, মাকে বুঝি আর দেখতে পাওয়া যাবে না গিয়ে । তার মনে হয়, গোয়েন্দা অপরাধী ধরবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পাদন করে ফেলেছে । এবারে সে শেষ চেষ্টা করে দেখে বাঁচার । তাড়াতাড়ি বলে,

মার অবস্থা আমি রাত্রে ফোন করে জানাবো ।

না, আমি যাবো । ফুটার ডাক দাও ।

হাসিনাই এগিয়ে যায় । নিজেই ফুটার ডাক দেয় । বলে,

এসো ।

অপরাধী বধ্যভূমিতে চলল ।

আর কত মিথ্যা বলবে তারেক? হাসিনার যে বিজয় আনন্দ নষ্ট করে দেবার জন্যে এতক্ষণ সে, সম্ভবত, ছবির নায়কের চেয়েও ভালো অভিনয় করলো—তার কি পরিণতি হবে আর ভাগ্যেই বা জুটবে কি পুরস্কার ।

আচ্ছা, মা যদি না বাঁচে ।

তুমি এত অলঙ্ঘনে কথা ভাবো কেন? হাসিনা সান্ত্বনার সুরে ধমক দেয় ।

ভাবি কেন তাই ভেবে পাই না হাসি । মাকে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, আমার প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বুঝি শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণ ।

হাসিনা ভয়াবহভাবে তারেকের মুখের দিকে তাকায় । এবারে মনে হয়, সত্যিই সে ভয় পেয়েছে । তার চোখ মুখ দেখে বোঝা যায়, মৃত্যুচিন্তা তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন

করে ফেলছে। তারেক লক্ষ করে হাসিনার ভাবান্তর। সে একটি সিগারেট ধরিয়ে
ঠোট দুটো সক্র করে ধোঁয়া ছাড়ে।

তুমি যদি ছবি আরও হওয়ার আগে আসতে, তাহলে টিকিট বিক্রি করে দেওয়া
যেত।

ডাই ইচ্ছে ছিল।

অফিস থেকে ফিরে মার যখন খারাপ অবস্থা দেখলে, তখন কোন জায়গা থেকে
ফোন করা যেত না?

মনে ছিল না।

তারেক নির্বিকারভাবে জবাব দিয়ে যায়। সে অক্ষুটস্বরে মা, মাগো উচ্চারণ
করতে থাকে। এবারে নিশ্চয়ই, তারেকের সম্ভাব্য মাতৃহীনতায়, হাসিনা খুব মানসিক
কষ্ট পাচ্ছে।

মা উঠানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসিনা দ্রুতপায়ে এসে মাকে সামনে দেখেই বলে,
এখন কেমন আছেন?

মা চট করে জবাব দিতে পারেন না।

আপনার শরীর এখন কেমন?

বেশি ভালো না। রাতে জ্বর এসেছিল।

হাসিনা গায়ে হাত দেয়। তাপ অনুভব করে অনেকক্ষণ ধরে।

আপনি দাঁড়িয়ে কেন?

ততেই যাচ্ছি।

হাসিনা ধরে নিয়ে মাকে গুইয়ে দেয় বিছানায়।

মা ও হাসিনা অনেক গল্প করলো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। মা
নিজেই বলেন, তারেক, তুই হাসিনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আয়।

বাই।

মাকে সালাম করে হাসিনা বেরিয়ে আসে।

তারেকদের বাসা থেকে হাসিনাদের বাসা মাইল তিনেক দূর। ওরা দু'জন ফুটারে
পাশাপাশি বসে। এমনভাবে এর আগে বহুবার গিয়েছে। তারেক হাসিনার কাঁধের
ওপর দিয়ে হাত রেখেছে, ফুটারওয়ালা যাতে না গনতে পায় এমনভাবে বহু মিষ্টি
গল্পওজব করেছে। কিন্তু আজ, তারেক ভাবছিল, কমা চেয়ে নিয়ে সেই আগের অবস্থা
ফিরিয়ে আনে, গল্প করে, কাঁধে হাত রাখে।

হাসিনা সারা পথ একটা কথাও বলে না। অন্ধকারে দুটো মানুষ পাশাপাশি বসে,
কিন্তু তারেকের মনে হলো ওরা অনেক দূরের অধিবাসী, ফুটারের তীব্র গতি তীব্রতর
করে ধাওয়া করলেও সে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচবে না।

স্বাদ

কথাটি আমি কেন বলেছিলাম; তা আমি নিজেও জানি নে, জানার চেষ্টাও করি নি, প্রয়োজনও বোধ করি না। আর আপনারা শুনে আমাকে পাগল ছাগল ইত্যাদি অনেক কিছু বলেই অভিহিত করতে পারেন, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ ওটা আমার খুশি।

বলতে পারেন, আমার খুশি চরিতার্থ করার জন্যে একটা পরিবারে কান্নার রোল পড়ে গেল; চিন্তা, উদ্বেগ আর ভয়ে মানুষগুলো মুহূর্তে আধমরা হয়ে গেল, সেখানে নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই বড় নয়। সে ক্ষেত্রেও আমি বলবো—ওটা আমার খুশি।

আমরা ঢাকা থেকে রওনা দিলাম সকাল সাতটার সময়। আমরা অর্থাৎ আমি আসাদ ও নাজমা। আমি আগেই কমলাপুর বাস ডিপোতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বাস ডিপো তখনও জমজমাট হয় নি, কিছু কিছু যাত্রী আসছে, দু'একটা করে সরকারি বাস রাস্তায় বেরুচ্ছে। অথচ দিনটা কিন্তু গরমের দিন। আর সকাল সাতটা মানে তো অনেক বেলা। আগে দেখেছি, ছ'টার আগেই রাস্তাঘাটে বাস রিকশা বেবি বেরিয়েছে, লোকজন চলাফেরা শুরু করেছে, সকাল হতে না হতেই জীবন যেন পূর্ণতার দিকে দ্রুত ধাবমান হচ্ছে। আর এখন জীবনের পূর্ণতা? মানুষ কার প্রতি ধাবমান হবে। মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে চাইছে কিন্তু তার প্রতিই ধাবিত হচ্ছে পূর্ণমাত্রায়। এই আমাদের পাড়ায়ই একটা ঘটনা ঘটেছে গতকাল রাতে। সালাম সাহেব নামে এক ভদ্রলোক ঠিক করেছেন যে সকালেই তিনি গ্রামের বাড়ি চলে যাবেন, একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত শহরে ফিরবেন না। কিন্তু রাত্রে মিলিটারি এসে লোকটিকে ধরে নিয়ে গেল। কারণ জানতে চাইছেন? সাড়ে সাত কোটি লোক যেখানে দেশদ্রোহী আর বিশ্বাসঘাতক, সেখানে কারণের প্রশ্ন তুলে অকারণে বিব্রত হচ্ছেন কেন?

এই কয়েকদিন থেকে মৃত শহর দেখতে দেখতে কেন যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর ভালোও লাগছে। এত বড় একটা শহর, বেলা থাকতে থাকতেই রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করে, মানুষগুলো যেন দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো, আর মৃত্যু, সে যেন ছেলের হাতের মোয়া। বেঁচে আছি কিনা, সেটা বুঝতেই অনেকক্ষণ সময় লাগে। অনেকে বলেন, মৃত্যুর একটা অপার সৌন্দর্য আছে। নিশ্চয়ই আছে, নইলে মৃতদেহ

নিয়ে যাবার সময় অতো পবিত্রতার সাথে, ভক্তির সাথে নিয়ে যেতাম না। পঁয়ষটি সালের যুদ্ধে যখন ব্ল্যাক আউট থাকতো রাত্রে, তখন ঢাকা শহরটাকে আমার ভারি ভালো লাগতো। হয় তো মৃত্যুর অমন শান্ত, নীরব ও কালো চেহারা দেখে।

তাহলে বলবেন, আমি যাচ্ছি কোথায়। সত্যি বলছি, আমি এবারে ঠিক যাচ্ছি না, আমাকে যাওয়াচ্ছে। আগেই বলেছি আমি আর নাজমা রওয়ানা দিলাম সাতটায়। আমার এবারে যাবার ইচ্ছে ছিল না, কারণ ঢাকা থেকে কিছু ছেলে সংগ্রহ করতে হবে, তাদের রাস্তাঘাট বাতলে দিয়ে আগরতলা পাঠাতে হবে, শহরের ভেতরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, কিন্তু এসে জুটলো এই ঝামেলা। নাজমার বাবা কেমন করে বেন জানতে পেরেছেন, আমি ইতিমধ্যে দু'বার ঢাকা-আগরতলা করেছি। তাঁর কথা শুনে মনে হল, তিনি জানামাত্র আর দেরি করেন নি, ছুটে এসেছেন আমার কাছে।

বাবা, তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারো।

আমি!

হ্যাঁ, তুমি। তোমার কোন ভয় নেই, তোমার সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, তা জান বেরিয়ে গেলেও কাউকে বলবো না। সত্যি, তোমরাই দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

নাজমার বাবার এসব কথা শুনে মনে হলো, ভদ্রলোক রাজনীতিক হলে ভালো করতে পারতেন, বেশ উদ্দীপনামূলক কথা বলতে পারেন। ইচ্ছে হলো বলে দিই— কেন, এখন কেন? ঠেলার পড়েছো বুঝি? তখন তো বাবা দরকার পড়লে গুণা দিয়েও মারাবে বলে শাসিয়েছিলে।

ভদ্রলোক আমাকে কেন শাসিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটু বলার অনুমতি চাইছি। তাঁর ওই যে মেয়ে! আমার বিশ্বাস ছিলো, তার কারণ সময় সুযোগ পেলেই আমাদের বাসায় আসতো, গল্প করতো। গল্পটোল আমার তেমন করা আসে না। কিন্তু আমি দেখেছি, তখন নাজমার সাথে গল্প করতে বসলে কেমন যেন তরতর করে কথা এসে যেতো, ওহিয়ে, এমন কি কাব্যি করেও কথা বলতে পারতাম। আর সময়? ওটা যে কোনদিক দিয়ে পার হয়ে যেতো, টেরই পেতাম না। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, নাজমাকে ভালোবাসি বলেই সময়ের হিসাব রাখতে পারি নে। নাজমাও তাই। বলতো,

তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময় যে কোন দিক দিয়ে চলে যায়, বুঝতেই পারি না।

আমারও যে তাই। বলতো, কেন এমন হয়?

ন্যাকা।

এ হচ্ছে প্রথম দিককার কিছু সংলাপ। ইতিমধ্যে গুরু অনেক চিঠি আমার কাছে আর আমার অনেক চিঠি গুরু কাছে জমা হয়েছে। মোড়ের দোকান থেকে একবারে বারোটি কুলওলা 'যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে' প্যাড কিনে ওকে ছয়টি দিয়েছিলাম, আমি রেখেছিলাম ছয়টি। প্যাডগুলো প্রায় শেষ। শুধু তাই নয়,

আমরা যে যুগল ছবি উঠিয়েছিলাম, তা দুজনের কাছেই দুই কপি আছে। অর্থাৎ
ব্যাপার যখন জমজমাট তখন নাজমা নিজের থেকেই বললো,

তুমি আবার কাছে প্রস্তাব পাঠাও।

পাঠিয়েছিলাম। মনে হলো তিনি খুশি নন।

এ্যা, বল কি! না, না, এ হতেই পারে না। তোমাকে না পেলে আমি মরে যাবো।

তুমি যদি আমাকে গাছতলায় রাখো, কুঁড়েঘরে রাখো, এক বেলা ভাত নাও, তাও
রাজি। ওগো!

আমি একজন বেসরকারি কলেজের মাস্টার বলে তোমার আকা একটা কটাক্ষ
করেছেন। তবুও, আমি আবার লোক পাঠাবো।

এর পরে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। অনিবার্যভাবেই অপমানিত হয়ে ফিরে
এসেছে। আর যে সব মন্তব্য তিনি করেছেন তাও শুনেছি নাজমার মুখেই। তিনি নাকি
নাজমাকে নিজে হাতে বিষ দিয়ে মারতে রাজী, তিনি নাকি আমাকে দরকার পড়লে
গুণ্ডা দিয়ে শায়েস্তা করতেও দ্বিধা করবেন না। নিজে বেঁচে থেকে নাজমাকে মরতে
দিতে যেমন রাজি ছিলাম না, তেমনি নাজমাকে বাঁচিয়ে রেখে গুণ্ডার হাতে আমার
প্রাণটা খোয়াতেও আমি আদৌ রাজি নই। ফল যা, তাই হলো। নাজমা নিজে বিয়ের
কার্ডটা দিতে এসে কাঁদলো, বললো, তোমার স্মৃতি আমি জীবনেও ভুলবো না।

সুখে থাকো, শান্তিতে থাকো। আমি এর বেশি বলতে পারি নি। পরে কার্ডটা
খুলে দেখলাম, জামাই ইপিসিএস অফিসার, ক্লাস ওয়ান সরকারি গেজেটেড চাকুরি।
নাম সৈয়দ শরফুদ্দিন আহম্মদ।

যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে নাজমার বাবাকে বললাম,

আমি কিছু কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও এমন করতে বাবা।

আপনি খুলেই বলুন না।

তুমি হয় তো জানো, মিলিটারি অপারেশন শুরু হওয়ার সময় শরফুদ্দিন
কুমিল্লাতে ছিল। নাজমা এখানেই, আমার কাছেই। শরফুদ্দিন ওখান থেকে
আগরতলা চলে গেছে।

কেন তিনি কি তেমন কিছু করেছিলেন?

হ্যাঁ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগকে প্রচুর সাহায্য করেছে,
ছেলেদের রাইফেল বন্দুক দিয়ে দিয়েছে; ওর না পালিয়ে উপায় আছে? মিলিটারিদের
লিষ্টে ওর নাম দুই না তিন নম্বরে।

ওনার কোন খবর পেয়েছেন?

হ্যাঁ। বাংলাদেশ সরকারের কাজ করছে। ও-ই খবর পাঠিয়েছে নাজমাকে
পাঠিয়ে দেবার জন্যে।

খবর এনেছে কে?

শরফুদ্দিনদের গ্রামের একটি ছেনে ওপারে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিল, সেই।

ভদ্রলোকের ওই অসহায় অবস্থাটার সুযোগ আমি নিতে ছাড়ি নি। একটু কাঁখালো গলায়ই বললাম,

যে খবর এনেছে, তার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিন না কেন।

তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, মনে হলো, তক্ষুণি বুঝি তাঁর চোখ দিয়ে ঝল ঝল করে পানি পড়বে। যদিও তিনি কাঁদলেন না, কিন্তু এমন আকুল হয়ে হাত দুটি জড়িয়ে ধরলেন যে আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি। তবুও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বললাম,

শরফুদ্দিন সাহেবের জন্যে তাঁর জীবন কি হবে? তিনি তো কুমিল্লায় নেই, ঢাকাতে।

তুমি জানো না বাবা, বহু খবর পেয়েছি, স্বামীর অপরাধের জন্যে ফ্যামিলির ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, তাও না পারলে আত্মীয়-স্বজনকেও ছাড়ছে না।

তাহলে আপনার জামাইয়ের জন্যে আপনাদের ওপরও বিপদ আসতে পারে।

কিন্তু এবারে তিনি সত্যি সত্যিই কঁদে ফেললেন।

আমরা আর বাঁচতে চাইনে। ও যদি বেঁচে থাকে, সুখে থাকে, তাহলেই আমরা সুখী।

এরপর তিনি একটি বড় নিঃশ্বাস ছাড়লেন, কান্না দমন করার জন্যে বারবার নাক টানতে লাগলেন। নিজেকে একটু স্বাভাবিক করে বললেন,

যার তার হাতে তো বয়সী মেয়েকে দেয়া যায় না। তুমি ওকে জানো, তা ছাড়া তোমার ওপর আমার একটা বিশ্বাস আছে, তাই অনুরোধ করলাম।

নাজমার বাবার এই সব কথা এখন আমার কাছে খন ভোলানো মনে হলেও তখন কিন্তু আমি হৃদয় হয়ে গিয়েছিলাম। বারবার ঘুরে ঘুরে একটা কথাই মনে হচ্ছিলো, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন, নাজমাকে আমার সাথে পাঠিয়ে তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমি তার পরেই রাজি হয়েছিলাম। এবং তিনি আমার আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করেন নি।

পোশে সাতটার দিকে নাজমা ও তার বাবা এলো। আপনারা শুনে হয়তো হাসবেন, যে নাজমাকে আমি প্রথমে নিয়ে যেতে অস্বীকার করতে চেয়েছিলাম, তারই আসা দেখি দেখে বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, রাস্তা দেখছি, কৈ, আসে না তো! ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একদিন মাত্র দেখেছিলাম স্বামীর সঙ্গে বেবিতে চড়ে যাচ্ছে। আমাকে নেখে নি। আমাকে দেখে নি বলে ভালো লাগল, দেখলে হয়তো পুরনো কথা মনে হতো, হয় তা কল্পনার হাসি হাসতো মনে মনে। কতদিন দেখি নি ওকে। না জানি কেমন হয়েছে। স্বামীর চিন্তায় তকিয়ে গেছে।

তেমন না তকালেও চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রাগে ঘুম হয় নি ওর। ও যে একটা বিপদের সাগর পাড়ি দিতে যাচ্ছে, তাও আমার সেই মুহূর্তে মনে হলো, আমার সঙ্গে একত্রে যাবে বলে হয় তো পূর্ব স্মৃতির

রোমন্থনে অনিদ্র রাত্রি যাপন করেছে। সত্যিই আমি কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম যে নাজমার সত্যিই বিয়ে হয়েছে।

বাস ছাড়ার সময় নাজমার বাবা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। তিনি আমার ও নাজমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন,

বাবা, বাড়ি পৌঁছে চিঠি দিও।

কি জবাব দেবো বলুন? বাসের দু'চারজন সহযাত্রী লক্ষ করলে এই আশীর্বাদপুষ্ট বিদায় পর্ব যেন সত্যি সত্যিই স্বস্তির মেয়ে-জামাই কিংবা পুত্র-পুত্রবধুকে বিদায় দিচ্ছেন। আমার চট করে মনে পড়লো আমরা যে একত্রে আসি নি, এই জিনিসটা কেউ খেয়াল করে নি তো। অপরাধীরা যা করে আমিও তেমনি বাসের সমস্ত যাত্রীর মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

নাজমা, বুঝতে পারলাম, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, ফুলে ফুলে উঠছে শরীরটা, শাড়ির আঁচল দিয়ে নাক ও চোখ মুছেছে, পুরুষরা নাকি একটু শক্ত হয়, তাই আমি কপট বেদনা ভাবাক্রান্ত চোখ মুখ করে বসে রইলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। মতিঝিলের বাঁকটা নেবার সময় আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ওর বাবা এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন গাড়িটার দিকে।

আমরা পাশাপাশি বসে। এতক্ষণ স্বামীস্ত্রী অভিনয়ের প্রত্নুতি পর্ব চলছিলো বলে ঠিক তেমন অনুভব করি নি যে গায়ের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দুজন বসাতে আমি ভেতর থেকে কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করছি। নাজমার সঙ্গে তো পরিচয় আজকের নয়, এক সঙ্গে ঘুরেছি, রেষ্টুরেন্টে খেয়েছি, ছবি দেখেছি, ছবি উঠিয়েছি, কিন্তু আজ আমার শরীরটা বারবারই কাঁটা দিয়ে উঠছে। কিন্তু আমরা যদি সত্যি সত্যিই স্বামীস্ত্রী হতাম, তাহলে কি এমনটা হত? আমি অবিবাহিত যুবক, বিয়ে-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই, আমি বলতে পারবো না। কিন্তু বিবাহিত বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনেছি, না, প্রথম দিককার শিহরণ পরে স্বাভাবিক হয়ে আসে, ডালভাতের মতো মনে হয়। হবেও বা। অথচ নাজমা আমার স্ত্রী হতে পারতো। আজ দুজন গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে এমনকি স্বামীস্ত্রী অভিনয় করে এক সঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও ওর থেকে আমার কি দুষ্টর দুর্লভ্য ব্যবধান, জীবনের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর করে দিলেও আমি ওকে কোনদিন ধরতে পারবো না। স্বামীস্ত্রী, কি অদ্ভুত দুটি শব্দ, একে অপরের থেকে অভিন্ন, একটার সাথে আরেকটার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই শব্দ দুটির মাঝে আবদ্ধ হলোই দুজনই দুজনের চিরন্তন, চলাফেরা, শয়ন এবং সুখ-দুঃখের পারস্পরিক অংশীদার। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি এসব কি ভাবছি। যা হয় নি, তাকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে চাইনে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও যে আমার একেবারে সঙ্গে বসে আছে, তা বিস্মৃত হই কি করে!

এবারে আমি প্রথম কথা বললাম। প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম,

আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

বিদ্যুৎশৃঙ্খলের মতো নাজমা চমকে উঠলো! কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর ভেমনি নিম্নকণ্ঠে জবাব দিল,

না, না। কষ্ট কিসের। আমার জন্যেই তো আপনার কষ্ট।

দূর! এ আবার কষ্ট নাকি।

নাজমা এ-কথার জবাব দিল না। আমি ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছি, দেখলাম একটু মিষ্টি করে হাসলো। আমি কিন্তু বলার মতো আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি নে। ভেবেছিলাম, দুজন গল্প করতে করতে যাবো, কিন্তু ওহার মুখে পাথর পড়ে যেমন মুখটা আটকে রাখে ভেমনি আমার মুখটা কে যেন আটকে রেখেছে।

আপনারা তুলে বিশ্বাস করতে চাইবেন না, চান্দিনা যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা কোন কথা বলতে পারি নি। দুজনই পথের ধারের দৃশ্যগুলো দেখছি, ওর কি মনে পড়ছে না পড়ছে, চোখে ধরা দিচ্ছে না দিচ্ছে আমি জানি নে, কিন্তু আমার চক্রাকারে কেবল একটি কথাই মনে পড়ছে—আমরাও তো স্বামী-স্ত্রী হতে পারতাম। আমি ঐ সময়টা আদৌ ওরুড়ু দিয়ে চিন্তা করিনি যে মিলিটারি আমাদের গন্তব্য বুঝতে পারলে শেষ করে দেবে, সারা দেশ জুড়ে নরকের রাজত্ব সৃষ্টি করে ফেলেছে ওরা। রাস্তায় মিলিটারি কনভয় দেখেছি দুটো, ফেরিতে শরীর ও বাকস তল্লাশি করেছে, কিন্তু আমার ঐ এক চিন্তা, আপনাদের কাছে হয়তো হাস্যকর লাগছে, কিন্তু আমি এর চেয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারি নি।

চান্দিনার আহম্মদ আলী সাহেব আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

কি ব্যাপার আসাদ সাহেব, আপনি না বলে গেলেন মাসখানেকের মধ্যে আর যাবেন না। কিন্তু সত্তাহ যেতে না যেতেই আবার!

হেসে বললাম,

ফ্যামিলি বাড়িতে রেখে এসব কাজ করা সম্ভব নয়। ওর বড় ভাই ভাবি আগরতলা চলে গেছেন, ওদের ওখানে রেখে আসি।

নাজমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

ইনিই হচ্ছেন সেই আহম্মদ আলী সাহেব, যার সাহায্যেই দুবার ঢাকা-আগরতলা করেছি।

আহম্মদ আলী সাহেব আমাদের খুব খাতির যত্ন করলেন। বারবার বললেন, ভাবি, গরিবের বাড়িতে আপনার খুব কষ্ট হবে। আমি বলছিলাম, একটা দিন থেকে যান।

অত্যন্ত স্নিগ্ধভাবে জবাব দিল নাজমা,

না, ওর ঢাকার অনেক কাজ। আর আমাকে যতো তাড়াতাড়ি রেখে আসতে পারে।

আহম্মদ আলী সাহেব আর বাধ সাধলেন না। রাত সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। আমার দিকে একটা সিগ্রেট এগিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন,

ওই পূর্ব দিককার ঘরে আপনারা বিশ্রাম নিন। রাত একটার সময় আপনাদের ডেকে দেবো।

নৌকা ঠিক আছে?

হ্যাঁ, সবকিছু রেডি। নৌকায় চড়বেন, ভোর বেলায় গিয়ে পৌঁছুবেন বকস্‌নগর, ব্যাস! আর পায় কে?

সারা রাত্তা যে কথাটি মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে, সেইটি যেন সিংহদ্বার খুলে বাস্তব সত্য হয়ে সশব্দে আমার সামনে এসে হাজির হল। নাজমা যতো যাই ভাবুক, অবশিষ্ট চার সাড়ে চার ঘণ্টা আমার সঙ্গে তাকে স্ত্রী হিসেবে এক ঘরে থাকতে হবে। আহম্মদ আলী সাহেব যখন ঘরে বিশ্রাম নেবার কথা বলছিলেন, তখন আড়চোখে নাজমার দিকে তাকিয়ে দেখি, মাথাটা নীচু করে বসে একটুকরো কাগজ কুচি কুচি করছে। মনে পড়লো সারাটা পথ আমার হৃদয়কে এমনি করে কুচি কুচি করেছে, কিন্তু আর নয়, কারণ এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না, শিকার একেবারে হাতের মুঠোয়, যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে খেলানো যায়, খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার করা যায়, তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। হয়তো প্রতিবাদের চেষ্টা করবে, কিন্তু সে প্রতিবাদের ভাষা নিশ্চয়ই দুর্বল, ক্ষীণ ও ভগ্ন শোনাবে, মনে হবে একটা রুগ্ন শিশু চি চি করছে। অনুমান করলাম, নাজমা কি বলে প্রতিবাদ করবে,—জঘন্য, নীচ, হীন মনোবৃত্তির মানুষ, আমি আগে ভাবি নি, পশু, নরাধম, পামর ইত্যাদি ইত্যাদি বাছা বাছা গালিগালাজের শব্দ।

আমার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠলো। আমি এগুচ্ছি সেই গম্ভীর দিকে, যা বহুদিনের অপেক্ষার পর পেয়েছি। হোকনা সে পরস্ত্রী। সে তো আমার স্ত্রী হতে পারতো। রাত্তায় বাসটা একটা দুর্ঘটনা এড়াতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে ব্রেক করেছিল ড্রাইভার, আর তার ফলে নাজমা আমার বুকের মধ্যে ছিটকে এসেছিল। ওর মুখের সঙ্গে মুখ লেগেছিল, বুকের সঙ্গে ওর স্তন দুটো যেন লেপটে গিয়েছিল। আমি সেই মুহূর্তে অনুভব করেছিলাম, আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে; বলতে পারেন! ক্ষুধাটা আমার তখন ভুঙ্গে উঠে গেছে।

সাড়ে চার ঘণ্টার স্ত্রী হিসেবে নাজমা ঘরে ঢুকলো। আমি খুব সতর্কভাবে লক্ষ করলাম, আহম্মদ আলী সাহেবের ওই প্রস্তাবে নাজমার কোন প্রতিক্রিয়া ঘটেছে কিনা। না, ও স্বাভাবিকই আছে। তাহলে কি ও রাজী? কিংবা, এটাও তো হতে পারে, এখানে অমন স্বাভাবিক অভিনয় না করলে খারাপ দেখাবে! কিন্তু ঘরে তো আমরা মাত্র দুজন। এখানেও? ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেলাম। প্রথমেই গায় হাত দিইনি। নাজমা বললো,

আপনি চট করে বানিয়ে একটা ভালো জবাব দিয়েছেন।

কোনটা?

ওই যে, আগরতলাতে আমার ভাই-ভাবির কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন।

ও। যদি না বলে সত্যি কথাটাই বলতাম।

কি আর হতো?

আমি ভালোভাবে ওর মুখের দিকে চাইলাম—সত্যি কি আর হতো। নাজমা মিট মিট করে হাসছে। সেই হাসি, সেই চাহনি, সেই অভিব্যক্তি। আমি বারবার মনে করতে চাইছি ও পরস্ত্রী, কিন্তু প্রতিবারই মনে হচ্ছে ও অবিবাহিতা, আমার সেই নাজমা। না, আমি উন্মাদ হয়ে যাই নি বলে পরস্ত্রী কথাটাও বিস্মৃত হই নি এবং সে জনোই ওকে আমি ঠান্ডা মাথায় ভোগ করতে চাইছি। বললাম,

খুব তো বলেছিলেন, আমার স্মৃতি চিরকাল মনে রাখবেন।

রাখি নি, তাই বা কে বললো?

কই, তার তো কোন প্রমাণ পাইনি আজ পর্যন্ত।

মুহূর্তে সুদক্ষ অভিনেত্রীর মতো ঘাড় ফিরিয়েই নাজমা বলে উঠলো,

তোমার মনের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো তো তুমি আমাকে ভুলতে পেরেছো কিনা। পারো নি, নিশ্চয়ই পারো নি। আমার মন ডেকে বলে, তুমি এখনও আমাদের যুগল ছবিটা দেখো, চিঠিগুলো পড়ো। বললে বিশ্বাস করবে, আমি এখনও আমাদের ছবিটা সযত্নে লুকিয়ে রেখেছি। জানি, ওই ছবি দেখলে আমার স্বামী আমাকে অবশ্যই সন্দেহের চোখে দেখবে, কিন্তু আমি ওটা কিছুতেই নষ্ট করতে পারি নি।

যেন অস্বার্থ্যমী হয়ে নাজমা আমার কথাগুলো বলে যাচ্ছে। ওর কথাগুলো বিন্দুবিসর্গ মিথ্যে নয়। যে উদ্দেশ্যটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, সেটি চরিতার্থ করার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে পুনরায় আঘাত করলাম।

কেন, একটা চিঠিও তো দিতে পারতে। জবাব না হয় না-ই চাইলে।

ছেলেমানুষী করো না। অন্যের স্ত্রী হয়ে যাওয়ার মধ্যেই যদি প্রেমের মৃত্যু ঘটে, তাহলে সেটা আর যাই হোক, প্রেম নয়। আরো একটা কথা বলি, বিশ্বাস করবে? তুমি যে মুক্তিবাহিনীর হয়ে কাজ করছো, এজন্যে আমি অনেকবার আল্লার কাছে কান্দাকাটি করেছি যাতে তোমার কোন অমঙ্গল না হয়।

নাজমা যে আমায় ক্রমশ দুর্বল করে ফেলছে। অথচ আমি চাই, ও নিষ্ঠুর হোক, আমাকে আঘাত করুক, যাতে আমি পুনরাঘাত করে আমার ঈর্ষান্বিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি। শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম,

ওসব ছেলে ভুলানো কথা ছাড়ো। ছলনার নাম যে নারী, একথা যতোই ঢাকার চেষ্টা করো, পারবে না। তুমি যে এখন অন্যের বৌ এটা যেমন সত্যি কথা, তেমনি আমার অধিকারে যে তুমি কিছুকণ আছো, সেটাও তেমনি সত্যি। ওসব ন্যাকামোয় আমি বিশ্বাস করি নে।

পাথরের চোখ নিয়ে নাজমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ধারণা করলাম, এটাই সুবর্ণ সুযোগ। জড়িয়ে ধরলাম আমি তীব্রভাবে। কিন্তু কৈ, নাজমার তরফ থেকে কোন বাধা নেই কেন? আমি যে ওর প্রেমের কোন মর্যাদা দিতে জানি নে সেই কথাটাই কি ও প্রমাণ করে ছাড়বে? তাহলে যে আমি হেরে যাবো। ছেড়ে দিলাম

ওকে । একটু দূরে চেয়ারে বসে ওকে লক্ষ করতে লাগলাম । কোন প্রতিক্রিয়া নেই, স্থবিরের মতো বসে । ঘরে মৃদু আলো আর বাতাস, বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে আর তার সাথে সাথে কাঁপছে নাজমার ছায়াটা, মনে হচ্ছে দেয়ালে একটা বিরাটাকার ভল্লুক মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিচ্ছে । এই সময়টা আমার একটু ভয় করে । মানুষ যখন ডুবে মরতে বসে, তখন হাতের কাছে যা পায়, তাই যেমন আঁকড়ে ধরে, তেমনি, নাজমাও যদি বাঁচার জন্যে শেষ অবলম্বন হিসেবে আমাকে আক্রমণ করে । তা পারে, কামড়ে খামচে দিতে পারে, চিৎকার করতে পারে । আসতে লক্ষ করেছি, ওর হাতের নখগুলো বেশ বড় বড় । দেখেছি, ডান হাতের নখের আগায় হলুদ জমেছে । ওরা নিশ্চয়ই বাড়িতে হলুদ বেশি খায় । ওর নখ দিয়ে ও আমায় ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারে । মনে যতই সাহস সঞ্চয় করে ওর ওপর স্বামীসূলভ প্রতিশোধ নিতে চাইছি, ততই দেয়ালে ভল্লুকের ছায়াটা জোরে গা ঝাড়া দিচ্ছে ।

একটা সিগ্রেট ধরলাম । রিং করে ধোঁয়া ছাড়ছি আর ভাবছি, না আমাকে দিয়ে কিছু হবে না । ও কেন নিষ্ঠুর হয় না । শেকস্পীয়রের অনুসরণে বলা যায়, একটা নিষ্ঠুর লোকের সঙ্গে কাজ করা যায়, কিন্তু একজন কুটিল লোকের সঙ্গে নয় । নাজমার মনে কি আছে কে জানে? আমি মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে জানালা দিয়ে তারাখচিত আকাশ দেখতে লাগলাম । সিগ্রেটটা পুড়তে পুড়তে যখন আঙুলে আঁচ লাগল, তখন নাজমার দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন মরে গেছে । ডাক দিলাম,

শুনছেন, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না । আপনি শুয়ে পড়ুন ।

এতো শান্ত, এতো নিরুত্তাপ নিরুদ্দিগ্ন কণ্ঠে ও জবাব দিলো যে আমি দ্বিতীয় কোন বাক্য উচ্চারণ করতে পারলাম না । দুর্ভাগ্য আমার, না পারলাম প্রেমের মূল্য দিতে, না সফল হলাম এই সুযোগের সদ্যবহার করতে ।

নৌকায়ও আমাদের মধ্যে তেমন কথা হয় নি । খুব সন্তর্পণে এগুতে হচ্ছে, দূরে বর্ডারে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, কানে এলো একটা ডিনামাইট ফাটার শব্দ, নিশ্চয়ই বিচ্ছুগুলো ব্রীজ-ট্রিজ একটা কিছু উড়িয়েছে । বাশার আর নিয়ামত, দুইজন বিশ্বাসী মাঝি নৌকা চালাচ্ছে । নিয়ামত বললো,

ভাবি, আপনার সাদা শাড়ি পরে আসার উচিত হয় নি ।

আমি আমার গা থেকে গাঢ় ছাইরঙা শার্টটা খুলে নাজমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বললাম,

পুট অন ।

খুব কাছেই আরেকটা বোমা ফাটলো । নাজমা প্রায় গা ঘেঁষে বসলো আমার ।

আমরা ভোরে পৌঁছে গেলাম বকস্নগর । বাশার আর নিয়ামত ফিরে গেলো । রাতের অবশিষ্টটুকু কাটলাম থানায় । থানার দারোগা চিন্তাবাবু আমাকে চেনেন, দেখে হেসে বললেন,

এবারে বৌদিকে নিয়ে লড়াই করবেন নাকি দাদা?

হ্যাঁ আপনার বৌদি নাকি এবার একহাত দেখিয়ে দেবে।

আমরা চা খেলাম ওখানে। চিত্তাবুই জীপ ঠিক করে দিলেন। ড্রাইভারকে বলে দিলেন,

সোজা নামিয়ে দিবি জয় বাংলা অফিসে।

বেশ দূর থেকেই দেখা যায়, আগরতলায় সিপিএম অফিস, দোতলায় নাইন বোর্ড ঝুলছে। বেলা তখন বারোটা মতন বাজে, ঢাকা থেকে পাশাপাশি বসে আসছি, কিন্তু চান্দিনার পর থেকে আমি ওকে তেমন কিছুই বলতে পারি নি, যেন দুজনই দুজনার অপরিচিত। সিপিএম অফিস চোখে পড়তেই বললাম,

এসে গেছেন। এখন নিশ্চিত?

নাজমা কোন জবাব দিল না। আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছে নিল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল,

ওটা কি জয় বাংলা অফিস?

না। ওর পাশে, রাস্তার মোড়টা ঘুরলেই।

শরফুদ্দিন সাহেব অফিসেই ছিলেন। আনন্দ ও বিষয়ে তিনি অনেককণ কথো বলতে পারলেন না। আমার পরিচয় তিনি নাজমার কাছে জানতে চাইতেই বললাম,

মামাতো ভাই। আপনি আমাকে দেখেন নি। আপনি তো দুলাভাই হন আমার।

তাই নাকি! চমৎকার সম্পর্ক। কথাটা বলেই শরফুদ্দিন সাহেব হা হা করে হাসলেন।

আমি একটু স্থিত হেসে জবাব দিলাম,

দুলাভাই, আমাকে কিন্তু এক্ষুণি ফিরতে হবে।

সেকি!

নাজমা আমায় বাঁচালো।

ঢাকায় ওর অনেকগুলো অপারেশন বাকি। স্রেফ আক্বার অনুরোধে আমাকে রাখতে এসেছে।

আমি আর দাঁড়াই নি। শরফুদ্দিন সাহেবকে একটা সালাম দিয়েও আসি নি। তরতর করে নিচে নেমে এলাম। রাস্তা থেকে দোতলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, নাজমা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। মনে হলো, বিষণ্ণ।

দাউদকান্দি ফেরি পার হওয়ার সময় দেখলাম একটা মিলিটারি জীপ, সামনের সীটে একজন অফিসার বসে নিশ্চিন্ত পাইপ টানছে, দুই পাশের সীটে দুজন করে চারজন সেপাই আর পেছনের সীটে একটি মেয়ে। মেয়েটির তাকানো দেখে মনে হল, তার চোখের সামনে সব কিছুই শূন্য, যেন একটা জড় পদার্থ। ওর মুখে কিছু আঁচড়ের দাগও দেখলাম। জীপের ড্রাইভারটি অফিসারটিকে কি যেন বললো। কথাটা শেষ হয়েছে কিনা জানি নে, অফিসারটি শরফুদ্দিন সাহেবের মতো হা হা করে

হেসে উঠলো। দুজনের হাসিতে কী আশ্চর্য মিল। লক্ষ করলাম, হাসতে হাসতে অফিসারটি মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে। আমার সেই মুহূর্তে মনে পড়ে, শরফুদ্দিন সাহেবও অমন হা হা করে হাসতে হাসতে নাজমাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিলেন।

জীপের মেয়েটির মুখের দাগ দেখে বুঝলাম, যা হবার হয়ে গেছে। মেয়েটি নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করেছিল।

নাজমা যদি প্রতিরোধ করতো। নাজমা কিছুই করলোনা, বরঞ্চ আমাকে পরাভূত করে বিজয়িনীর মতো বসে রইলো, অবশেষে পৌঁছে গেল ওর স্বামীর কাছে, পেয়েও গেল তাকে, যার জন্যে এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছিল।

কিন্তু আমি কি পেলাম। কিছু সময়ের একক সঙ্গিনী হিসাবে পেয়েও আমি একক, টেলিগ্রাফ পোস্টটার মতো একক। হাসি পেল আমার, কি ভাবছি। প্রেম করলেই বিয়ে করতে হবে! আমি সে জন্যেই অকপটে স্বীকার করছি, নাজমা বা ওর খুশিতে আত্মহারা স্বামীর বিক্রম্বে আমার কোন অভিযোগ নেই, শরফুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ওপর যে চোখে মুখে পরম পরিতৃপ্তির ছায়া, তারজন্যেও কোন ঈর্ষা নেই, কারণ, ফিরতি পথে গোটা রাত্তাটা একটা কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছি, আমি যা পেয়েছি, শরফুদ্দিন তা নিশ্চয়ই কোনদিন পান নি।

ঢাকায় এসেই নাজমার বাবার সঙ্গে দেখা করলাম। অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে ওর বাবা মা জিজ্ঞেস করলেন,

কি বাবা, ভালোভাবে পৌঁছে দিয়েছো তো?

আমি মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো জবাব দিলাম,

আপনার মেয়েকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে।

সেই পাখির গান

সেই পাখির গান শুনে গিয়ে তারা প্রথমে কাতুর মার দ্যাখা পায়। দ্যাখা গেলো কাতুর মা দাওয়ার বসে পা ছড়িয়ে মিহি সুরে গানই গাইছে। তা পুরোপুরি বোঝা না-গেলেও অনুমান হয় সেটা কোনো একটা দৈনন্দিন জীবনধারার অংশ হবে। তাতে বাজার-হাট, টাকা-পয়সার কথা যেন কি কি আছে। শহর থেকে বেশ দূরে এই গ্রামে এমন একটি ঘন জঙ্গল আছে তা তাদের জানা ছিলো না, প্রথমে তাদের অরণ্য বলে ভুল হয়। তারা চুকবে কি চুকবে না চিন্তা করতে থাকে, ভয়ও হয় পাছে কোনো হিংস্র জীবজন্তু লাকিয়ে সামনে চলে আসে কিংবা বিষাক্ত সাপ ছোবল তুলে দাঁড়ায়। অথচ ফিরেও যেতে ইচ্ছে করে না, এতোদূর কেবল সেই পাখির গান শোনার জন্যে এসে ফিরে যাওয়া পশ্চম মনে হতেই তাদের আবদুত্বা বললো,

‘এখানে তেমন কোনো জীবজন্তু আছে কোনোদিন শুনি নি। তোমরা কি কিছু শুনেছো?’

তাদের মহিবুত্বা জবাবে বলে,

‘না, শুনি নি। তবে আরো দক্ষিণে তিনগাছির বাবুদের লিচু বাগানে একবার বাঘ এসেছিলো। তাও বছর পাঁচেক আগে।’

তবে তাদের আতিকুত্বা আমিনুত্বা হাফিজুত্বা হো করে হেসে ওঠে।

‘তুমি কি মনে করো পাঁচ বছর পরে সেই বাঘ এই জোড়গাছির জঙ্গলে চলে এসেছে?’

মহিবুত্বাও হাসে। তখন আবদুত্বা প্রস্তাব দ্যায়,

‘এসেছি যখন ফিরবো না। চলো।’

শহরে থেকেই তারা লোকমুখে শুনেছিলো এই জোড়গাছির জঙ্গলে একটি পাখি এসেছে, সেটি সকালে একরকম, দুপুরে একরকম ও সন্ধ্যায় একরকম গান গায়; একটু কান ফেলে শুনে মনে হয় সারাদিনে সে তিনটি কাহিনী বিবৃত করলো। তারা কোকিলের ডাক শুনেছে, যদুনা টিয়া কাকাতুরার কথাও শুনেছে, কিন্তু একই পাখির তিন বেলায় তিন রকম গানের কথা শোনে নি, আর কেউ শুনেছে বলেও জানা নেই। শব্দটা শহরেও অনেকে জানলেও চোখে দেখেছে বলে না, বলে, কেবল শুনেছে। তারপরই আবদুত্বারা সেই পাখির গান শুনে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের প্রথমেই

অড়হরের ক্ষেত । গাছ সরিয়ে সরিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরও তারা পাথর নিশানা পায় না, সামনে যতদূর চোখ যায় অড়হরের ডালপাতাই চোখে পড়তে থাকে, বড় গাছগাছালিও নেই । তাদের সামনে দিয়ে একটা বেজি দৌড়ে যায়, হাত দশেক দূরে একটা অড়হর গাছে দুটো দোয়েল অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাদের দেখে ফুরুৎ করে উড়ে যায়, মাথার ওপরে একটা চিল উড়তে দ্যাখা গেলো । তাদের হাফিজুল্লা বেশ অবাক হয়ে চিল দেখতে থাকে । এ পাখিটা বেশ দুর্লভ হয়ে আসছে । তা হোক, কিন্তু আর কতোক্ষণ এভাবে চলতে হবে বুঝতে না পেরে তাদের আতিকুল্লা ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দ্যায়, কিন্তু আমিনুল্লা রাজি হয় না । বলে, ‘কারো না কারো দ্যাখা পাবোই ।’

দ্যাখা পায় ফাতুর মার । চলতে চলতেই তারা একটা ফাঁকা জায়গা পায় এবং সেখান থেকেই দেখতে পায় অদূরে বিরাট এক বকুল গাছের তলে একটা ছনের ঘরের দাওয়ায় পা মেলে এক যুবতী মুখ নীচু করে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মিহি সুরে গান গাইছে ।

তাদের একসাথে রূপকথার জনশূন্য রাজবাড়িতে নিঃসঙ্গ রাজকন্যার গল্প মনে পড়ে । মনে পড়ে যে কোনো মুহূর্তে রাক্ষস কিংবা দৈত্য বিকট শব্দ তুলে এসে রাজকন্যার মতো ফাতুর মাকে বাঁচিয়ে তাদের এক এক গ্রাসে খেয়ে ফেলবে । আবার এটাও মনে আসে এই ঘন জঙ্গলে যেখানে পাখি আর বেজি ছাড়া কোনো প্রাণী নেই, সেখানে এই যুবতীই যে আসলে রাক্ষসী নয় তারই বা কি প্রমাণ । একেবারে কাছে গেলে তার বর্তমান মূর্তি ছেড়ে মূলের মতো দাঁত বের করে হাঁউ মাঁউ কাঁউ ধরে ধরে খাঁউ করে তেড়ে আসবে । তাদের আর এগোনো হয় না । মহিবুল্লা ফিসফিস করে বলে,

‘পালাও, পালাও শিগগির ।’

প্রথমে তারা পায়-পায় পিছন ফিরে আসে ও ফিরে ফিরে চায়, কিন্তু ফাতুর মার মূর্তির কোনো পরিবর্তন হয় না বরং গান গাইতে গাইতে নিচু মুখ আরো নিচু হয়ে হাঁটুর কাছে ঠেকে যাবার উপক্রম হয় । একটু সাহস পায় তারা । হাফিজুল্লা বললো,

‘ও মানুষ ।’

‘এই জঙ্গলে একা থাকে? জিন পরী পোষে নাকি?’

‘তা পুষুক । আমরা জিন পরীর ক্ষতি না করলে তারা আমাদের করবে কেন? চল, সেই পাখি কোথায় আছে জিজ্ঞেস করি ।’

আবদুল্লারা আবার ফিরে আসে । এবারে তারা ভালো করে শোনে ফাতুর মা গাইছে ‘আমার আশি ট্যাকার বাজার কিডা খায়া ফ্যালালো রে?’

আমিনুল্লা তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,

‘এ যেন আশি টাকা বাজারের কথা কি বলছে?’

আতিকুল্লা তখন জোরে ডাকে,

‘তুমি কে গো?’

ফাতুর মা কোনো জবাব না দিয়ে একমনে গেয়ে চলে, 'রাঁধলাম না, বাড়লাম না, আমার আশি টাকার বাজার খায়া ফ্যালালো রে?'

'তোমার আশি টাকার বাজার কে খেয়েছে?'

'ও বাবারা, আমার আশি টাকার বাজার কিডা খায়া ফ্যালালো রে?'

'ধুন্তোরি, আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি, তোমার আশি টাকার বাজার কে খেয়েছে?'

ধুন্তোরি শুনেই ফাতুর মার গান ও মাথা-ঝাঁকানো বন্ধ হয়ে যায়। সে প্রথমে আমিনুল্লার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একে একে তাদের আবদুল্লাহ মহিবুল্লাহ আতিকুল্লাহ হাফিজুল্লাহর মুখের দিকে তাকায়। তারা পাঁচজনই একসাথে বোঝে ফাতুর মার সে-দৃষ্টিক্ষেপনে কোনো পাগলামি নেই। আবদুল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করে, 'এই জঙ্গলে তুমি একা থাকো, তুমি কে?'

ফাতুর মা আবার মাথা দুলিয়ে শুরু করে,

'আমি বনকুল গো-ও-ও, ছন্দে ছন্দে...'

চিৎকার করে ওঠে মহিবুল্লাহ,

'আমরা ভেবেছিলাম, ভালোমানুষ। এ তো পাগল!'

আরো জোরে চিৎকারে ওঠে আতিকুল্লাহ,

'তুমি কে?'

'আমি? আমি ফাতুর মা জননী।'

'তোমার ফাতু কোথায় থাকে?'

এইবার ফাতুর মা লাফ দিয়ে ওঠে। উঠে চারদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলে, 'ওই তো ওখানে।'

সে এমন একটা দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যার কোনো দিকই নেই। তাদের সবাই ফাতুর মার 'ওই তো ওখানে' অনুসরণ করে দেখলো চারদিকে অড়হরের ডাল পাতা মাথা দোলাচ্ছে, আকাশে তখনো সেই নিঃসঙ্গ চিলটা উড়ছে।

এবারে হাফিজুল্লাহ মোলায়েম গলায় বললো,

'শোনো ফাতুর মা-জননী, তোমার ফাতু কি মরে গেছে?'

'সে মরেও নাই, বাঁচেও নাই।'

'আশ্চর্য! মানুষ হয় মরবে না হয় বাঁচবে। তাহলে তোমার ফাতুর কি হয়েছে?'

'আম্মাই জানে!'

'আম্মা জানে যানে?'

'যা মানষি জানে না, তাই আম্মা জানে। আম্মার কামই তো তাই।'

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় হাফিজুল্লাহ।

সেই পাখির গান শুনে এসে এই জঙ্গলে এমন ফাতুর মার দ্যাখা পাওয়া যাবে আপে জানা থাকলে তারা কেউ আসতো না। শহরে তাদের তেমন কোনো কাজ

নেই। ছোট্ট শহর, সকাল হতে না হতেই পাঁচজনে এক সাথে মিলিত হয়ে একটু পরেই ভাবতে শুরু করে, আমাদের এখন কি করার আছে! তারা যেতে পারে শহর ছাড়িয়ে বহুদূরে কোনো গ্রামে নদীতীরে বনে-জঙ্গলে, কিন্তু সেই একই গ্রাম নদীতীর বন জঙ্গল একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়, নতুন করে আর কিছু দ্যাখার পায় না। এবং বহুদিন পর এবারে তাদের সেই রকম একটা অদ্ভুত পাখির গান শোনা ও তাকে দ্যাখার সুযোগ আসে।

ফাতুর মা তাদের বাসনার কথা শুনেই খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে,

‘বসো, সেই পক্ষীর কথা কই।’

‘তুমি সেই পাখি দেখেছো?’

‘কচ্ছি কি? মন দিয়ে শোনো। এই যে আড়ালের ডালের ক্ষ্যাত দেখতিছ্যাও, ইয়ের কোনো শ্যাষ নেই। তুমরা তো কবেনে যেদিক দিয়ে আইছ্যাও সেদিকই সীমানা আছে, কিন্তু আমি কই, তুমরা ওইদিক গেলি আর সে সীমানা ঝুঁজে পাবে না। আসে যখন পড়িছ্যাও তখন না হয় থাকেই যাও।’

তাদের পাঁচজনে ফাতুর মার ‘থাকেই যাও’ শুনেই ছিটকে লাফিয়ে ওঠে। তাদের সবাই বুঝে যায় ফাতুর মা এতোক্ষণ যে পাগলের প্রলাপ বকে যাচ্ছিলো আসলে কোনো কথা তার নিজের কথা নয়। মায়াবিনী রাক্ষসীর মানুষ ভোলানো কথায় তাদের এতোক্ষণ ভুলিয়ে রেখেছে। আর এক্ষুনি হয়তো আবদুল্লাকে দেখিয়ে বলবে, ‘দলের মধ্যে তুমিই যখন মোটা-তাজা, এসো তো বাছা কাছে এসো।’

অনুনয় করে আবদুল্লা বলে,

‘দেখুন, আমরা ভুল করে এসে পড়েছি। আপনাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে আমাদের ছিলো না। ভেবেছিলাম, কিছু তো করার নেই, সেই পাখিটার গান শুনে আসি। এমন পাখি নাকি এদেশে আর আসে নি। জানেনই তো এই দেশটা বড়ো হতভাগা। কতো মানুষ মরলো, কতো কি হয়ে গেলো, তাও মনে হয় কিছুই হয় নি। মানুষগুলোরও গণ্ডারের চামড়া বলতে পারেন। আমাদেরও কিছু করার নেই। তাই ভাবলাম যাই সেই পাখির গান শুনে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসি। বিশ্বাস করুন, আমাদের কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই।’

আবদুল্লার অনুনয় শুনে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে,

‘রাঁধলাম না, বাড়লাম না, আমার আশি ট্যাকার বাজার কিডা খায়া ক্যালালোরে এ-এ!’

মহিবুল্লা সামনে হাত জোড় করে বলে, ‘আপনি কেবল বলে দ্যান, কোনদিক দিয়ে গেলে আমরা শহরে ফিরে যেতে পারবো।’

ফাতুর মা এ আবেদনের কোনো জবাব না দিয়ে তাদের পাঁচজনকে ইশারায় গোল হয়ে বসতে বলে।

‘কেন, বসবো কেন?’

ভীত গলায় জিজ্ঞেস করে আবদুল্লা।

‘ওমা! না বসলি শান্তর জন্মে? বসো, বাবা সুনারা, বসো।’

ফাতুর মার কথায় হাত-পা ছেড়ে বসে পড়ে আবদুল্লা। ফাতুর মার কথাটা আবার সেই আগের মতো হাঁটুর কাছে চলে যায়। এবারে সে গান না করে ঝিঁঝিঁড় করে।

‘হাতিশালে ছিলো গো হাতি, ঘোড়াশালে ছিলো দুলদুল পজিরাজ, গোয়ালে দুখেল কালো গাই, দাঁড়ে ময়না পাখি যখন তখন গায়।’

‘ও ফাতুর মা, তোমার এসব ছিলো?’

‘দূর আবাগীর ব্যাটারা! তুমরা না শান্তর শুনবের বইছ্যাও। এ-সবই আমার ছিলে। আমার কুণ্ডে ছিলে, বিলেই ছিলে, আমি একটা বাছুর কিনিছিলেম, হুঁ হুঁ। আমি দুডে কইতর পুখিছিলেম। তার পাখার যে কী সুন্দর বাতাস! গায় লাগলি গাও টালা হয়ে যাতে।’

একটু থেমে ফাতুর মা আবার শুরু করে, ‘সে রাজপ্রাসাদের চূড়া মেঘ ছোঁয়া-ছোঁয়া, চূড়ার পতপত করে ত্রিবর্ণের পতাকা ওড়ে। কতো দেশ-বিদেশ থেকে কারিগর এলো, মজুর এলো, গাড়ি ভরে পাথর এলো, দিনে রাতে কাজ হতে হতে চোখের পলকে প্রাসাদ উঠে যায়। সে প্রাসাদের থামে মণি মুক্তা জ্বলে, চাঁদের আলো পড়লে চূড়ার গা থেকে সোনালি আভা বেরিয়ে দিকদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে যায়।’

‘ও ফাতুর মা, তোমার সে প্রাসাদ কোথায় ছিলো?’

‘এই ওলামের ব্যাটা ওলামরা, এ্যাতো প্যাটপ্যাট করো কি কামে? ইয়েজদি ঘরামি আমার ছোনের যে ঘর বানা দিছিলে মানষি তাকা তাকা দেখতে। জোয় বাতাস হলি ছোন উড়তে, আমার মনে হতে ফিলাগ ওড়তেছে। তার বাঁশের খুঁটি দেখে আমিই ভাবব হয়ে যাই, গিরেওলে দেখলি কিডা কবি না আসল থামের চায়েও মজবুত! যে হারামি কবি না সে বাপের জন্মই না। যাই কও তুমরা, ইয়েজদি খুঁজে খুঁজে যে ছোন আনিছিলে তা একেবারে সুনার মতো ঝকঝক করে। চোখে ধাঁধা লাগে।’

‘ও ফাতুর মা-জননী, তোমার রাজপ্রাসাদে এতো কিছু ছিলো, লোক লঙ্কর সেপাই সাত্তী ছিলো না?’

‘সৈন্যসামন্ত লোক লঙ্কর সেপাই সাত্তীর আনাগোনায়ে সে রাজপ্রাসাদ দিনে রাতে গমগম করে। রাজা হাঁক দিলেই সেপাই ছুটে আসে, রানি ডাক দিলেই সাত্তী ‘হুকুম করুন মহারানি’ বলে ছুটে এসে অভিবাদন করে। সুবিশাল রাজপ্রাসাদে লোকজনের কর্মব্যস্ততায় বাইরের মানুষ যেমন বোঝে এখানে অফুরন্ত সুখের সমাহার তেমনি পররাজ্যলোভী অন্য রাজারা জানে এখানে হাত বাড়ালে তাদের পরাজয় অনিবার্য।’

‘ও ফাতুর মা, হ্যাঁ মনে পড়ছে, আমরাও এ রাজপ্রাসাদে খবর শুনেছি। প্রথমে পড়েছিলাম ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি বইতে। কিন্তু জানতাম সে-সবই গল্প,

তবে শুনতে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু এই এলাকার সেই রাজপ্রাসাদের লোকদল এখনও গল্প গল্পই হয়ে আছে। ফাতুর মা, বলো।’

‘ওরে সতিনীর ব্যাটা হাড়হাভাতে। ইয়েকি মারা হচ্ছে? সে ঠাকুরমার গল্পে আমি জানি নে? আমার দুডে ব্যাটা ছিলে। লাউগাছের মতো তরতর করে বড় হয়ে উঠতিছিলে। আমার তিনডে বেটি ছিলে। গুলাপ ফুলির মতো ফুটে থাকতে। আমার লোকজনের অভাব কিসির রে? ডাক দিলিই ছুটে আসে, হাঁক দিলিই দল বাঁধে আসে কয়, ওমা, কি লাগবি তুমার? আদি যদি কই ওই পাড়ার নবী বকশ আজোবাজো কথা কয়ছে তাহলে তারা তক্ষনি ছুটে যায়। যদি কই ওই পাড়ার নবীজান আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তাহলি মিয়েরা কয়, ও মা, যায়ে চুল ছিঁড়ে দিয়ে আসপো?’

‘তাহলে তোমার এত সুখের সংসার কোথায় গেলো?’

‘বাঁধলাম না, বাড়লাম না, আমার আশি টাকার বাজার কিডা খায়া ফ্যালালো?’

‘সে আশি টাকার বাজারে কি ছিলো ফাতুর মা?’

‘রাজার ধনদৌলতের ভাগরে থাকে হীরা মণি মুক্তা চুনি পান্না। সোনা তো সামান্য বিষয়, রাজা রানি রাজপুত্র রাজকন্যা সোনার খালায় ভাত খায়, সোনার গ্লাসে জল পান করে, সোনার খাটে ঘুমায়।’

‘জানি ফাতুর মা, রূপকথার গল্পে তাই করে।’

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ফাতুর মা,

‘দ্যাখো বেজন্যার ঝাড়, কিসির রূপকথা? আমার দুই গাছা সুনার চুড়ি ছিলে, মাকড়ি ছিলে, একটা আংটি ছিলে। বাবজান রূপা দিয়ে মল বানা দিছিলে। লাগে, ইয়ের সাথে ওই শান্তরের সুনাগয়না লাগে? আমি বুঝতিছি তুমরা আমাক পাগল ঠাউরাইছ্যাও, কিন্তু বিশ্বেস করো বাবারা, আমি যা পাইছিলেম তাই আমার কাছে সাতরাজার ধন। কিন্তু আমার আশি টাকার বাজার কিডা খায়া ফ্যালালো?’

যে চিলটা এতোক্ষণ আকাশে উড়ছিলো সেটা সহসা ক্যা-এ্যা-এ্যা শব্দে ডেকে উঠে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। তাদের সবাই চমকে উঠে দেখলো চিলটা আন্তে আন্তে নামছে। এখন গাছের পাতাদেরও আন্দোলন নেই, কোথাও দোয়েল টুনটুনি চড়ই এমনকি একটা কাকও দেখতে পাওয়া যায় না।

‘তোমার আশি টাকার বাজার কে খেলো?’

‘রাজা।’

‘কোন রাজা?’

‘রাজপুত্র আর রাজকন্যার বাপ।’

‘তাহলে তো জানোই কে খেয়েছে।’

‘আমিও তো তাই কজি। শুনলি বুঝবে।’

ফাতুর মা এবার সোজা হয়ে বসে। এই সময় অড়হরের ক্ষেত আবার প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়। চিলটা ধারে কাছে কোথায় বসেছে বোঝা যায় না, ধারে কাছে বসার মতো তেমন উঁচু গাছও চোখে পড়ে না।

‘সেইদিন রাজার খুশি আর ধরে না। রাজকন্যা, রাজপুত্র অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে তাকায় আর ভাবে বাবা কোন রাজ্য জয় করে এলো?’

রানি রাজার কাছে দাঁড়িয়ে গায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে,

‘তুমি এতো খুশি কেন গো?’

মিটমিট করে হাসে রাজা। এদিক ওদিক তাকিয়ে রানির মুখে একটা চুমু ঝেয়ে বলে,

‘দ্যাখো, হাজার হাজার ধন এনেছি তোমার জন্যে।’

‘তুমি তো কোনো যুদ্ধে যাও নি, কোনো রাজার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় নি, তাহলে এসব ধনরত্ন?’

রাজার খুশির হাসি আর থামে না।

আবার জিজ্ঞেস করে রানি, ‘বলো না, কোথায় পেলে?’

হাসি থামিয়ে চারপাশ দেখে রাজা শান্ত গলায় বলে,

‘দ্যাখো তো, এই মালাটা চিনতে পারো কিনা?’

দেখেই চমকে ওঠে রানি। চিৎকার করে বলে ফাতুর মা,

‘তুমি ভাতুরির মিরের হার চুরি করিছাও? দুইদিন আগেও এই হার আমি গ্যাগা মিরের গলায় দেখিছি! তুমি এ কি করলে?’

‘চোপ শালি। আর যদি গলা চড়াইছিসতো এক কোপে নাবা দেবো। ভালো চাস তো সব তুলে রাখ।’—বলে বেড়ার গায়ে গৌজা কান্টেটা দ্যাখায়। সহসা কি মনে হয় ফাতুর বাপের। মোলায়েম গলায় বললো, ‘এ-সবই তো তোর। সব বাড়ি ছাড়ে গলায়ছে, উঠেনের পর একটা বাস্তির টিন পড়ে রয়েছে দেখলেম। পায় লাগতিই ঝনঝন করে উঠলে। খুলেই দেখি ভাবি আর মিরের সব গয়না। মিলিটারি যখন তাড়া করলে নিয়ে যাবের পারলে না? আমি না নিয়ে যদি মিলিটারি লিতো! মনে কর মিলিটারিই লেছে। আমার তিনডে মিয়ে নেই? আমার সাজায়ে ব্যাটার বৌ আনবের ইচ্ছে করে না? লিছি, বেশ করিছি। জানের ভয় আমার নেই? কই, আমি তো পলাই নাই। পলাই নাই, তাই পাইছি। পলালি, পাতেম না!’

জিজ্ঞেস করে আতিকুল্লা,

‘ফাতুর বাপ কোথায়?’

হা হা করে হেসে ওঠে ফাতুর মা।

‘সেই কথাই তো কই। দ্যাশে যে কি লড়াই লাগলে, ফাতুর বাপ ছাওয়াল মিয়ে। কোনো যে চলে গেল জানি নে।’

‘আর তোমার আশি টাকার বাজার?’

সেইদিন ফাতুর বাপ চাল কিনেছে, তেল মরিচ পিরাজ আদা রসুন পাঁচসের মাংস কিনেছে, কইও কিনেছে একটা। সাকুল্যে আশি টাকার বাজার। সেইদিন ফাতুর বাপ বললো,

‘আজ একটু ভাল রাঁধ । পরান ভরে খাই ।’
ফাতুর মা উদাস গলায় বলে,
‘তারপরে খানিকক্ষণ প্যাটপুট ধামধুম আওয়াজ শুনলেম, ফাতুর বাপ চ্যাঁচায়
আর কয়, ফাতুর মা, পলাও । পলালেম । আবার ফিরেও আসলেম । কিন্তু উরা কেউই
আসলে না ।’
আবদুল্লা তাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলে,
‘মানুষ মানুষকে কতোটা ভুলিয়ে রাখতে পারে?’
তখন ফাতুর মার মাথা আবার হাঁটুর কাছে চলে যায় এবং সে পুনরায় মিহি সুরে
‘আমার আশি ট্যাকার বাজার কিডা খায়া ফ্যালালোরে’ গান শুরু করে ।

এ কোন গৃহকোণ

অন্ধকারে উঁচু টিবিটা বোঝা যায়, টিবিতে ঘরের চালের আকার বোঝা যায়, চোখ ঠাণ্ড করলে বোঝা যায় টিবির ঢালুতে কলাগাছের পাতা দুলছে। আর কিছুই বোঝা যায় না, টিবির ওপারে যে ধূ-ধূ শূন্যতা, এপারে ডাইনে বামেও বিরান প্রান্তর, কেবল আকাশে চোখ তুললে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত তারাদের ঝিকিমিকি দ্যাখা যায়, দ্যাখা যায় ছায়াপথের দীর্ঘ ঘোলাটে ঘন রেখা। দ্যাখা যায় না কেবল চাঁদ। চাঁদ আজ একটু দেহিতে উঠবে, কাল এই সময় ছিলো একেবারে পূর্ব দিগন্তের গায়ে, তখনই দ্যাখা গিয়েছিলো তার পিঠের খানিকটা ক্ষয়ে গেছে। না, মেঘও নেই কোথাও।

বাসেত বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে থামে। কোনো সাড়াশব্দ নেই, এমন কি কলাপাতার আন্দোলন পর্যন্ত নিশ্চল, মনে হয় সন্ধ্যার পর পরই বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেছে অথবা ক্লান্তিতে নেতিয়ে সাড়াশব্দ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক তখনই বাসেতের চোখে পড়ে টিবিতে উঠে যাওয়ার রাস্তার বাম পাশে দুটো গরু ভয়ে, একটা দাঁড়িয়ে, তারাও ডাকে না, এমন কি মশার কামড়ে শব্দ করে লেজ গিয়ে চটপট করে যে নিজের গায়ে বাড়ি মারবে তা পর্যন্ত নেই। পেছনে ফিরে তাকায় বাসেত। সেই একই বিস্তৃত অন্ধকার। হঠাৎ চোখে পড়ে ও কানে আসে যে-নদীটা তারা কিছুক্ষণ আগেই খেয়ায় পার হয়ে এলো সেখানে কাছাকাছিই আর একটি নৌকায় টিমটিমে বাতি ও কে যেন ডাকছে 'এএএএএ গহেরদিইই হইইই।' বাসেতের মনে হয় ডাকটা নদীর ওপর গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘাট পার হয়ে বহু বহুদূর চলে গেল। এমন ডাক বাসেত কোনোদিন শোনে নি। সে সাথের লোকটিকে জিজ্ঞেস করে,

'কে ডাকে?

'ওই দেবরাজ আলি উইগার গহেরদিক ডাকে।'

'এখান থেকে ডাকলে ওই গ্রামে শোনা যাবে?'

হাসে লোকটি,

'কাঁকা জানা তো, উই গাঁও ক্যা আরো দুইতিন গাঁর লোক শুনবের পারে।'

বাসেতের ঠিক তখনই মনে হয় দেবরাজ আলির মতো গলা ছেড়ে আহম্মদ আলিকে ডাকে 'আহম্মদ আলি, আমি এসেছি।' আহম্মদ আলি মরে গেছে এটা সত্য জেনেও

তার ডাকার ইচ্ছেটা শেষ হয়ে যায় না, ভাবে, এইভাবে ডাকলেই হয়তো আহম্মদ ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে 'ভাই আইছেন, ভাই আইছেন' বলে জড়িয়ে ধরবে। লোকটাকে অনুসরণ করে সে ঢালু বেয়ে উঠতে থাকে।

ঢালুতে মানুষের গলা শুনে ঘরের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ বলে ওঠে, 'কিডা, কিডা কথা কয় ওখানে?'

'চাচা আমি দেলবর।'

'তুমার সাথে কিডা?'

'চিনি নে। ঢাকাততেন আয়ছে। মনে হয় আহম্মদের শ্বশুরবাড়ির লোক।'

বাসেতের মনে হলো যে লোকটি এতক্ষণ পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে দেলবর তার কথা বৃদ্ধ পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। ঢাকা থেকে এসেছে, আহম্মদের শ্বশুর বাড়ির লোক শুনে বাড়িতে যে আলোড়ন হবে তার কিছুই না হয়ে গোটা বাড়ি আবার থেমে গেল দেখে বাসেত দেলবরকে বলে, 'বলেন, আহম্মদের সম্বন্ধী। বাসেত।'

'চাচা উনি আহম্মদের সুমুন্দি।'

সহসা বাড়ির সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে বিলাপ শত ধারায় প্রবাহিত হয়, বাসেত সম্মিলিত বিলাপে স্পষ্ট বুঝতে পারে 'কিডা আমার আহম্মদের সুমুন্দি?' বলে আহম্মদের বাপ হাট করে দরজা খুলে ফেললো,

'কিডা আমুর মামা আয়ছে?'

বলে আহম্মদের মা ধাপধুপ করে চৌকি চাপড়াচ্ছে, 'ও আমার ভাইরে, তুমি কাকে দেখপের আইছেও?' শুনে শুনেই দেখলো তার বোন আফিয়া পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আর এগুতে পারে না বাসেত, দাঁড়িয়েই দেখতে পায় এ-ঘর ও-ঘর থেকে কুপি হাতে লঠন হাতে পিলপিল করে মানুষ বেরিয়ে আসছে, দেখলো আফিয়ার গায়ে কাপড় নেই, আরো চোখে পড়ে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে ও বুড়ো মানুষের সামনে সে দাঁড়িয়ে। আহম্মদের বাপ কম্পিত হাতে বাসেতের মুখের কাছে কুপিটা তুলে ধরে আবার বিড় বিড় করে বলে, বাবারে, আহম্মদ আমার বুকটা ভাঙে দিয়ে গেছে, আমি কেমন করে বাঁচপো বাবা?'

এই অবস্থায় কি করবে ভেবে পায় না বাসেত। মরে যাওয়ার পর কান্নাকাটিতে বাঁচাবাঁচির কথা এলেই তার নিজের বাপের এমনি বিলাপের কথা মনে হয়। বাসেতের ছোট ভাই পুকুরে ডুবে মারা যাওয়ার দুদিন পর বাড়ি গিয়ে বাপের সামনে দাঁড়াতে বাপ ঠিক এইরকম কথা বলে বুক চাপড়ে কেঁদেছিলো। ছোট ভাই মরে যাওয়ার পরও তার বাপ প্রায় পাঁচ বছর বাঁচে। বেশ কিছুদিন পর কোনো প্রসঙ্গ না এলে তারা তো নয়ই, তার বাপমাও মরা ছেলের কথা বলে না। কিন্তু এখনকার শোকটা অস্বীকার করে কি করে বাসেত? আহম্মদ আলির সাথে বোন বিয়ে দেবার পর এই প্রথম সে এই বাড়িতে আসছে, তাও মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে ছুটে সামনে এসে দাঁড়াবে, যে-ঘর থেকে আফিয়া নেমে এলো সেই ঘরটাই হয়তো আহম্মদ

আলির, কোনোদিন ওই ঘরে তার অবস্থান না দেখলেও বাসেতের বুঝতে ভুল হয় না আহম্মদ আলি নিশ্চয়ই ঘরের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, ওই বারান্দায় মাদুর অথবা সিঁড়ি পেতে কিছা খালি মাটিতে বসেছে; সেটা যদি শীতকাল হয় তাহলে বারান্দায় নিশ্চয়ই রোদ পড়ে, রোদে পিঠ ঠেকিয়ে বেতের ডালায় আখের গুড় দিয়ে মোটা মোটা মুড়ি খেয়েছে, সে মুড়িতে একটু না একটু বালু থাকবেই, গুড়েও আখের ছোবড়ার কুটোটা থাকতে পারে; আর যদি হয় গরমকাল, আফিয়া একবারও হাত পাখা দিয়ে বাতাস করে নি তা হতেই পারে না, মাটির সানকিতে যে কত সকাল পিয়াজ মরিচ দিয়ে আউশ চালের পান্ডা খেয়েছে তা বাসেত এই প্রথম এসে চোখ বুঁজে গরগর করে বলে দিতে পারে।

মারা যাওয়ার পর আহম্মদ আলির লাশটা কোথায় রাখতে পারে। বারান্দায়, না হয় উঠোনের এক কোনায়; হ্যাঁ, উঠোনের ওই কোনায়ই সম্ভব, ওখানে ওটা ডালিম না মেহেদি গাছ এই অঙ্ককারে বোঝা যায় না, সাধারণত উঠোনের কোনায় গাছ থাকলে সেখানেই গোছল করায়, তার বাপকেও তাই করিয়েছিলো, তবে সেটা ছিলো একটা বেড়ে-ওঠা ঝাঁকড়া আমগাছ, কসমের আম, বাসেতের বাপের নিজ হাতে সেটা লাগানো, তার অনেক রাতে গাছের নিচে তাকিয়ে মনে হয়েছে বাপকে দেখবে, দেখবে বসে আছে না হয় হেঁটে বেড়াচ্ছে। একটা মানুষ চলে গেলে তার সমস্ত স্মৃতি বেশ কিছুদিন আনাচে কানাচে বড় বেশি জীবন্ত হয়ে বেড়ায়; উঠোনের কোণায়, কাঠের বাগে, দরজার নকশায়, খাটের পায়ায়, জানালার শিকে, কোরান শরীফের রেহেলে, আলনার কাঁটার, চেয়ারের হাতলে, ইঁটের ক্ষয়ে যাওয়া অংশে, পায়খানার বদনায়, জায়নামাজের সেজদার জায়গায়, বালিশের ওয়াড়ে, বারান্দায় কাপড় শুকানোর দড়িতে মানুষটা অংশ-অংশ হয়ে বিরাজ করে, বাসেত দেখতে পায় আহম্মদ আলির ঘরের বারান্দায় টানা দড়িতে একটা কিছু ঝুলছে, বাতির অস্পষ্ট আলোর ঝুলন্ত কাপড়ের খোপ খোপ চোখে পড়ে, সে স্পষ্ট বুঝতে পারে ওটা আহম্মদ আলির লুঙ্গি, এমন একটি লুঙ্গি মাস দুই আড়াই আগে তার বাসায় আহম্মদ আলিকে পরতে দেখেছিলো।

আফিয়াও স্বতন্ত্রের মতো একই কথা বলে, ‘ও ভাই, আমি থাকপো কেমন করে?’

দুই হাতে আহম্মদ আলির বাপ ও আফিয়াকে ধরে বাসেতের অনেক সাস্থনার কথা মনে হয় কিন্তু বলতে গিয়ে দেখলো সবাই তার দিকে তাকিয়ে ফোঁপাচ্ছে। দুইজনকে ধরে সে সামনের দিকে যেতে যেতে বললো,

‘আকুরে, আমার না খুব জ্বর এসেছে। একটু শোয়ার জায়গা করে দিবি?’

একই সাথে আফিয়া ও আহম্মদ আলির বাপ বুঝতে পারে বাসেতের খুব জ্বর, আফিয়া সঙ্গে সঙ্গে গায়ে হাত ও আহম্মদ আলির বাপ কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারে জ্বর গা-টা ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে। ঢুকরে ওঠে আফিয়া, ‘ভাই, তুমি এতো জ্বর গায় নিরে কেমন করে আসলে?’

জ্বরের খবরটা বেশ ফলাও করে জানাজানি হয়ে যাবার পর বাসেতের বড় বেশি ক্লান্তি লাগে, শরীরে অবসাদ আসে। যে ঝাঁকের মাথায় সে দীর্ঘপথ পার হয়ে এলো তাতে এরকম জ্বর গায়ে আসার কথা নয় কিন্তু বাসেত এখন তার কিছুই ভাবে না, কেবলই মনে হচ্ছে একটু শুতে চাই। তার ক্ষিদে আছে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না, জ্বরের প্রকোপে শীতে ঠক ঠক করে গা কাঁপছে তবু তার পানির পিপাসা লাগে, ক্লান্তি লাগে, ক্লান্ত গলায় কেবল একবারই বলে, 'এক গ্লাস পানি খাবো।'

আর কিছু মনে নেই বাসেতের।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বাসেত বুঝতে পারে না সে কোথায় শুয়ে আছে। গায়ে মোটা লেপ ও কাঁথার ভারে শরীর নড়াতে বেশ কষ্ট হয়, তাও দুই হাতে ঠেলে উঠে বসে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলো দরজায় পেরেকের সাথে একটা লণ্ঠন ঝুলছে, কালিতে চিমনির অর্ধেকটা অঙ্ককার, নিচ দিয়ে যে আলোটুকু বেরোচ্ছে তাতেই বোঝা যায় ঘরের এক কোণায় একটা ধানের গোলা, আরেক কোণায় বিশাল এক মাটির পাতিল, দুই কোণাতেই বেশ কয়েকটি শিকা ঝুলছে, সবগুলো শিকাতেই মাটির বয়েম, অল্প আলোতে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও বোঝা যায় বেশ কয়েকটি শিকায় বেশ কারুকাজ, বেশ যত্ন নিয়ে বানানো। কাছাকাছি দড়িতে ঝুলছে একটা মাটির ইলিশ ও দোয়েল, টিনের দেয়ালে ইয়ারব লেখা সেলাই, সেলাইয়ের নিচে নামটা কি বুঝতে পারে না বাসেত। একটু ডাইনে চোখে ঘোরাতেই ফ্রেমে একটা ফটোগ্রাফ দেখে চমকে উঠেই মনে পড়ে সে আহম্মদ আলির মৃত্যু সংবাদ শুনে ঢাকা থেকে দীর্ঘ পথ বাস নৌকা ও হেঁটে পাড়ি দিয়ে এসে এখন আহম্মদ আলিদের বাড়িতে শুয়ে আছে, আর ওই ছবিটা যখন আহম্মদ আলির তখন আর কোনো সন্দেহই নেই এই ঘর ছিলো তার ঘর, এই ঘরেই সে তার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে গেছে আর এই বিছানাতেই যে সে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ে নি তারই বা প্রমাণ কি। একটা ভয় শিরশির করে তার শরীর বেয়ে উঠতে থাকে, মানুষটা নেই জেনেও এই ঘর এই বিছানায় তার সমস্ত অস্তিত্ব আছি আছি বলে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করে শুকনো গলায় বাসেত ডাকে,

'আফুরে, আফু।'

নিজের গলার শব্দই যে সাহস ফিরিয়ে আনে বাসেত বুঝতে পারে। গলাটা আরো একটু পরিষ্কার করে আবার ডাকে,

'আফু, তুই কোথায়?'

বাসেতের চোকির নিচে থেকেই ধড়মড় করে উঠে বসে আফিয়া। 'ভাই ডাকো ক্যা? এখন কেমন লাগতেছে?'

'বেশ ভালো।'

'দেখি, গাও দেখি।'

আফিয়া দ্রুত বিছানায় উঠে এসে শার্টের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে গা দেখে বোঝে জ্বরের সেই প্রকোপটা আর নেই। বলে, 'জ্বর ছুটে গেছে।'

‘আমারও তাই মনে হচ্ছে!’

‘আমি যে কি ভয় পাইছিলেম।’

‘কেন?’

‘তুমার গায় ওরকম জ্বর। কণ্ড, ভয় লাগে না?’

কোনো জবাব না দিয়ে ঝিমাতে থাকে বাসেত। মুখের দিকে চেয়ে থাকে আফিয়া, ভাইয়ের মুখ থেকে যে-কোনো একটা কথা শোনার জন্য সে উনুখ হয়ে থাকে। আহম্মদ আলি মারা যাওয়ার পর থেকে সে সাধুনার কথাই শুনেছে না হয় শখানেক, আফসোসের কথা শুনেছে আরো বেশি, আর বিলাপের মধ্যে কতো হাজার কথামালা সে রচিত হয়ে গেছে তা মনে পড়ে না আফিয়ার। সে এখন ভাইয়ের কথা শুনে চায়।

আফিয়ার ঘরে কথা শুনে আহম্মদ আলির বাপ পাশের ঘর থেকে ‘আল্লা আল্লা’ ডাক ছেড়ে বলে,

‘বৌ, ছাওয়াল কি ওঠেছে?’

‘হেঁ বাবজান।’

‘জ্বর আছে?’

‘না।’

‘ছাওয়াল কিছু খাবি না?’

আফিয়ার এতক্ষণে মনে হয় বাসেত কিছু খায় নি।

‘ভাই, কিছু খাবে?’

‘না, ইচ্ছে করছে না। তুই ঘুমা।’

‘আর আমার ঘোম! আল্লা আমার ঘোম তুলে দেছে।’

‘আমি ডাকার আগে তুই ভোস ভোস করে ঘুম পাড়ছিলি’ কথাটা বলতে গিয়ে খেমে যায় বাসেত। শোক উত্থল হয়ে ওঠে, শোক খেমে থাকে, শোক থমকে দাঁড়ায়, শোক ধীর লয়ে চলে, শোক নিস্তেজ হয়ে পড়ে; আফিয়া আর কতোদিন বলবে আল্লা আমার ঘুম তুলে নিবেছে, আফিয়া আর কতোকাল আহম্মদ আলিহীন জীবন কাটাবে। বুকটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে বাসেতের।

আহম্মদ আলির বাপ বড়ম পায়ে উঠে আসে।

আসার পর এলোমেলো বিলাপের তোড়ে বাসেত না আহম্মদ আলির বাপকে, না আফিয়া; কাউকে ভালোভাবে দেখার সময় ও সুযোগ কোনোটাই পায় নি। খোলা আকাশের নিচে কয়েকটা কুনিবাতি ও একটা মাত্র লঠনের আলোয় অনেকগুলো মুখের ভিড়ে মনে পড়ে আহম্মদ আলির ছোট ভাই দুটোকে দেখেছে, তারা বিষণ্ণ হয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো। ভাই দুটিকে বাসেত চেনে, বছর দেড় দুয়েক আগে তারা ঢাকার তার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলো। বাসেতের মনে পড়ে না আফিয়ার মেয়েটা দেখেছে কিনা, সে হয়তো কারো কোলে ছিলো, মনে আসে না ওই ভিড়ে কারো কোলে আফিয়ার আড়াই বছরের মেয়ে আনু ছিলো কিংবা তার আশপাশ দিয়েই

ঘুরঘুর করেছে সে খেয়াল করে নি। আসলে একটা মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার জীবনে অনন্ত নিস্তর্রতা নেমে এলেও গোটা বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে যে প্রবল আলোড়নের জন্য দিয়ে যায় তাতে কে কোথায় থাকে, খায়, ঘুমায় কে খোঁজ রাখে। বাসেতের আসতে আসতে আহম্মদ আলিকে ঘিরে আফিয়া, আমু, ওরা দুজনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ের নাম আফিয়া রেখেছে মনে এসেছে, বাপ হারিয়ে অতোটুকু মেয়েটা কি করেছে, সদ্য বিধবা আফিয়া মেয়েটাকে কেমন করে আগলাচ্ছে, ঘুম ভেঙেও মনে হয় নি আহম্মদ আলি ও আফিয়াদের একটা মেয়ে আছে; মেয়েটা তারই বোনের মেয়ে, মেয়েটা তার স্মৃতি থেকে এতোক্ষণ কিভাবে হারিয়ে ছিলো?

খড়মের শব্দ এই দিকেই আসছে শুনে আফিয়া উঠে দরজা খুলে এক পাশে দাঁড়ায়। আহম্মদ আলির বাপ ঘরে ঢুকে চারপাশে চোখ বুলিয়ে বাসেতের গায়ের কাছে বসে মাথায় হাত দিয়ে বলে,

‘আল্লার কাছে হাজার শোকর। মাথায় যে গাছ দিছি। জুর টানে বার করে নিয়ে গেছে। তুমার গায় ওই রকম জুর দেখেই বুঝিছিলেম এ সর্দিগর্মির জুর। এই চরের মন্দি দিয়ে হাঁটে আইছেও, সারাদিন রোদডা মাথার পর দিয়ে গেছে।’

গাছের কথা শুনে বাসেত মাথায় হাত দিয়ে দেখলো এতোক্ষণ সে খেয়ালই করেনি মাথা ভেজা, মাথার মাঝখানটা আঠা-আঠা। বাসেত অবাক হয়ে আহম্মদ আলির বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারে না কি বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বুড়ো মানুষটা বলে গেল সারাদিন তার মাথার উপর দিয়ে সূর্যের চল গেছে, যমুনার বালুর চরে নিচে তাতানো গরম আর ওপরে সূর্যের তাপে আমি সিঁদ্ধ হয়ে গেছি দেখা মাত্র বলে দিলো, গায়ে জুর বোঝা মাত্র এই রাতে কোষেকে গাছ জোঁগাড় করে মাথায় বসিয়ে দিয়ে জুর তাড়িয়ে দিলো, সে কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধের মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারে না।

আহম্মদ আলির বাপ বাসেতের গায়ের আরো কাছে সরে এসে মুখ নামিয়ে গলাটা একেবারে খাটো করে বলে,

‘বাবা, একটা কথা কওয়ার জন্যি উঠে আসলেম।’

‘কি কথা তাই সাহেব?’

‘দিনির বেলা কওয়ার সুযোগ পাই না পাই তাই এখনই কই।’

‘এখনই কই’ বলে বৃদ্ধ কিম মেরে বসে থাকে। বাসেত বুঝতে পারে না ‘কি কথা তাই সাহেব’ আবার জিজ্ঞেস করবে কি করবে না, সে আফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো আফিয়াও ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে স্বত্বরের দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আমি কই, তুমি আফিয়ার মামা, তুমি আফিয়ার জন্যি দুডে চারডে কথা কয়ো।’

বাসেত ‘কি কথা’ জিজ্ঞেস করার আগেই আফিয়া ডুকরে কেঁদে ওঠে।

‘বাবজান, আমার আফিয়ার কপালে যাই আছে থাক, এখন ওসব কথা থাক।’

‘তুমার ভালোর জন্যিই কই মা।’

‘তাঐ সাহেব, আমি পরে শুনবো, দিনের বেলায় শুনবো, আপনি বুড়ো মানুষ, যান, শুয়ে থাকুন।’

‘আর আমার শুয়ে থাকা, আমার ডাগর ছাওয়াল কোনে শুয়ে আর আমি ঘরে শুয়ে ঘোম পাড়ি। হায় আল্লা এই কি তুমার বিচার?’

আফিয়ার ডুকরে কেঁদে ওঠার শব্দেই আফিয়া ঘুম থেকে উঠে আফিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বাসেত দেখলো আফিয়ার চোখে মুখে দানা দানা ভয় ও বিস্ময়, সে হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে-কোসে নিয়ে যেতেই আরো ভয়ে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে। আর তক্ষুনি আর একটা ঘর থেকে কে যেন বলে ওঠে,

‘এই মধ্য রাত্তি আবার কাঁদাকাটি শুরু হয়েছে? তুমরা থামবে?’

সেই কণ্ঠস্বরে যে ঝাঁজ আছে সেটা অতোটুকু মেয়েও বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যায়। বাসেত জিজ্ঞেস করে,

‘কে?’

‘আমার ছোট ছাওয়াল, আণ্ডাব।’

‘রাগ করে কেন?’

‘কাল শুনো। আল্লা, তুমার দুনিয়ায় কি বিচার নাই?’

একটা ধাঁধায় পড়ে যায় বাসেত। চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের উন্মত্ত হাওয়ায় ঘরের বাঁশের কড়িগুলো মড়মড় করে ওঠে, বাসেত সভয়ে চালের দিকে তাকায়, বাইরে ফালা ফালা ছেঁড়া কলাগাছের পাতার ফড় ফড় শব্দ হয়, বাসেত ভাবে ঝড় এলো, ধারে কাছে কোথাও প্যাঁচা ডাকছে, ঘরের পেছনেই পাতায় মড় মড় শব্দ তুলে শেয়াল গেল কি? আন্তে আন্তে উঠে বসে বাসেত, দাঁড়িয়ে একটা কাঁথা গায় চাপিয়ে দরজায় দিকে পা বাড়াতেই আফিয়া ভীত গলায় বলে,

‘কোনে যাও?’

‘আসি।’

পেশাব পেয়েছে বাসেতের, তার চেয়ে বোন ও বোনের স্বত্তরের অসহায় অবস্থার সামনে থেকে সরে একটু হালকা হাওয়ার আশায় সে বাইরে যেতে চায়। দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো আফিয়া তেমনি মাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে, আফিয়া তার দিকে তাকিয়ে, আহম্মদ আলির বাপ শূন্য দৃষ্টি দিয়ে ঘরের আলো আঁধারে বাতাসে কি যেন হাতড়ে চলেছে।

টিবির ঢালুতে বসে পেশাব সরে একটু উপরে উঠে একটা শুকনো জায়গায় বসে পড়ে বাসেত।

চাঁদ একতাকপে মধ্য আকাশে। পিঠের আরো খানিকটা খাওয়া। সন্ধ্যার পরে এই টিবিতে ওঠার আগে আকাশে দেখেছে কোনো মেঘ নেই, এখন এখানে-সেখানে ছোপ ছোপ মেঘ চাঁদের কাছাকাছি, নেষটার ঘোলাটে হলদেটে রেখায় বাসেতের মনে হয় চাঁদের আরো কাছে গেলে এটা ঠিক গলে পড়বে। আকাশের আলো আঁধারী দেখতে

দেখতে সামনে যতদূর চোখ যায় চোখে পড়ে কি পড়ে না বড় বড় ঘাসেরা বাতাসে
 দুলছে, অদূরের গ্রামটাই একেবারে নেই, এমন কি কিছুদূরে মাঠের মাধো বিশাল
 বটগাছটা একটা স্থবির কালো পিও ছাড়া আর কিছুই নয়, বেশ ভয় ভয় করে
 বাসেতের। বাসেত জানে কাছেই ঘরে আফিয়া দাঁড়িয়ে বা বসে আছে, আহম্মদ আলির
 বাপ তখনো ঘরেই, আফতার জেগে, তাও বিশাল প্রান্তরের শূন্যতায় তখন তার কেবল
 মৃত্যুর সাথে সাথে কবরের একাকীত্বের কথা মনে আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে
 আহম্মদ আলি একা কোথায় কিভাবে শুয়ে আছে। কতোদূর এখান থেকে, কতোদূর
 আহম্মদ আলির কবরটা, নদী, সবটাই তো নদীর অংশ, যমুনার চরের এই অংশে সে
 কোনোদিন না এলেও আরিচা নগরবাড়ি যাতায়াত করতে বুঝেছে এই গ্রামটাও আসলে
 যমুনা নদী; এখন শুকনো বুক পিঠ জাগিয়ে রাখলেও ভরা বর্ষায় টিবিগুলোর বাড়িগুলোই
 কেবল কৃষকের মাথালের মতো জেগে থাকে, তাহলে আহম্মদ আলি এখন শুকনোয়
 থাকলেও বর্ষা এলেই পানিতে তলিয়ে যাবে? তলিয়ে কোথায় যায়; পাতালে যায়;
 পাতালে কোথায় যায়; মাটির একেবারে ভিত্তিমূলে চলে যায়; ভিত্তিমূলে চলে গেলে কি
 হয়; মাটির সীমাহীন স্তর বিন্যাসের সাক্ষী হয়; সাক্ষী হলে নদীর প্রোতোধারার সঙ্গে
 মিলেমিশে একাকার হয়ে সাগরে গিয়ে পড়বে।

এসব কি ভাবে বাসেত, ভয়টা আরো চেপে আসে, তাড়াতাড়ি উঠে আসার সময়
 কানে আসে যে গ্রামটা এখন নেই হয়ে আছে সেখানে যাত্রা-টাত্রার গান হচ্ছে,
 এতোদূর থেকেও গানের সুর ভেসে আসে, পৃথিবীতে তাহলে সব নিশ্চয়তাই মৃত্যু
 নয়; সে বেশ জোরেই ডাক দেয়,

‘আফু।’

‘এই তো ভাই, এখানে দাঁড়া রইছি।’

ঘরের অল্প আলোয় বাসেত দেখে দরজায় আফিয়ার ছায়া ভেসে উঠলো। ওখান
 থেকেই বাসেত জিজ্ঞেস করে,

‘আহম্মদ আলির কবর হয়েছে কোথায়?’

অন্ধকারে আঙুল তুলে দেখায় আফিয়া,

‘ওই তো সামনেই। বড় বড় ঘাস দোলতেছে দেখতিছ্যাও?’

ঘাস দোলা বাসেত আগেই দেখেছে, কিন্তু কাছেই আহম্মদ আলি শুয়ে আছে
 জেনে সে ভাল করে সেদিক তাকাতে পারে না। মনে হয় ওদিকে তাকালেই সে
 আহম্মদ আলিকে হাঁটা চলাফেরা করছে দেখতে পাবে। দ্রুত পা চালিয়ে ঘরে এসেই
 আফিয়াকে বললো,

‘আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়া।’

আফিয়া পানি না দিয়ে বাসেতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

‘কৈ, পানি দিলি না?’

‘ভাই, তুমি কি ভয় পাইছাও?’

‘না।’

‘তাহলি তুমি অমনি করতিছ্যাও কি কামে?’

‘তাঐ সাহেব কাল সকালে আমাকে কি বলবে?’

ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ে আফিয়া। স্থির চোখে আফিয়ার মুখের নিচে তাকিয়ে থেকে বাসেত দেখতে পায় একটা ঝিম ধরা ভয়, একটা ঔদাসীনা ছেনে ফেলেছে তাকে, বাসেতের বোঝা হয় আফিয়া হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে : তাড়াতাড়ি আফিয়াকে ধরে আবার জিজ্ঞেস করে,

‘কি হলো তোব? তাঐ সায়েব কাল সকালে আমাকে কি বলবে?’

আশেপাশে তাকিয়ে আফিয়া নিচু গলায় জবাব দেয়,

‘কি আর কওয়ার আছে। গাঁর ব্যাপার, বোঝাই তো। বাপ মরে গেছে, দুইদিনই আমার আফিয়া ভার হয়ে গেছে। দাদার আগে মরলি নাতি নাতনি সয় সম্পত্তি পায় না সে কথাও শুনলেম, ভাইরে, তুমি এদিক জুরে বেইঁস, ওদিক আগ্রাব আর আমজাদ কওয়া বুলা করতেছে আমি নাকি তুমাক একটা কিছু ফয়সালা করার জন্যে খবর দিয়ে লিয়ে আইছি। আমি কিছুই ভাবিনে ভাই, ভাবি যে মানুষটা গার খায়ে বুকি ব্যথা পায়ে যক্ষা হয়ে মরে গ্যালো, আমি কই, কার জন্যে মার খালো, তোরে বাঁচানোর জন্যেই তো রাজাকাররা রাইফেলের বাঁট দিয়ে বুকির পর দমাদম পিটালে, যে মানুষটা বুক দিয়ে আগলে রাখলে সেই মানুষটাই হলে তোরে চোখের শূল, লোকে তো জানে তুরা মুক্তিবাহিনীত আছিস, কিন্তু আমি তো জানি কোনে তুরা কি করিস, দ্যাশ স্বাধীন হওয়ার পর তুরা কি মানুষ ছিলিরে, ভাইয়ের দোষ কোনে? না, সে বারণ করতো, গাল পারতো, বুঝি তো সে থাকলি তোরে অকাম কুকামে অনেক অসুবিধে, সে গেছে আপদ গেছে, ভাইই তো ভাইয়ের বুকি ছুরি মারে, তোরে মনমতো চলে নি তাই অতো রাগ সে কি আমি বুঝতেম না? সবই বুঝতেম। আজ নদীর মদি শুয়ে রয়েছে মানুষটা, জানো ভাই, এক এক সুমায় আমার মনে কয় কবরের কাছে যারে ডাক দিয়ে কই তুমি কারে জন্যে মার খাইছিলে? উরা কারা?’

পানি খাওয়ার কথা ভুলে যায় বাসেত। আহম্মদ কোনো ঘরে নয়, গাছ তলা নয়, বাঁধানো কবর নয়, নদী বুকে নিয়ে শুয়ে আছে শুনেই সে যেন দেখতে পায় ঘোলাটে চাঁদের আলোর যতোই ঘোলাটে পানির স্রোতোধারা আর বিশাল বিশাল ঢেউ আহম্মদকে জাগিয়ে দেবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, আহম্মদের ঘুমটা বড় বেশি গাঢ় বলে ওর এখনও ওঠার সময় হয় নি।

আবার বিছানা ছেড়ে বাইরে টিবির ঢালুর কাছে দাঁড়াতেই বাসেতের ‘এ-এ-এ-এ গহেরদি-ই-ই-ই হই’ ডাকটা কানে বেজে যায়, কোন দেরাজ আলি কোন প্রান্ত থেকে ডাকছে, শুকুনি তার মনে হয় সেও যদি ডাকে ‘আহম্মঅঅঅঅদ’, তাহলে কি আহশান তার গৃহকোণ থেকে একটাবার জবাব নেবে না, ‘ভাই, এই তো আমি আছি!’

চেহারা

কথা ছিল আমরা আগামী পাঁচই চৈত্র রোজ শুক্রবার বিকাল পাঁচ ঘটিকার সময় আপনার দণ্ডতথানায় পৌঁছাইব, আপনার তফলিফ হইলেও আশা করি আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমার সঙ্গে সর্বমোট দশজন লোক যাইবে। কিন্তু পাঁচটা বাজার অনেক আগেই মাঠের ওপারে দেখা গেল ক্ষেতের আল ধরে জনাবিশেক লোক লাইন দিয়ে আসছে। অতগুলো লোকের মধ্যে তিনজনের মাথায় ছাতা, দূর থেকেই দেখা যায় একটা ছাতায় তালি, একটা জলে রোদে ভিজ়ে-পুড়ে একেবারে সাদাটে হয়ে গেছে, একটা চকচকে। লোকগুলোর পরনে প্যান্ট আছে, হাফপ্যান্ট আছে, পাজামা আছে যারা একটু ধীরে ধীরে হাঁটছে তাদের লুঙ্গি আছে। এক লুঙ্গি পরা লোকের মাথায় একটা মাটির হাঁড়ি দেখা গেল, সে একটু পিছিয়ে পড়েছে। তাকে দলে সামিল করার জন্যে সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়, সে এলে আবার একসঙ্গে এই বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

এই বাড়ির বড় ছেলে মজনু তখন বাইরের ঘরের বারান্দায় বসে আনমনে সিগারেট টানতে টানতে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার তখনকার মতো কোনো কাজ নেই, যা ছিল দুপুরের মধ্যেই সেরে ফেলেছে। তার কাজ ছিল সকালে শহরের বাজারে গিয়ে বড় দুটো কুই মাছ কেনা, মিষ্টি আনা, পান সুপারি আনা, দামি সিগারেট আনা। মজনু কুই পায় নি, দুটো বড় কাতল এনেছে, কাতল দেখে তার বাপ আবদুল মালেক একবারই রেগে উঠে বলেছে, এ মাছের মাথাই তো সব। মজনু না রেগে কেবল জবাব দিয়েছে, সারা বাজার চষে কুইমাছ পেলাম না। অন্তত আজ মজনু বাজার নিয়ে মিথ্যে বলবে না মেনে নিয়ে আবদুল মালেক কেবল বলেছে, নতুন কুটুমের পাতে কুইমাছ দিতে পারলাম না।

মজনু আর সব ঠিক ঠিক এনেছে। তবে এর মধ্যে কিছু পরসে বাঁচিয়ে অতিরিক্ত দশটা দামি সিগারেট নিজের জন্যে কিনে তারই একটা এখন খাচ্ছিল। তার সত্যি এখন কোনো কাজ নেই। দুপুরে খেয়ে ওঠার আগে বাড়ির রাখাল রহমত আর কাজের মেয়ে মর্জিনার সঙ্গে হাত লাগিয়ে বাহির আঙিনার এমাথা ওমাথা ঝাড় দিয়েছে, যাতে ধূলো না ওড়ে সেজন্যে বালতি বালতি পানি ছিটিয়েছে, গরুর খড়, খইল খাওয়ার গোড়া কোদাল দিয়ে চেঁছে সাফ করেছে। বাড়ির সামনে পোড়া করই

গাছের গোড়ার চারপাশও সাফ করতে তোলে নি মজনু, সাফ শেষে গাছের ছায়ায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, খেতে খেতে গাছের মাথায় পাখির ডাক শুনে উপরে তাকিয়েছিল, দেখেছিল সেখানে কুটুম পাখি লেজ নাচালে।

আজ তো কুটুম আসবেই, তাও কুটুম পাখি দেখে খুশিই হয় মজনু। ওখান থেকেই মর্জিনাকে ডেকে বলে, যা ভেতরে যা, বলে আয় গোড়া গাছে কুটুম পাখি বসেছে। মর্জিনা ভেতরে গেলে মজনুর মনে হয় সে তো আসলে এসব বিশ্বাস করে না, কোনো অমঙ্গল চিহ্ন দেখে খেমে পড়া বা পিছিয়ে যাওয়া সে মানে না। অথচ তারই ছোটভাই রানু বেরোনোর সময় খালি কলসি দেখলে খ্যাকখ্যাক করে ওঠে, বেরোনোর সময় কাঁটা পড়ে থাকতে দেখলে একবার মর্জিনাকে ওই কাঁটা দিয়েই গরু পেটানো পিটিয়েছিল। পেছন থেকে ডাকার জন্যেও রহমতকে তাড়া করেছিল একবার। রানু সেদিন ফুল থেকে টেষ্ট-এর রেজাল্ট আনতে যাচ্ছিল। 'আমি ফেল, নির্ধাত ফেল' বলে ফুলে না গিয়ে সারা দুপুর ঘরে শুয়ে কাঁদল, বিকেলে এই গ্রামের ওরই সহপাঠী বাবলু এসে জানাল, এ রানু, তুই খার্ড হয়েছিস। তসলিম ফার্স্ট, মাকুশা সেকেন্ড। শালা মাকুশা তোর থেকে মাত্র এক বেশি পেয়েছে।

মাকুশার ভাল নাম আবদুল লতিফ। ছেলেটা এমনিই মিনমিনে, তার ওপর একদিন মাকুশার কামড় খেয়ে জ্বরে ভুগল অনেকদিন, সেই থেকে ওর আসল নাম হারিয়ে যায়। রানু এবারে মাকুশা কেন সেকেন্ড হল এই নিয়ে সারা সন্ধ্যা মন খারাপ করে রইল, কিন্তু মজনু রাতে বাড়ি কিরে রানুর রেজাল্ট শুনে প্রথমেই ধমক লাগালো, তুই রহমতকে মারার জন্য তাড়া করলি কেন?

ও পেছন থেকে ডাক দিল কেন?

নিজের ওপর বিশ্বাস নেই, পেছন থেকে ডাকার দোষ? কপালই যদি মানিস তাহলে ঘরে শুয়ে বসে থাকেনা কেন?

বড় ভাইয়ের ধমক শুনে প্রথমে ভাবাচ্যাকা খেয়ে রানু ভেবেছে তাই তার রেজাল্ট শুনে খুশি না হয়ে এমনভাবে বকলো, তারপরেই অঝোরে কেঁদেছে। মজনুও কেঁদেছে। রাতে, গভীর রাতে, সবাই ঘুমিয়ে গেলে বাইরের ঘরের বারান্দায় নিতক চরাচরের দিকে তাকিয়ে তার হ হ কান্না পার, ইচ্ছে হয় দূরে বহুদূরে কোথাও চলে যাই, যেখানে গেলে কেউ তাকে চিনবে না, কেউ তাকে বলবে না, ও মজনু তুমি দেশের জন্যে যুদ্ধ করলে, কিন্তু নিজের জন্যে কি করলে? মজনু নিজের জন্যে কিছুই করেনি, তার গ্রামের চেয়ারম্যান শান্তি কমিটির সেক্রেটারিকে ওলি করে তারা হাড়া কিছুই করে নি, তার ক্যাশবান্ডল ভর্তি ধরে ধরে টাকা ইচ্ছে করলে সব নিতে পারত, না নিয়ে বিলিয়ে দেয়া হাড়া কিছুই করে নি, স্বাধীনতার পর প্রভাব খাটিয়ে গোড়া বাড়ি সারার জন্যে বাঁধ বাঁধ টিন এনে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে বাকীগুলো কালোবাজারে বিক্রি করে দিতে পারত তাও সে করে নি। যুদ্ধের পর সে টের পায় তার ভেতরে সহসা সবকিছু ধমকে গেছে, ছোটভাই কলেজে গিয়ে সরকারি ছাত্র

অঙ্গদলে নাম লিখিয়ে দিনকে রাত করছে সেবে থমকে গেছে। গ্রামের আড়িকার
বুড়োর একমাত্র ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে বলে বুড়োর হাহাকার সেবে থমকে গেছে।
ক্ষেতের আল ধরে মজনু হাঁটে, তনতে পায়, রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে বিশাল
শূন্যতায় তনতে পায় ও মজনু, কি করলে? পোড়া গাছটার কাছে গেলে চারদিককার
নিষ্ঠুরতা যেন আরো সরব হয়ে ওঠে, ও মজনু কি করলে? তনতে তনতে দেখতে
দেখতে মজনু এখন আর শোনে না, এখন আর দেখে না, সে সময় গেলেই বাড়ির
সামনে মাঠের দিকে অকারণে তাকিয়ে থাকে।

এবারে সে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে, শূন্য আকাশে মেঘ নেই এ-প্রান্ত ও-প্রান্তে
কোন পাখি ওড়াউড়ি নেই, এমনকি বাতাসে যে গাছের একটি পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে তাও
নেই। আজ মজনুর বোন নূরজাহানের বিয়ের দেখা দেখতে আসবে বলে তার মনে যে
আনন্দ থাকার কথা সেটাও নেই সেবে আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে দূরে গ্রামের ঘন সবুজ
গাছপালার দিকে তাকায়, গাছপালা থেকে বিরান মাঠ চোখ ছুঁয়ে বাড়ির আড়িনা পর্যন্ত
আসতে আসতে দেখল আড়িনার মাথায় রানু হাত তুলে বড় ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার
চেষ্টা করছে, সেবে মজনু কেবল একটু হাসে। ওখানে বসেই হাঁক দিয়ে বলে, যা, রানু
এসেছে, আর রানু গলার সীমানার মধ্যে এসে গেলে বলে, কখন বড়না দিয়েছিল? জবাবে
রানু 'সকালে' বলে জিজ্ঞেস করে, ওরা কখন আসবে?

পাঁচটায়।

ঘরে না ঢুকেই রানু আবার জিজ্ঞেস করে, ছেলে কি করে?

ব্যবসা।

কিসের ব্যবসা?

বায়তুল মোকাররমে রেডিও-টিভির দোকান। মিডলইন্টে ছিল অনেকদিন।

রানু এসেছে তনে যা বেরিয়ে আসার আগেই নূরজাহান বেরিয়ে আসে। রানু
সুটকেসটা নূরজাহানের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, আকাশি রঙের শাড়িটা
তোয়।

মজনুর একবার ইচ্ছে হয় রানুকে জিজ্ঞেস করে এত টাকা তুই কোথায় পেলি,
কিন্তু সঠিক জবাব পাবে না জেনে নিজে নিজেই জানতে চেষ্টা করে রানু এখন দল
বদল করে সরকারি অঙ্গদ্রোণালের লিডার পোছের একটা কিছু, ওদের কাছে টাকার
সোর্স জিজ্ঞেস করতে নেই। আগের দলে থাকতে একবারই জিজ্ঞেস করেছিল,
হ্যাঁয়ে, তোরা এত টাকা পাস কোথায়?

হাসতে হাসতে জবাব দেয় রানু, পাওয়ার উপায় জানা থাকলেই আসে।

পাওয়ার উপায়টা কি জিজ্ঞেস করে মি মজনু, কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে
থাকতে থাকতে ভেবেছে এই করেকমিস আগে নিছতাক তনে ভাপোর ওপর ভাপ্য
ছেড়ে দিয়ে যে ছেলে হাপুস চোখে কেঁদেছে, আজ সে কেমন করে ভাপ্যকে হাতের
মুঠোর এনে ফেলেছে। কেবল সেই পারল না। কিছুই ভাল লাগে না মজনুর।

গ্রামের ছুলের অঙ্ক টিচার আফজাল সাহেব ছুলের মাঠে মজনুকে পেয়ে বলেছিলেন, কি করছ মজনু?

কিছু না স্যার।

কিছু না! তোমার সাথে যারা যুদ্ধ-টুক করল তারা কত কি করে ফেলল।

মাটির দিকে তাকিয়ে মজনু বলে, টুক কি স্যার?

না, ওটা একটা কথার কথা।

না, কথার কথা নয়। যুদ্ধ কি ছেলের হাতের মোয়া? আপনারাই এখন বলেন, গুগুগোলার নয় মাস। এটা গুগুগোল? আপনার সাথে আমার ঝগড়া? কথা কাটাকাটি? মনে নেই আপনার ছোট ভাইকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে মারল, আপনার শালিকে রাজাকররা মিলিটারির হাতে তুলে দিল, গুগুগোল হলে তাই হয়?

মিনমিন করে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন আফজাল টিচার। কিন্তু সহসা মজনুর চোখের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গিয়ে হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা, তোমার মনে কষ্ট দেয়ার জন্যে বলি নি। তোমরা কিছু করছ দেখলে ভাল লাগে।

নরম হয়ে গিয়েছিল মজনু, স্যার, আমার কিছু ভালো লাগে না।

বাপ আবদুল মালেক বলে, মজনু, একটা কিছু কর, মা হাজেরা বেগম বলেছে, বাবা, এভাবে আর কতদিন বসে থাকবি, একমাত্র আদরের বোন নূরজাহান হাত পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে বলেছে, মিয়া ভাই কিছু একটা করবে না?

জবাব দিয়েও মজনুর মনে হয় সে সঠিক জবাবটা দিতে পারে নি। তার বলতে ইচ্ছে হয় রানুর পথে আমি যেতে পারব না, আমারই সহযোদ্ধা আকবর, নিয়ামত, শামছু এখন যা করে বেড়াচ্ছে তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি যুদ্ধ করেছি বলে হস্তত্যাগ করে বেড়াব তা কি করে হয় তুই-ই বল নূরজাহান, মানুষ একটা সময়ে ভেতরে ভেতরে মরে যায়, সে সবকিছু দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। দেখিস, যদি কোনোদিন তোর বিয়ে হয় তাহলে পরদিনই আমি যেদিক দু'চোখ যায় চলে যাব, আমার চেয়ে আকবা-মার কাছে রানু এখন বেশি দামি, থাক, আকবা-মা ওকে নিয়েই থাক।

যদি কোনোদিন বিয়ে হয় তবে চমকে ওঠে নূরজাহান। ছুটে মজনুর চোখের আড়াল হয়ে যায়, পাছে মনজু আবার চোখ তুলে তাকে দ্যাখে, ভয়ে সে সারা দিনমান মজনুর সামনে আসে না, রাত্রে, অন্ধকারে একেবার বড় ভাইয়ের ঘরে এসে বলে, মিয়া ভাই, আমার জন্যে তোমার খুব চিন্তা, না?

প্রশ্ন শুনে মজনু হাসে। হাসতে হাসতেই বলে, যা, ঘুমোগে যা। অনেক রাত হল। সাতারের ওপর আর কত পানি।

নূরজাহান দেখেছে কোনো বেশি বিপদের কথা বোঝাতে মজনু এই প্রবাদটি ব্যবহার করে। সে জানে তাকে নিয়ে বাপ-মা-ভাইদের দুচ্ছিত্তার অন্ত নেই। কিন্তু যে

অবস্থায় পড়ে তাকে যদি কোনোদিন বিয়ে হয় আজ শুনতে হচ্ছে, সে অবস্থায় তার অসহায় বাপ কি আর করতে পারত। মেয়ে সুন্দরী হয়েছিল বলে বাপ তার ইতিহাস বই থেকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্রাজ্ঞীকে ধরে এনে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। কে জানত সেই ভারত-শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর বিয়ে নিয়ে এক সময় প্রবল দুশ্চিন্তা সবাইকে মগ্নিত করে ফেলবে?

এক সময় টের পায় নূরজাহান নেই। সে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে বসে সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে, হাক্কা চাঁদের আলোয় জায়গায় জায়গায় ছোপ ছোপ অন্ধকার দেখতে দেখতে মনে হয় এই পাঁচ-ছয় বছর আগে ওই রকম ছোপ ছোপ অন্ধকারের দিকে কত মনোযোগ দিয়ে রাইফেল তাক করে থেকেছি। কিন্তু এখন তার হাসি পায়।

এখনো সেই জায়গায় বসে রানুকে নূরজাহানের হাতে স্যুটকেস দেয়। দেখে জিজ্ঞেস করে, আর কি আনলি ওর জন্যে?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসে রানু। বলে, আপনি ভাবছেন আমি ওসব কিছু আনি নি। সব এনেছি। শহরের বড় বড় স্টেশনারি দোকান ঘুরে বেস্ট কসমেটিকসগুলো এনেছি। এ গ্রামের কেউ ওসব চোখে দেখা তো দূর, নামই শোনে নি। আর ওই যে মিডলইস্টঅলা, ও শালাও মনে হয় এসব দ্যাখে নি।

হবে হয়তো।

আপনার মনে হয় বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি এনেছি। এই গতকালই লিডারকে গিয়ে বললাম, বোনের বিয়ে, টাকা দরকার। দিয়ে দিল। মিয়া ভাই, ওর অবস্থা কি আমি বুঝিনে মনে করেন? আমাদের একটি মাত্র বোন, তার ওই অবস্থা দেখে আমার কি কিছুই করতে ইচ্ছে করে না? জানি, পার্টি করে টাকা পাই বলে আপনি আমাকে ভাল চোখে দ্যাখেন না। কিন্তু কি করব, আমারও তো ইচ্ছে করে এই বাড়িটা আবার আগের মতো ঝকঝকে করে তুলি, আবার দুঃখ কমিয়ে দেই।

এর আগে অনেকবার আবদুল মালেক মজনুকে বলেছে, বাড়িটা পুড়ে গেল আর আগের মতো মনে হয় দেখে যেতে পারব না। এবারে রানুর কথা শুনে মজনু আবার ভাল করে বাড়ির দিকে তাকায়। হ্যাঁ, উত্তর ভিটায় যে করোগেটেড টিনের চারচালা ছিল এখন সেখানে খড়ের ঘর, দাদি যে ঘরটায় থাকত তার পোড়া টিনগুলো এখনো পাল্টানো হয় নি, আবার ঘরের পশ্চিমের একটি জানালার একটি পাল্লা এখনো কেরোসিনের টিন দিয়ে আটকানো। মজনু বাড়ি পুড়ে যাওয়া দ্যাখে নি, সে তখন কুষ্টিয়ার প্রাগপুর বর্ডারে, তাদেরই গ্রামের ছেলে নাদের গিয়ে খবর দিল, মজনু ভাই, আপনাদের বাড়ি একেবারে সাফ।

সবগুলো ঘর পুড়েছে?

বলছি কি? ভিটের মাটি ছাড়া আর কিছু নেই।

মিলিটারি পুড়িয়েছে?

মিলিটারি ছিল, রাজাকারও ছিল।

কোনো মানুষ মারা গেছে?

নাদের অনেককণ চিন্তা করে বলে, না মনে হয়। মরলে শুনতাম।

মজনু একে একে লিডার, ডেপুটি লিডার, সহযোদ্ধা সবাইকে বলে, শুনো, আমাদের বাড়ি একেবারে সাফ। শালারা ভেবেছে এই করলেই আমি গিয়ে সারেকার করব।

বিকেল খবরটা শুনে সন্ধ্যায় একবার সকলকে শুনিয়ে, রাতে আরেকবার শুনিয়ে, সকালে সখন আদ্যেকদফা বলতে বলে তখন ডেপুটি লিডার জামাল ঠান্ডা খলায় জবাব দিল, মজনু, কাল বিকেল থেকে তো শুনছি। সারা দেশেই এ রকম কত হচ্ছে!

ধেমে যায় মজনু। সেদিন অপারেশনে গেলেও বারবার মনে হয়েছে আব্বা কোথায়, মা কোথায়, নূরজাহান যদি মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়ে। যেতে যেতে মনে হয়েছে, গুলি চালাতে চালাতে, বিপক্ষ দলের পাল্টা শুনতে শুনতে, ক্যাম্পে ফিরে আসতে আসতে মনে হয়েছে সারা দেশেই এ-রকম সত্যিই তো কত হচ্ছে। যুদ্ধ যে কত অসম্ভব অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দেয় তা এই দেশ বুকে যুদ্ধ ধারণ না করলে মজনু বুঝত না। মানুষ মরছে, ঘরবাড়ি পুড়ছে, মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে, শুনতে শুনতে মজনুর গা সওয়া হয়ে গেলেও যখন নিজের বাড়ির কথা শোনে তখনই মনে হয়, যে ঘরে ফিরে যাব বলে যুদ্ধ করছি সেখানে গিয়ে যদি কাউকে না পাই। যুদ্ধ শেষ হতেই আর দেরি করে না মজনু, মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে যে বিশাল ঝাঁকড়া করই গাছ সারা বাড়ি ছায়া দিয়ে আগলে রাখে সেই গাছে একটা পাতা নেই, ডালপালা নেই, পুড়ে থাক হয়ে কেবল গুঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় বাড়ি-ঘর, নাদের যা বলেছিল সব মিলে যাচ্ছে, উত্তর ভিটায় সবচাইতে বড় করগেটেড টিনের ঘরের মাথায় চাঁদতারা ছিল নেই, পশ্চিম ভিটায় এই কয়েক মাস আগে আব্বা মাঠের বেড়া দিয়ে যে ঘর তুলেছিল তা নেই, এমনকি গরুর খড়-খইল খাওয়ার গোড়াটা পর্বত মাটিতে মিশে গেছে। মাঠের আল ধরে দৌড়ে আসে মজনু, বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে শূন্যে গলা তুলে ডাকে, আব্বা, রানু, নূরজাহান।

যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে আবদুল মালেক। দীর্ঘ সাত মাস পর পিতা-পুত্র দেখা হয়, কিন্তু কেউই কথা বলে না, অনেক, অনেককণ দুজনে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা আবদুল মালেক 'হায় হায় আমার একি হল, এ আমি কি করলাম' বলে আকাশ-মাটি কাঁপিয়ে হাহাকার করে ওঠে।

আব্বা, আব্বা, মা কোথায়? রানুরা কোথায়?

তোমার ছোট মামার স্বত্ববাড়ি।

ওরা কেমন আছে?

চুপ করে থাকে আবদুল মালেক।

কথা বলছেন মা কেন?

বেঁচে আছে।

বেঁচে আছে শুনে আশ্বস্ত হয় মজনু। তার মনের মধ্যে তখন বাপ-মা-ভাই-বোন কেমন করে পালালো শোনার জন্যে তোলপাড় করে ওঠে, কিন্তু সব রেখে সে কেবল জিজ্ঞেস করে, এই গাছটা কি দোষ করেছিল?

মান্ন হাসে আবদুল মালেক।

মিলিটারিদের কারা বুঝিয়েছিল গাছে মুক্তিবাহিনী থাকে। একদিন বিশ-পঁচিশজন এসে গুলিতে গুলিতে গাছের পাতা উড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। নিরীহ গাছ সেও ওদের শত্রু হয়েছে দেখে মনে হয়েছিল ওদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। যে কয়টা ডালপালা ছিল গ্রামের লোকেরা পরে কেটে নিয়ে গেছে।

গাছও ওদের শত্রু জেনে মজনুও হাসে। প্রথমে কোনো পোড়া ভিটায় যায় না মজনু, পোড়া গাছের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একসময় জিজ্ঞেস করে, আক্কা আপনি কোথায় ছিলেন?

তুমি যদি আসো এই আশায় আজ তিনদিন ওই গাছতলায় থাকি।

চোখ ফেটে কান্না আসে মজনুর। কান্না পায় মজনুর বাশারের কথা ভেবে, মাতুর কথা ভেবে, সুরুজের কথা ভেবে, ওদের আক্কাও হয়তো ছেলে আসবে বলে নদী-মাঠ-ঘাট, ঝোড়-জঙ্গল ছাড়িয়ে চোখ ফেলে রয়েছে, কিন্তু ওরা তো আর কোনোদিন ফিরবে না, একজনকে গড়াই নদীর বুকে, একজনকে তালবাড়ি গাঁ, একজনকে রূপপুরে চিরদিনের জন্যে রেখে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি বলে, আক্কা তাড়াতাড়ি চলেন, মার কাছে যাব।

ছোট মামার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নূরজাহানকে দেখার সাথে সাথে চিৎকার করে ওঠে মজনু, আক্কা, এ কী দেখছি?

মজনু তখন যেমন আঙ্গুলের মতো হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নূরজাহানকে দেখেছিল, তেমনি এখন রানুকে দেখতে ইচ্ছে হয়। দু'জনকেই অচেনা মনে হয় মজনুর, মনে হয় একাত্তরের আগে নূরজাহান ওর বোন ছিল, একাত্তরের পরেও কলেজে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রানু ওর ভাই ছিল। লক্ষ্য করে রানু, মজনু ওকে চোখ ফেলে দেখছে।

কি দ্যাখেন মিয়া ভাই?

কিছু না।

মিয়া ভাই, আমি এখন অনেক কিছু বুঝি। আপনি মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকান যেন আমাকে চেনেন না। বুঝি অনেক আশা নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে জিতলেন ঠিকই, কিন্তু আশা পূরণ হল না। আসলে আপনি যে কি চান তা আপনি নিজেই জানেন না। আমারও কিছু মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাই যুদ্ধ করে যা পায় নি আমি যুদ্ধ না করে তা সুদে আসলে পুষিয়ে নেব। আমার তখন যাবার মতো বয়স থাকলে ঠিকই যেতাম, কিন্তু আমি এ-রকম তো হওয়ার কথা ছিল না বলে ঘরে বসে নিজের হাত কামড়াতাম না।

রানু, তুই এসব কি বলছিস?

ঠিকই বলছি। আমার এখনো সন্দেহ আছে নূরী বুর বিয়ে হবে কিনা। কসমেটিক্সগুলো কিনতে কিনতে ভাবছিলাম, যাবে তো, এতে ওর মুখের দাগগুলো যাবে তো? না গেলে আরো কত নামি কসমেটিক্স দরকার, আমি জোগাড় করব।

মাথা নাড়ে মজনু। মাথা নীচু করে নাড়ে বলে রানু প্রথমে বুঝতে পারে না মজনু হাসছে কিনা। সাথে সাথে তার এটাও মনে হয় এটা এমন কিছু হাসির ব্যাপার নয়, তাদের একমাত্র বোনের বিয়ের ব্যাপার, সেই বিয়ে, যে বিয়ের সঙ্গে তাদের সকলের আনন্দ মিলেমিশে আছে। কাঁধে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয় রানু, মিয়াভাই, আপনি অমন করছেন কেন?

মাথা তুলে শান্ত গলায় জবাব দেয় মজনু, তা হয় না, তা হয় না রে।

কি হয় না?

ওর যে ওর দাগ তোলার কথা কি বলছিলি যেন!

কেন হয় না?

জানি না!

আপনি তো কিছুই জানেন না। আপনি কি জানেন টাকা দিলে বাঘের দুধ মেনো? আমি দরকার পড়লে লিডারকে ধরে নূরীবুকে বিদেশ থেকে প্রাস্টিক সার্জারি করিয়ে আনবো।

হো হো করে হেসে কেলে মজনু। হাসতে হাসতেই বলে, প্রাস্টিক সার্জারি যে হয় আমি জানি। কিন্তু মুখ সুন্দর করতে গিয়ে যে ফতুর হয়ে যাচ্ছিস তার কি করবি? খেমে যায় রানু।

যা, ভেতরে যা।

মাথা নীচু করে রানু ভেতরে গেলে মজনুও পেছন পেছন গিয়ে বাইরের ঘরেই খেমে যায়, ঘরের চারপাশে নূরজাহানকে দেখে আর পা ওঠে না তার। বাগিশের ওয়ারে 'নিরাশ আঁধারে খোদা তুমিই আশার নূর' সুনিপুণ সূচীকর্মে নূরজাহান, চালে খোলানো ঘন কিনির শিকার নূরজাহান, টিনের বেড়ায় ক্রেমে বাঁধানো জীবন্ত পদ্ম কুলের সেলাইয়ে নূরজাহান, কখন করেছে মেয়েটা এসব? আজ নূরজাহানই উপলক্ষ বলে ওরই সব কৃতিত্ব ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখে মজনুর একবার ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, ঘর কি তুই নিজে হাতে সাজিয়েছিস?

অনেকক্ষণ পর বাড়ির মধ্যে এসেছে বৎ, মজনু জানে না তার চাচাতো ভাইয়ের বউ এসেছে পাশের গ্রাম থেকে, বাপের একমাত্র খালা এসেছে আরো দূর থেকে, পাড়ার জবিগোছের আরো তিন-চারজন মহিলা এসে হাতে হাতে মাছ-তরকারি কোটাভাঙার রান্নাঘরের আশপাশ পরপনে করে তুলেছে। নূরজাহানের ঘরের দিকে এততেই তনতে পায় একটা মিহি গলার গান, রেডিওতে এই গানটা প্রায়ই বাজে তনেছে মজনু। নূরজাহানের বন্ধু লাইলী। আর এগোয় না মজনু। পেছন দিকে না

তাকিয়েও বুঝতে পারে চাচাতো ভাবি আর পাড়াতো ভাবিরা একুনি লাইলী আর মজনুকে নিয়ে রসিকতার একটা বান ডাকিয়ে দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে, সে বাড়ির পেছন দিয়ে বেরিয়ে বাঁশঝাড় হয়ে আবার বাইরের ঘরের বারান্দায় বসে আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকে। এই সময়ই সে দামি সিগারেটের দ্বিতীয়টি ধরায়।

আর এই সময়ই রহমত রাখাল চিৎকার করে ওঠে, মিয়াভাই, দ্যাখেন দ্যাখেন, কারা যিনি আইতাছে।

সামনে মাঠপারে তাকিয়ে মজনু দেখলো জনাবিশেক লোক তাদের বাড়ির দিকেই আসছে, একজন হাত তুলে এই বাড়িটাই দেখায় বলে মজনু নিশ্চিত হয়ে যায় ওরা নূরজাহানকে দেখার লোক। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠেই চেঁচিয়ে ওঠে মজনু, কুটুমরা এসে গেছে।

ভেতর থেকে এখনই-এখনই এত-সকালে এত-সকালে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে আবদুল মালেকও বাইরে এসে কপালের সামনে ডান হাত চোখের ওপর রেখে বলে ওঠে, হ্যাঁ, ওই তো, ওই তো সামনে ঘটক নেফাজ্জি! নেফার কি এইটা একটা কাম হয়েছে, অ্যাঁ, আসার কথা পাঁচটায়, এখনও তিনটেই বাজে নি, দেবেছ, দেবেছ, শালার ব্যাটা শালা করেছে কি, লোক আসার কথা দশজন, এ না দেখি তার ডবল, শালা আমার মান-ইজ্জত সব ডুবিয়ে মারবে!

খামিয়ে দেয় মজনু, আঝা, এসেই যখন পড়েছে তখন তাদের খাতির যত্নের ব্যবস্থা করতে হয়। রানু, এ রানু, কোথায় গেলি?

ও, তাও তো ঠিক বলতে বলতে আবদুল মালেক ছুটে ভেতরে যায়, দাওয়া থেকে নেবে সামনে মাঠের দিকে এগুতে থাকে মজনু।

যদি বিয়ে হয় তাহলে এরাই আমার বোনকে নিয়ে যাবে। যদি হয় তাহলে কেমন হবে ওর স্বামীটা! আর যদি হয়ই তাহলে বাচ্চাকাচ্চা হলে ওরা কি বলবে, ও-মা তোমার মুখে অমন দাগ-দাগালি কেন? কী জবাব দেবে নূরজাহান? বেশ আগে একবার মজনু জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যারে, নূরজাহান, কী জবাব দিবি? আশ্চর্য, নূরজাহান কাঁদে নি বা বিষণ্ণ হয় নি, যেমন ছিল তেমনি থেকেই বলেছে, বলব, রূপকথায় যেমনি রাক্ষস-খোঙ্কসের গল্প বলে, তেমনি অনেক অনেক আগে এই দেশে অনেক রাক্ষস-খোঙ্কস-দৈত্য-দানব এসেছিল, তারা আমাকে রাজকন্যা ভেবে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমার ছেলেমেয়েরা যদি জিজ্ঞেস করে কবে মা, কবে? বলব, মনে নেই, সে অনেক অনেকদিন আগের কথা। এই দেশে এক রাজা ছিল তার হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল, আর ওই যে বইয়ে বলে, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর গোলাভরা ধান ছিল, কিন্তু কবেকার কথা এদেশের লোক তার কিছুই মনে রাখে নি। মিয়াভাই: আপনি চিন্তা করবেন না, আমার ছেলেমেয়েদের পরীটরি দিয়ে এমন গল্প শুনিয়ে দেব যে, ওরা আমার মুখের দাগদাগালির কথা আর মনেই রাখবেনা।

কিছু নূরজাহান রে, রূপকথার গল্পে রাক্ষস-খোকস যে মারা পড়ে সেই কথা যদি
তোর ছেলেমেয়ে জিজ্ঞেস করে? কি জবাব দিবি?

নির্বিকার জবাব দিরেছিল নূরজাহান। বলব, এরা মরে না, বাস ফুরিয়ে গেল।

নূরজাহানের অমন নির্বিকার ও নিরুদ্ভাপ উত্তর শুনে মজনু আর কিছু জিজ্ঞেস
করতে সাহস পার না।

মাঠের মাঝামাঝি মজনু আর নেকাজউদ্দিনেরা মুখোমুখি হয়। আসেন, আসেন,
আমরা আপনাদেরই অপেক্ষা করছি বলে মজনু হাত বাড়িয়ে দেয়, আর ওদিকে
আবদুল মালেক আরে আমার কী সৌভাগ্য, আপনারা এত কষ্ট করে এসেছেন, এ যে
পরিষের বাড়ি হাতির পা বলে বিনয়ে গলে গিয়ে একসাথে সবার দিকে হাত বাড়িয়ে
দেয়।

খ্যাশ খ্যাশ করে হাসে নেকাজউদ্দিন। মালেক ভাইয়ের কপাল বলতে হবে, এই
আজই সকালে ছেলের দুলাভাই মিডিলইস্ট থেকে এসেছে, তিনিও শালার বিয়ের কথা
শুনে বললেন, কী, আমি যাব না? তিনিও এলেন।

নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার তো কপাল। আবদুল মালেক বিনয়ে আরো মাটির সঙ্গে
মিশে যেতে চায়, মজনু ঘাড় ঘুরিয়ে বিনীত বাপকে দেখে চমকে ওঠে, এর মধ্যেই
বাপ খোয়ানো পাঞ্জাবিটা নতুন লুঙ্গিটা পরে ফেলেছে, যে নেকাজউদ্দিনকে শালার
ব্যাটা শালা বলে একটু আপে গালাগাল করছিল তারই হাতটা বেশি করে কচলাচ্ছে।
ঘাড় আরো ঘুরিয়ে মজনু দেখল বাইরের ঘরের বারান্দায় রানু ওম হয়ে দাঁড়িয়ে,
বুকেতে পারল দরজার আড়াল থেকে বেড়ার ফাঁক ফাঁক দিয়ে মেয়েছেলেরা নতুন
কুটুম দেখছে। যে লোকের মাথায় মিষ্টির হাঁড়ি ছিল সে হাঁড়িটা হাতে করে বোকার
মতো দাঁড়িয়ে থাকে, আবদুল মালেক আবার এসব আনার কি দরকার ছিল বলে
রহস্যতকে ধমক মারে, যা, হা করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ভেতরে নিয়ে যা। আগে
আগে আবদুল মালেক ও নেকাজউদ্দিন, সবার পেছনে মজনু গোটা দলকে ঘরের
দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঘরের বারান্দায় তখনো রানু দাঁড়িয়ে, সে কাউকেই সালাম,
আদাব কিছুই দেয় না। রানুর চোখে চোখ রেখে ইশারায় নতুন কুটুমদের আপ্যায়ন
করতে বলে আবদুল মালেক, কিছু চোখ নামিয়ে নেয় রানু।

আসুন, আসুন। আমি গরিব মানুষ, আপনাদের জন্যে কিছুই করতে পারব না;
এ রহস্য, যা তো, ডাব পেড়ে আন, রানু, ভিতরে গিয়ে হাত-পা ধোবার পানি দিতে
বল। আগে যাকে দেখলেন, মজনু, আমার বড় ছেলে, বাড়িতেই থাকে, জমিজমা
দ্যাখে। আর ওইটে ছোট, শহরে ঢলেছে পড়ে, খুব লাজুক, নতুন মানুষ দেখলে
একবারে বোবা হয়ে যায়।

ঠিক তখনই কথা বলে রানু। বলে, মজনু ভাই, মানে মিয়াভাই মুক্তিযুদ্ধে ছিল,
কেরোশাস কাইটার ছিল, নেকা চাচা আপনাদের কিছু বলেনি?

প্রথমেই এ রকম প্রশ্নে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। নেফাজউদ্দিন ভাবাচ্যাকা খেয়ে তড়বড় করে বলে, না, মানে এটা তেমন বলার মতো কিছু না বলে বলি নি।

সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেয় মজনু। চাচা, আপনি কিছু মনে করবেন না। রানু, যা তো ভিতরে যা। বলেই রানুর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে দরজার আড়ালে গিয়ে বলল, এদের কাছে বলে কোনো লাভ নেই। কী দরকার?

গম্ভীর গলায় জবাব দেয় রানু, মিয়াভাই, ও ছেলের সাথে নূরীর বিয়ে হতে পারে না।

পাগলামো করিস না।

আপনি নিজেও জানেন এ বিয়ে হয় না।

কেন?

ওর তো রাজাকারের মতো চেহারা।

হেসে ফেলে মজনু, মানুষের আবার রাজাকারের মতো চেহারা হয় নাকি?

ভালোই, ভালোই বলেছেন। যুদ্ধের তালে ছিলেন তো তাই চেহারা মনে নেই। ও শালার চেহারা ঠাহর করে দেখেন, ওই গ্রামের আতিয়ার রাজাকারের মতো। রাজাকারের মতো চেহারার কোনো ছেলের সাথে আমার বোনের বিয়ে হতে পারে না। ও শালা মেয়ে দেখতে এসেছে না নিজেকে দেখাতে এসেছে?

হাত জড়িয়ে ধরে মজনু। রানুরে, আমি সব বুঝি, ওরা এদেশের মানুষ না।

মিয়াভাই, আপনি কেবল ওইটুকু দেখলেন? দেখলেন না, আপনি যুদ্ধে ছিলেন শুনে ওরা এক একটা কেমন চমকে উঠলো?

তক্ষুনি আবদুল মালেকের গলা শোনা যায়, কৈ রে, মর্জিনাকে হাত-পা ধোয়ার পানি দিতে বল।

সবার হাত-পা ধোয়া সারা, কান্দি কান্দি ডাব কাটা হচ্ছে, হবু জামাই ও তার দুলাভাই ময়মুরুবির আড়াল করে সিগারেট খাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুলাভাই হাত ইশারায় ডাকে রানুকে, এই ছেলে, শোনো।

বলুন।

ও গাছটা পুড়েছে কিভাবে?

একান্তুরে। আর যে সব ঘরবাড়ি গাছপালা পুড়েছে ওটাও ওইভাবে পুড়েছে। আমাদের এই বাড়ির ভিটের মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড! তোমার বড় ভাই যুদ্ধে ছিলো বলে পুড়িয়েছিল?

উল্টে জিজ্ঞেস করে রানু, আপনাদের কেউ যুদ্ধে যার নি?

দুলাভাই লোকটি মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলে, গিয়েছিলো আমার এক চাচাতো ভাই, কিন্তু কি লাভ হলো, নিজের জানটা তো খোয়ালি।

আপনার কোনো মা-বোনকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে যায় নি?

তুমি, তুমি এসব কি বলছো?

বাংলায় বলছি বুঝতে পারছেন না? ও-ও ও! মিডলইস্টে থাকেন তো!

মুহুর্তে দুলাভাই লোকটির মুখ লাল হয়ে যায়। কর্কশ গলায় বলে, নঈম, এই বাড়িতে তুমি বিয়ে করবে?

হেসে কেল রানু। চোটে হাসি ঝুলিয়েই বলল, বিয়ের লিখন না থাকলে হবে না। শোনে, আমার বোনকে মিলিটারিরা নিয়ে যেতে বসেছিল, রাজাকারদের জ্বালায় এ-গ্রাম সে-গ্রাম পালিয়ে ফিরেছি। একবার কি হয়েছিলো জানেন?

হবু বর নঈম চিৎকার করে ওঠে, নেফাজ্জি মিয়া, এসব কি শুনছি?

লাফাতে লাফাতে আসে নেফাজ্জিউদ্দিন, কি, কি বাবা?

এই মেয়েকে নাকি মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো?

ছুটে আসে আবদুল মালেক, ছুটে আসে মজনু, পেছন পেছন আরো ছুটে আসে নঈমের বাপ-চাচা-ভাই বন্ধু। অস্থির হয়ে বোঝাতে চায় আবদুল মালেক, সব মিথ্যে কথা বাবা, আমার এ ছেলেটার মাথায় দোষ আছে, আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। নূরজাহানকে আমি বুকের মধ্যে আগলে রেখে বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়েছি। ঝোড়ে দিন কাটিয়েছি, জঙ্গলে রাত কাটিয়েছি, মেয়ে আমার না পেরে বারবার বলে, আক্কা বিষ এনে দাও, আমি মরলে তোমাদেরও জ্বালা কমে; আপনারাই বলেন, আমি বাপ হয়ে মেয়ের মরা দেখতে পারি? কিন্তু কোথায় যাই, কি করি, ছেলে যুদ্ধে গেছে এই ভয়ের চেয়ে মেয়ে যাতে ওদের হাতে ধরা না পড়ে সেই ভয়ই বেশি, নেফা বলেনি? নিশ্চয়ই বলেছে আমার মেয়ে সুন্দরী, আশপাশ দশ গ্রামে এ-রকম সুন্দরী মেয়ে নেই, মেয়ে জন্মের সময়ই আমি ওর গায়ের রং দেখে নাম রেখেছি নূরজাহান, ওই যে; ওই ইতিহাস বইয়ের নূরজাহান, নূরজাহান মানে জগতের আলো, আমার মেয়ে আল্লার কসম ভাই, আপনারা একটু পরে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমি বাপ হয়ে মেয়ের নামে মিথ্যা বলব না, হায় আল্লা, যদি মিথ্যে কথা বলি তাহলে আমার যেন বেঁচে থাকতেই জিভ খসে যায়, মাথায় ঠাটা পড়ে, আমার যেন কবরেও জ্বরগা না হয়। ও মজনু, যা ভেতরে যা, দ্যাখ, আমার নূরজাহানকে সাজানো হলো কিনা, এনে দ্যাখা, আবদুল মালেক কখনো মিথ্যে কথা বলে না।

ধমকে ওঠে দুলাভাই, থামান, থামান আপনার লোকচার। আপনার ছেলে আরো যেন কি বলতে চাচ্ছিলো আপনি থামিয়ে দিলেন কেন? কি বলতে চায়?

এবার চিৎকার করে হবু বর নঈমকে দেখিয়ে মজনু বলে, শুনতে চান? শুনতে চান আমার বাপ ওই শালা রাজাকারদের হাত থেকে বোনকে বাঁচানোর জন্যে গনগনে কাঠ-কয়লার আগুনের মধ্যে ওর মুখ চেপে ধরেছিল। বিশ্বাস হয়? বলি, বিশ্বাস হয়?

দক্ষিণায়ন

এটি একটি সামান্য গল্পই। আরও একটু গভীর করে বলতে গেলে অতি সামান্য গল্পও বলা যেতে পারে। যেতে পারে কিনা সে বিচারের ভার আপনার ওপর। বিচার করতে গিয়ে সাক্ষীসাবুদ লাগলে আমি যোগাড় করে দেবো। অনেক সময় আসল সাক্ষীসাবুদ পাওয়া নিয়েও ভীষণ ঝামেলায় পড়তে হয়। খুনখারাবি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, অপহরণের মতো ঘটনায় সাক্ষী থেকেও থাকে না, কোনো একজনের চোখের সামনে খুন দেখেও কি নির্বিকার বলে, মহামান্য আদালত, আমার পূর্বপুরুষ ছিল ঘোড়া, আর সেই রক্তই আমার শরীরে বইছে বলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমাচ্ছিলাম, সেজন্য আমার চোখে পড়েনি যে খুনি কেমন করে কানের গোড়ায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলিটা করলো।

তবে এই ঘটনা খুন-ধর্ষণের মতো ভয়ংকর কিছু নয়। কিন্তু যার ঘটনা সে জোর গলায়ই বলতে চায়, এটা যদি খুন-ধর্ষণ না হয়, তাহলে আসল খুন-ধর্ষণ কাকে বলে বুঝিয়ে বলবে?

আমি তাকে বলি, এখন খুন-ধর্ষণও কি সামান্য ঘটনা নয়?

যার ঘটনা, অর্থাৎ আমার ন্যাংটোকালের বন্ধু আনন্দর। আমরা একে অপরকে ন্যাংটো দেখেছি যে বয়সে, সেই বয়সটা মনে থাকার কথা নয়। আমার মা বলেন, দুই তিন চার বছর বয়স পর্যন্ত প্যান্টই পরতে চাইতি না, আনন্দের মাও বলে আনন্দ? ওকে ওই বয়সে কিছু পরানো মানে যুক্ত করা। পরিয়ে দেবার পরপরই খুলে না দেয়া পর্যন্ত চিৎকার কাঁদাকাটি ভাঙাভাঙি চলতো। এইসব কথা আমি জানি, কারণ আমরা একেবারে পাশাপাশি বাড়ির ছেলে। মা যদি নিরামিষ রান্না করতো, আনন্দর মা বলতো, বুঝ, আপনি নিরামিষে পাঁচফোড়ন ব্যবহার করেছেন।

আমার 'খুন-ধর্ষণও সামান্য ঘটনা' মন্তব্য আনন্দ মানে। বাধ্য হয়েই মানে। না মেনে উপায় কি? না মেনে প্রতিবাদ করলে, বিচার চাইলে সে-ই যে খুন হবে না তার নিশ্চয়তা নেই বলে চুপ থেকে, সোজা কথায় হজম করে কেলা ছাড়া উপায় নেই। এখানে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা আনন্দের ক্ষেত্রেই। যে কারণে উপায়হীনভাবে শুধু ঘরবার করে, হাত দুটো মুঠো করে, বিড়বিড় করে, মানুষকে মা-বাপ তুলে গালাগাল করে, তারপরেও আমাকে বলে,

রশীদ রে, ইচ্ছে হয় খুন করে খুনি হই। তাও যদি গায়ের জ্বালা মিটতো।

পাগলামো করো না। তোমার বৌ-বাচ্চা আছে।

আমার এই কথায় ভাবলার মতো তাকায় আনন্দ। কিছু বলে না ঠিকই, কিন্তু তার ভাবলামোর মধ্যেই এমন একটা অসহায়ত্ব প্রকাশ পায় যে দেখে কষ্ট হয়, যদিও সে কষ্ট আপনি বুঝবেন না, বুঝবো আমি। কারণ ওই শিশুকাল ছেগেবেলার ন্যাংটোনেংটির ঘটনা।

আসছি সামান্য ঘটনার গল্পে।

সামান্য ঘটনাও যে অসামান্য বা বিশাল হয় তার অজস্র উদাহরণ আপনার যেমন জানা আছে, তেমনি আমারও। এক লোক নাকি অন্য এক লোককে 'মামু' বলে ডেকেছিল। খুবই নির্দোষ ডাক। আর মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক নিয়ে কতো গল্পই না চালু আছে। পদ্যও। ছেলেমেয়েরা মামাবাড়ি যায় পদ্মাপুকুর দেখতে, ফুল তুলতে, পাকা জামের মধুর রসে মুখ রঙিন করতে, তার চেয়েও বড় যে কথাটি চালু তা তো সব কালেই প্রবাদ। মামার জোর। কিন্তু কেন যে যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা প্রবাদটির বেশ চল তা আমার মাথায় ঢোকে না। বলছিলাম সামান্য বিষয়। তো সেই মামু লোকটি মহা ক্ষেপে গেল মামু ডাকা লোকটির ওপর।

কি? কি বলে ডাকলে?

কেন, মামু!

কেন? কেন ডাকলে?

আপনি আমার ছোট মামুর মতো দেখতে, তাই!

তার মানে আমি তোমার বাপের শালা?

মামুরা তো তাই হয়। হয় বড় শালা, না হয় ছোট শালা।

কি? এতোবড় কথা? আমি তোমার বাপের শালা? তোর বাপ আমার কোন বোনের স্বামী রে? তোরোর বাচ্চা!

সামান্য এক মামু থেকে তোরোর বাচ্চা এসে গেলে মামু ডাকা ভাগ্নেও কম যায় না। ঝপ করে আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই, তার পরে, এবং তারপরে কে যেন উৎসাহ জোগার হাত থাকতে কেন মুখে মুখে? সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ পর দুজনের হাত শব্দ করে কথা বলে বেতে লাগলো। শেষে দুজনই হাসপাতালে।

আর একটি সামান্য গল্পের মতো ঘটনা বলে আনন্দের গল্পে চলে যাবো। শহরের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটির একমাত্র মেয়েজামাইকে দেখে বোঝাই যাবে না এই দম্পতির ওপর দিয়ে একসময় কি ঝড়ই না গেছে। সে ঝড়ের খবর সবাই জানে, কিন্তু এল, তার লেশমাত্র নেই। কিছু না, ব্যাপার কিছুই না। ওই বাড়ির মেয়ে প্রেম করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে বিয়ে করেছিল। ব্যাস! থানা পুলিশ ধরপাকড় মেয়েজামাইয়ের হাজতবাস ওগা লেলিয়ে খুন করার হুমকি খবরের কাগজে খবরের চাইতে কেজা-কাহিনী করে শহরবাসী এমন যেতে রইলো যে, সারা দেশে আর কোনো উল্লেখযোগ্য

ঘটনাই নেই। কিন্তু কবে কোন তারিখে আবার সেসব পানি আর মধু হয়ে গেল তা শহরের লোক তো দূর, প্রতিবেশী এমনকি মেয়েজামাইয়ের নিকটাত্মীয়রাও জানতে পারলো না। আমি কি বলবো জানি নে, আপনারাই বলবেন, এতো অতি সামান্য ঘটনা। সত্যি সেই মেয়েজামাই এখন খুবই ভালো আছে, রূপকথার গল্পের ভাষায় তাহারা সুখশান্তিতে বসবাস করিতেছে।

আনন্দের গল্পের সামান্য বিষয় হচ্ছে 'একটি বাড়ি'।

আমার ন্যাংটোকালের বন্ধু বলেই আমি জানি আনন্দের এই বাড়িটি ঘিরে ওর যেমন শ্রম ঘাম মিশে আছে, তেমনি স্বপ্নও ঘিরে আছে প্রতিটি ইটে প্রতিটি বালু ও সিমেন্টকণায়। বাড়ি তৈরির আগেই আনন্দ স্বপ্নগুলো সাজিয়েছিল থরে থরে, যেমন ইটের পর ইট বসিয়ে দেয়াল উঁচু থেকে আরও উঁচু হয়। বড় কপালে ছেলে আমার এই বন্ধুটি। সেই উত্তরায় একটা পুটের জন্য কবে আবেদন করে রেখেছিল, তা ওর নিজেরই মনে নেই। হঠাৎ একদিন রাজউক থেকে চিঠি। দিন বেঁধে দিয়েছে, আগামী আগস্ট মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা-পয়সা জমা দিয়ে পুট বুঝে না নিলে বরাদ্দ বাতিল করা হবে। রাজউকের চিঠিটি যখন আসে তখন আমরা আসলেই ন্যাংটোকাল নিয়ে গল্প করছিলাম। আমাদের ন্যাংটোকাল কি আমাদের মনে থাকার কথা? অবশ্যই নয়। কিন্তু ওর মা ও আমার মার মুখে আমাদের গল্প শুনতে শুনতে চোখেই দেখতে পাই আনন্দ যাঁতি দিয়ে বাড়ি মেরে আমার কপাল কেটে দিলো, আনন্দও দেখতে পায় ওর বাম হাতের কনুইয়ের নিচে যে কাটা দাগ সেটা কোনো ধারালো অস্ত্রের কাটা নয়। আমার কামড়ের। দুধের দাঁতের নাকি ধার বেশি। সেই ধারে ওর মাংস ভেদ করে দাঁত অনেকখানি ঢুকে গেলে ঘা তো হয়ই, সেপটিকও নাকি হয়ে গিয়েছিল। যা-তা ঘা নয়। সেপটিক। দুধের দাঁতেও কি বিষ থাকে না? সামান্য কামড়ের ঘা মনে করে প্রথমে তেমন গুরুত্ব-ডাক্তার না করার ফলেই ওকে কতোদিন যে ভুগতে হয়েছে তা কি মনে আছে? গত বছরের আগের বছরও আনন্দের মা বললেন,

বাবা রশীদ, আনন্দের সেই ঘা নিয়ে আমাদের যে কি দুশ্চিন্তা হয়েছিল! ডাক্তার তো ভয় পাচ্ছিলো গ্যাংগ্রিন না হয়ে যায়।

কথা শুনে আনন্দ হাসে, আমিও হাসি। যেন ঘা সেপটিক গ্যাংগ্রিন কোনো বিষয়ই নয়। আমি হাসতে হাসতেই বলি, খালামা, ছোটবেলায় না হলে আমাকে আপনারা কি করতেন? উঠোনের মাঝখানে দেয়ালের এ-বাড়ি ও-বাড়ি বলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে হাসির বিষয়, কিন্তু তা না হলেই আনন্দ বলেছিল,

হয় তোমার মাথা ফাটতো, নাইয় আমার।

আনন্দের এই জবাবে আমি কিছু না বলে ওর কনুইটা তুলে দেখলাম আমাদের ন্যাংটোকালটা বড় বেশি চোখ চোখ করে তাকিয়ে আছে।

বলছি, বলছি তো সামান্য গল্পটি! আসলে ঘটনা কি জানেন, সোজা কথা আমি কোনোদিন সোজা করে বলতে পারলাম না বলে বৌয়ের কাছে এখনও গাল খাই, যে

মহিলার সঙ্গে আমার কাঁঠালের আঠার মতো প্রেম ছিল তাকে স্রেফ তোমাকে আমি বিয়ে করবো কথাটা বলতে না পারায় বিয়েটা হয় নি। অন্তত সেই মহিলার কথা আমি বলি, মুখে না বললে কি বলা হয় না?

বলতে হয়, বলতে হয়। মেয়েরা নিজ কানে শুনে ভালোবাসে।

আমি ধতমত খেয়ে যাই। সময়মতো বলি নি বলে একসময় নিজের মুখ নিজেই কামড়েছি, কিন্তু পরে জেনেছি আমার চাইতেও এক বড় দরের লোক নাকি নাটকের কায়দায় তার সামনে হাঁটু ভেঙে বসে বলেছিল, তোমাকে বিয়ে করতে না পারলে দেশান্তরি হবো, সারা জীবন চিরকুমার থাকবো, এমনকি আবেগের চোটে বসে কেলেছিল সুইসাইড খেয়ে আত্মহত্যা করবো। শোনা কথা, বিয়ের পর নাকি ভুল সংশোধন করেছে। বলতে চেয়েছিল সায়ানাইড খাবে।

কাজের কথায় আসি। উত্তরায় প্রুট পেয়ে আনন্দের আনন্দ আর ধরে না। টাকা ধার করে, বৌয়ের গহনা বিক্রি করে, দেশের সবচেয়ে ভালো ফসলি জমি বন্ধক রেখে যেদিন আনন্দে-রাজউকে পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়, সেদিনই বিকেলে আমাদের দুই পরিবার একটা ভাড়া মাইক্রো নিয়ে জমি দেখতে যাই। সে জমির কথা কি বলবো! সে তো জমি নয়, স্বর্গের ঝুল বারান্দা। ঠিক খুতনির মতো। দুই পাশ দিয়ে উত্তরার লেক। দেখলাম লেকে এক ঝাঁক হাঁস হাসছে, বস্তির কয়েকটা ছেলে দূর থেকে ছুটে ছুটে এসে ঝাঁপ দিচ্ছে, ওপারে এক লোক ছিপ ফেলে ফাৎনার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন ফাৎনাই তার জীবন-মরণ, আরো আশ্চর্য পানিতে বেশ অনেক শাপলা। আমি চাঁচিরে উঠি।

আনন্দ, আনন্দ! বাড়ির সামনেই জাতীয় ফুল!

খুশিতে আনন্দের মুখটা তখন ঢেকে গেছে। কোনো জবাব আসে না ওর মুখে। আর ঠিক তখনই আনন্দের বৌ বীথিকা বলে,

জানেন, এই দিকটাই দক্ষিণ।

জমির অবস্থান দেখে অন্তত আমি এতোটাই আত্মহারা যে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চিন্তা করার কথাও চিন্তা করি নি। বীথিকার কথায় আমার সহসা গায়ে দক্ষিণের বাতাস লাগে। অথচ তখন গাছের একটি পাতাও দুলছে না, লেকের পানিতে ছেলেদের দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করার জায়গাটুকু বাদে কোথাও পানির সামান্য আন্দোলনও নেই। আমার শুধুই মনে হয় দক্ষিণ ও শাপলা ও লেক ও হাঁস ও ছেলেদের ওই দুরন্তপনা সব সময় থাকেই থাকে। আমরা চারজন, আনন্দ ও বীথিকা, রশীদ ও ঝরা লেকের পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে থাকি, আমরা অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে সূর্য ডোবার অপেক্ষায় থাকি।

ওখানে বসেই সূর্য ডোবা দেখা যায়। সূর্যের শেষ লালটুকু চোখের আড়াল হতেই প্রথম কথা বলে আনন্দ,

আমার বাড়ির নাম কি দেয়া যায় রশীদ?

আমি খানিক চিন্তা করে বলি,
অস্তাচল।

মাথা ঝাঁকায় আনন্দ।

মন্দ বলো নি, তবে আরেকটু চিন্তা করো।

তাহলে বলাকা। লেকে তো সারা বছরই হাঁস খেলবে।

এটাও মন্দ বলো নি। আরও খানিক চিন্তা করো।

আমি রশীদ বাগিজ্য পড়া মানুষ, আমি যে দুটো চমৎকার বাংলা নাম কি করে বলে ফেললাম ভাবতেই নিজেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু আনন্দ আরও আনন্দময় নাম চায় বুঝে আত্মসমর্পণ করে বলি,

আনন্দ, আমার যা বিদ্যে, তাতে ওই দুটো নাম যে বলেছি তাই ঢের। এখন চিন্তা করতে গিয়ে দেখি ডেবিট ক্রেডিট ক্যাশ ব্যালান্স এসব মনে আসছে।

ঠিক তখনই বীথিকা কথা বলে,

রশীদ ভাই, আপনার বন্ধু কিন্তু এখন শান্তিনিকেতনে।

মানে!

হ্যাঁ। কল্পনায়। গত বছরই আমরা শান্তিনিকেতন গেলাম না! ওখানেই ও রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বাড়ির নাম দেখে বলেছিল উত্তরার জমিটা পেলে যে বাড়ি বানাবো, তার নাম রাখবো দক্ষিণায়ন।

চোঁচিয়ে উঠি আমি,

ওরেশ শালা! আমাকে এতোক্ষণ বাজিয়ে দেখা হচ্ছিলো?

মিটমিট করে হেসে আনন্দ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে শুধু বলে,
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার কাছে যাবো বলো?

আমাদের চারজনের চারপাশে বাতাস নিস্তব্ধ সংগীত পরিবেশন শুরু করলে আমরা নিশ্চুপ থাকি, সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসে, কেউই লক্ষ করে নি ঝাঁপাঝাঁপি ছেলের দল কখন পানি শান্ত করে চলে গেছে, কারো চোখে পড়ে নি ফাৎনার লোকটি আর নেই। তবে চোখে পড়ে আমাদের চারপাশে বেশ কিছু জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। ওরা কখন এলো? আর তখনই আমরা জানি, বীথিকা আসলে বীথি, আনন্দের ঘরে এসে কা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথই পেতে সাহায্য করেছে। তন্ময় হয়ে বলে আনন্দ,

যখন জানলাম আমার যে বৌ হবে তার ডাকনাম বীথি, তখনই চিন্তা করেছি তার নাম রাখবো বীথিকা।

এ অবস্থায় বাঙালি মেয়ে স্বামীকে সলজ্জ মৃদু শাসন করে, কিন্তু বীথিকা কিছুই করে না, আমি বাগিজ্যের ছাত্র হয়েও অনুভব করি বীথিকা রবীন্দ্রনাথে অবগাহন করছে; আরও অনুভব করি চরাচরে আনন্দ আনন্দ বলে আনন্দ ছুটোছুটি করছে।

এই তো সামান্য গল্প শেষ করছি। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, শান্তিনিকেতন নিয়ে, আনন্দ নিয়ে আনন্দ ও বীথিকা যে দক্ষিণায়ন বানালো সেখানে ওদের বসবাসের সৌভাগ্য

এখনও হয় নি। তখু জেনে রাখুন, ঋণ হয়েছে অনেক, আনন্দের অফিস যাতায়াতে কষ্ট, বীথিকার বাচ্চাদের কুল আনা-নেয়ার সমস্যা সাত পাঁচ বিষয় ওদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে দুজনই সিদ্ধান্ত নেয়, ভাড়া দেয়া ছাড়া উপায় কী?

ঠিক এখানেই সামান্য গল্প শুরু। পাঁচ মাস, ছয় মাস, সাত মাস যায়, দক্ষিণায়ন ভাড়া হয় না। অনেকে এসেছে ভাড়া নিতে, দেখেছে, বাড়ির অবস্থান দেখে অপূর্ব, চমৎকার বলেছে, একটি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া পরিবারও দেখে গেছে, ভাড়াও বেশি নয় বলেছে, তারপরেও ভাড়া হয় না বলে আনন্দের রবীন্দ্রনাথকে মুছে ফেলতে আমাকেই এগোতে হয়। আমি বাণিজ্যের মানুষ, আমার মাথায়ই বুদ্ধিটা যেদিন এলো, তার তিন দিনের মধ্যেই দক্ষিণায়ন সাদার্ন ভিউ নামে ভাড়া হয়ে গেল। সামান্য গল্পের শেষ হচ্ছে, ভাড়া হওয়ার দিন থেকে আনন্দ শুরুতর অসুস্থ। ডাক্তার রোগ ঝুঁজে পায় না।

আলাপের মাত্রা

অবশেষে একটা কাজ যাওয়া গেল। বাঁধাধরা চাকরি নয়, অন্যের সংসারে ছুটা কাজের লোকের মতো কাজ পেলেও আপাতত স্বস্তি পাই, এই কাজের সূত্রে কিছু পরিবার, কিছু দামি ও ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে আলাপ হবে, তাদের একসময় ধরে-কয়ে একটা ভালো ও স্থায়ী কাজ বাগানো যাবে। সুযোগ পেলে কাজ যে বাগাতে পারি, এ প্রমাণ আমি রেখেছি। প্রমাণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, আমি বেশ ওড়িয়ে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে কথা বলে যেতে পারার কারণে বহু পুরুষ মানুষ তো বটেই, অনেক মেয়ে-মহিলার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। ব্রাভো। যখনই বুঝি কথা অপর পক্ষ যাচ্ছে, খাপে খাপে লেগে যাচ্ছে— তখন আমি নিজেকেই সাব্বাসী দিই— হেই মিয়া আবুল হাশেম ওরফে হাশেম্যা, তুমি টাইমলি এমন যুৎসই কথা পাও ক্যামনে? পাই কিভাবে সে রহস্যও আমার অজানা। কথারা যখন সেজেগুজে লাইন ধরে আসতে থাকে তখন মনে হয়, ওরা অপেক্ষা করছিল— কখন আদর করে ডাক দেবে— ‘আয়রে আমার সোনাচ্চাঁদ, পুটুমনি, গলার হার, দুলদুলুনি!’ এগুলো সবই গালটেপা আদুরে কথা। তাহলে কথারাও আদর বোঝে। কথাই যে মানুষের বাঁচা ও মরার হাত-পা, তা বুঝেই আমি তাদের পিঠ চাপড়ে বলি, ব্যাটারা, তোরা যদি সময় মতো না আসতি তাহলে আমাকে একটা আস্ত ভোদাই হয়ে মাটির সঙ্গে মাথা মিশিয়ে আসতে হতো। নিজের সম্পর্কে বাহাদুরি নেয়ার ভূমিকা দেয়ার একটা কারণ আছে। আমি অবশেষে যে কাজটা পেয়েছি তার গালভরা কোনো ডেজিগনেশন নেই, র‍্যাঙ্ক নেই, স্ট্যাটাস নেই, পজিশন নেই, তবে যা আছে তার নাম টাকা। মানে মানি। একটা ইংরেজি গান শুনেছিলাম—মানি মানি মানি; আবার প্রবাদ-দ্রবদ জাতীয় একটা কথা আছে, মানি, সুইটার দ্যান হানি, তাহলে টাকা মধুর চেয়েও মিষ্টি—কথাটা পরখ করে দেখার জন্য টাকা কখনও খেয়ে না দেখলেও চাওয়ার চেয়ে বেশি টাকা যখন পাওয়া যায়, তখন বোশেখ মাসের দুপুরের রোদও পোড়াবাড়ির চমচমের অধিক মিষ্টি লাগে। এরকম বোধ আমার জীবনে একবারই এসেছিল। সংসারে বেশ অভাব চলছে। একটা কাজের জন্য সারাদিন ফ্যা-ফ্যা করে সন্ধ্যায় যখন বাসায় ফিরি, তখন বৌ বড় আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিছু মিলল?

কারও কাছ থেকে ধারধুর করে কিছু আনতে পারলে হ্যাঁ বলি, কিন্তু ধারের কথা কিছুতেই মুখে আনি না, কারণ ধার করলেই যেসব প্রশ্ন ঝাঁক ধরে আসবে কার কাছ থেকে ধার করলে, কি বলে ধার করলে, শোধ দেবে কবে, এরকম ফকিরগিরি করে কতদিন চলবে, এই, এইসব সাতকাহন কথা। সাতের জায়গায় দশকাহন শুনতেও আপত্তি নেই, কিন্তু যখন বৌয়ের ইনুনিবিনুনি বিলাপ শুনি—এই ছিল কপালে, কাঙালের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে দুই টাকার বিষ এনে দাও খেয়ে মনের জ্বালা মিটাই, ভাত দেয়ার ভাতার নয়, কিল মারার গোসাই—তখন সত্যিই মনে হয়, পরেরবার টাকা ধার করে বিষই না হয় কিনে এনে দেখব বৌ কথা রাখে কিনা। এসব কথার কথা ও সত্যিই সত্যি।

আমি ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই—একটু আগে পোড়াবাড়ির চমচমের কথা বলেছি, আর সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অরিজিনাল পোড়াবাড়ির যে ভেতরে কতো নরম, কতো স্বাদু, কতো জিভ টানে তা আপনার মুখ না দেখেও বলতে পারি, আরও বলতে পারি শুধু শোনা কথার স্বাদের জন্য মহাবিরক্ত হয়ে মনে মনে আমার বাপের যে সঠিক পরিচয় নেই এমন চিন্তাও মাথায় এসে গেছে, আরও এসে গেছে যা দিতে পারব না, খাওয়াতে পারব না তা বলে মনের কষ্ট বাড়ানোর জন্য কুত্তার ও-মুত তোকে দিয়ে চাটাব। আমিও আসলে চাই কথার খেলা খেলে খেলে আপনাকে একেবারে হাতের তালুর ওপর তুলে ডিডিন ডিন করে নাচিয়ে নাচিয়ে বলবো, আরে মিয়া! অতো অস্থির হও ক্যান? আগেই যদি ঘটনার শ্যাম শুনবার চাও তাহলি আমার এতো ভ্যাজর ভ্যাজরের দরকারডা কি আছিলো?

বোশেখ মাসের রোদ আর পোড়াবাড়ির চমচমও আশার চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাওয়ার ঘটনাটা কিন্তু তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ডের সময়ের মতো নয়। তা তিরিশ-চল্লিশ মিনিট হতে পারত, ওই পরিমাণ ঘণ্টারও হতে পারত, এমনকি দিন-মাস পার হয়ে বছর হলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ, কারণ যে লোকের কাছে কাজটা নিয়ে যাচ্ছি তার হার্ট নাকি চিটাগাং ষ্টিল তো দুদুভাত, টাটা ষ্টিলের চেয়েও কঠিন। কাজ নিয়ে যাওয়ার সময় আবার মনে এমন ভয়ভয় ও গুড়গুড় করতে থাকে, সেই লোক ষ্টিলের হাত দিয়ে নয়, কড়ে আঙ্গুলের নখ দিয়ে খোঁচা দিলেই আমি ইন্সালিদ্ধাহ হয়ে যাব। ভয় আরও একখান আছে। ওই টাটা ষ্টিল। উহা ভারতীয়। পাকিস্তানি নয়। ভারতীয় বলে আমার কপালে, পিঠে-পাছায় ভারতের চর ছাপ পড়লে আর রক্ষে নেই। যে লোক আমাকে দিয়ে কাজ করচ্ছে সেই উলটো আব্বাস আলী খানের মড়া পরাণের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলবে, দুলাভাই, পাকিস্তানের পক্ষের বেশি না, মোড়ে দুইজন ফেরেশতাকে পাঠান দ্যান তো, এই শালা মুসলমানের মতো নাম মালাউনের বাচ্চাডারে দুইডা রাম ঠাপ দিয়া যাক, হারামির বাচ্চা যাতে আর কোনোদিন উইঠ্যা ধানের ভাত খাইতে না পারে। আমি শত চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারব না, আমার কোনো পাকিস্তানি ষ্টিলের নাম জানা নেই, আদ্যার কিরা, খোদার কসম।

তো আপনাদের চমচম খাওয়া শেষ, আমারও পাকিস্তান পছন্দ ফেরেশতার রাম প্যাদানিও হজম, অতএব বুকে ও মনে তিনবার কুল ও পাঁচবার দরুদ পড়ে বলছি যে, আমার কাজ ছিল সেই ষ্টিলম্যানের কাছে একটি চিঠি পৌছানো। শুধুই পৌছে দেয়া, আর কিছুই নয়। তবে কেবল এটা নিশ্চিত করতে হবে যে চিঠিটি তারই হাতে পড়েছে এবং ষ্টিলের হাত দিয়ে খামটি ছিঁড়ে পড়তে শুরু করেছে। খাম ছেঁড়া ও পড়া আরম্ভ করেছেই শর্ত আরোপের মধ্যে আমার একটা ধন্দ লাগে। কেন? চিঠি হাতে পড়লে মানুষতো পড়বেই, পোস্ট কার্ড হলে ছিঁড়বে না, খামে ছিঁড়বে—এই যা পার্থক্য। আমি চিঠির মনিবকে হাত কচলে মাঠা মাখন ঘোলের তলানির চেয়েও অধম হয়ে বলি—

পড়া শুরু করল কিনা, সেটা দেখাও কি জরুরি?

পয়লা মনে হলো মেঘ গর্জন করল আকাশে, কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি সে মেঘ ঘরে এবং কানের দুই তালাই ফাটিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

হ্যাঁ।

দুই কানেই হাত ঘষে ঘষে যখন শুনি কানের ফাংশন ঠিক আছে, তখন মনে একটু জোর এনেই বলি,

স্যার, ওইরকম পাথর মার্কা মানুষ যদি আমার কথা না শোনে তাহলে আমার কি করণের আছে?

বুঝে ফেলি কথা খাপে খাপে লেগেছে। মনিব নাকের আগায় কোনো ময়লা নেই সত্ত্বেও তিন-চারবার নাক আঙুল দিয়ে ঘষে বলে,

কথাডা বেঠিক কও নাই। ওই সব জাউরা লোকের মেজাজ-মর্জি বোঝা দায়। কিন্তু মিয়া হাশেম্যা, তুমি তো কথা দিয়া মানুষ পটানোর মাষ্টার, এই জন্য তোমারে কামেও লইছি, তারপরও যদি পটায়ী না আসতে পারো তাহলি যে টাকা তোমারে দেবো ভাবছি তার তিন ভাগই পাইবা না।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার দম যে বুকের কাছ থেকে গলার কাছে এসে যায় স্পষ্ট টের পাই, কান চুষকের মতো হয়ে যায়—এই বৃষ্টি শুনব আরও বলবে—তুমি পাইবা এইডা। মানে বুড়ো আঙুল। আরও সরল কাঁচকলা। আর তার সরলসোজা অর্থ, আমার দম গলা হয়ে জিভ হয়ে ঠোট হয়ে কুস করে বেরিয়ে যাবে। খান্দাবাজি ফেরেববাজি করেও যা হোক জীবন চলছিল, কিন্তু বাপ-মায়ের উপহার থাপটা যদি চলে যায় তাহলে কোথায় দাঁড়াবে আমার বৌ-বাক্সা! আমার মাথা ঘুরতে থাকে। মনে হচ্ছে পড়ে যাব।

মনিব ঘুষু লোক। মনের কথা বুঝতে একটু দেরি করে না। সে আমার মুখের রং দেখেই ধরে ফেলে আমি অঁখে সাগরে ডুব খাচ্ছি আর উঠেছি। ডাকে,

হাশেম!

জি।

বুঝছি, ভাবতাছো যা দিবার চাইছি তাও দেব কিনা। দেব, দেব। কথা যখন দিছি, দেব। জবানের বরখেলাপ আমি করি না। তয়, কথা ওইখান। চিঠি হাতে দেওনের জন্যি চারআনা, পড়ানোর জন্যি বারো আনা। যোগ কত হইল? ষোল আনা। তো এখন যাও। আল্লা রসুলের নাম নিয়ে মেলা কর। এই টাইমে ওই মাদারচোতরে বাড়িতেই পাইবা।

মনিব আমাকে একরকম ঠেলতে ঠেলতেই বের করে দেয়। আমার বাপদাদার ভাগ্যি ঘাড়ে ধরে বের করে নি। কিন্তু এসব কথা আমার মনে তখন মোটেও বড় হয়ে দেখা দেয় না। আমার মনে তখন চিন্তা তিনরকম। এক—চিঠিটা হাতে পৌঁছানো, দুই—চিঠিটা পড়ানো। প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা কঠিন। কিন্তু তিন নম্বরটা হাতে দেয়া বা পড়ানো—কোনোটাই নয়, সেটা ভয়াবহ, ভয়ংকর, অর্থাৎ ভয় দিয়ে যতরকম ভীতিকর শব্দ আছে সব শব্দের সমন্বয়ে একটা কিছু; আমার উদ্দেশ্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বাঘের মতো আমার ঘাড় বরাবর থাবা বাড়াল। থাবা ঘাড়ে লাগার আগেই আমার ঘাড় মটকে যাবে, তখন? তখন আমার নাম কি হবে? এখন অনেক টপটেররের নামের আগে-পিছে যেমন ধলা, পিচ্ছি, বেঁটে, টাকুয়া, জার্মান, হেঁচকি, কেঁচকি—কতোরকম বিশেষণ আছে; তেমনি আমার নামের আগে বা পিছে মটকা যোগ করে ঘাড় হাশেম হয়ে যাবে, তখন আমার বৌ যে আমাকে ওই ঘাড় ধরেই বের করে দেবে তা আমি হালপ করে বলতে পারি। জীবনে এত আল্লার নাম ডাকিনি। সামনে ডেকে যেতে থাকি, কেউ সে ডাক শুনতে পায় না বলে জিভের আগাপাশতলায় ফেনা জমে গেছে, তাও দেখতে পায় না এই যা রক্ষে। তখন আমার মনে থাকে না আমার ওজু নেই, পেশাব করে পানি নিই নি এবং শয়তানের দোস্ত হয়ে পেশাব করেছি খাড়া হয়ে। সাফসুতরো শরীরে খালেছ দিলে আল্লাকে ডাকলে নাকি কাজ হয়, সেটাও বেমালুম ভুলে গেছি।

হঠাৎ বোধ করি, মনে বেশ সাহস পাচ্ছি। বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর পাতলা হয়ে যায় এবং তখন কথাদের সাজাতে গিয়ে দেখি আসছে, আসছে, সেজেগুজে দল বেঁধে লাইন করে আসছে, চোখের সামনে কথাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। পাড়ায় একবার রবীন্দ্রজয়ন্তী না কি যেন হয়েছিল, সেখানে ঠোঁটে ও দুই চোয়ালে কমপক্ষে আধা পোয়া লাল গোলাপি রং মাখানো এক মেয়ে আধো বোঁজা আধো খোলা চোখে গাইছিল—এসো এসো আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো, যে আছো অন্তরে, হ্যাঁ, সেই অন্তরের কথারা ঠোঁটে এসে যাচ্ছে দেখে আমার মনে হয় হে স্টিলম্যান, তুমি যতবড় মুক্তিযোদ্ধাই হও, আমি তোমাকে শুজাবো, গলাবো, পটাবো। পটাবোই।

খাড়া হয়ে পেশাব করেছি, ওজু করি নি সত্ত্বেও আল্লা আমার দিলের কথা শুনেছে। তার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি, আমার মনিবের মাদারচোত সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আগেও তাকে দেখেছি, কিন্তু দেখার মতো করে দেখি নি বলে বুঝতে পারি নি, শরীরে ও মুখে বয়সের একটু ছাপ পড়লেও এখনও যে সে স্টিলম্যান সে কথা

অস্বীকার করার উপায় নেই। দেখতে আর দশটা মানুষের মতো হলেও কোথায় কি যেন আছে সেটা আর আমার পক্ষে ধরা সম্ভব হয় না। তখন একটু ভয় ঢোকে মনে। ঢুকুক। তার সামনে যখন এসে পড়েছি তখন মরি-বাঁচি সামনে যাব, চিঠিটা হাতে দেব, না পড়া পর্যন্ত যেনতেন প্রকারে পড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। করতেই হবে। আরও সামনে গেলে সে আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকালে বুঝতে পারি, অন্তর্দৃষ্টি বলে যে একটি কথা আছে সেই জিনিস এই লোকের আছে। তখনই আমার মনে হয়, মনিবের কাছে শুনেছি সেই গুণ্ণগোলের সময় এই লোক মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারত, কে পক্ষের আর বিপক্ষের। বিপক্ষে হলে আর রক্ষে নেই, পেটের মধ্যে হাত চালান করে নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলি মায় গুর্দাকলিজা ওলটপালট করে গোপন কথা বের করে তবে দোষমাক্ষিক শাস্তি দিত। সেইরকম দোষের একজন এখনও ঘরে শিক ধরে ধরে রাস্তায় মেয়ে দেখে আর বড় বড় শ্বাস ছাড়ে। সে মনিবের আপন ছোট ভাই। ছোট ভাই তো আর বোঝেনি, যার কাছে সে গেছে সেই লোকই আসল লোক। কি করে চিনবে বা বুঝবে? এমন নিষ্পত্ত ছদ্মবেশে তাকে পাকা মুসুল্লি-মুস্তাকিন মনে হয়েছিল, তাকে ছোট ভাই শুধু জিজ্ঞেস করে,

আপনার বাড়ি কি এই জায়গাতেই?

মুসুল্লি সুরমা চোখে বড় মায়া মহক্বত করে তাকিয়ে জানতে চায়,

আপনি কি ষ্টিলম্যান রফিকের খোজ চান?

উৎসাহী হয়ে ওঠে ছোট ভাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বুঝলেন কি করে?

মুসুল্লি আকাশের দিকে মুখ তুলে খানিক চোখ বন্ধ রেখে মুখ আবার নামিয়ে আধো খোলা চোখে মোলায়েম গলায় বলে,

সবই আদ্যাহর কুদরত। তো আসেন আমার সঙ্গে রফিকের বাড়ি দেখিয়ে দিই। আপনি কি রফিককে চেনেন?

অবশ্যই। ওই চুতমারানি মুক্তিবাহিনী না মুক্তিবাহিনীর রফিককে চিনবো না? গুণ্ণগোলের আগে কত দেখেছি ব্যাণ্ডের বাচ্চার মতো ভিড়িং বিড়িং করে লাফাতে।

তাহলে তো ভালোই। আমাকে আর তেমন কষ্ট করতে হবে না।

এসব কথা আমি হাশেম্যার জানার কথা নয়। জেনেছি মনিবের কাছে থেকেই। ষ্টিলম্যান রফিক ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছোট ভাইকে এক ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাড়ি-গোফ খুলে আসল রূপ দেখিয়ে মোট চার মোচড়ে চার হাত-পা লুলা করে দেয়, গলায় টিপ দিয়ে জিভ বের করে জিভের অর্ধেকটা কেটে দেয়, আর নিজের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য একটা চোখ বাঁচিয়ে রাখে। ছোট ভাই লুলা হাতে কোনোরকমে ষ্টিলম্যানের শক্তির বিবরণ লিখে জানাতে পেরেছিল।

ষ্টিলম্যান রফিক আমার দিকে তাকিয়ে মাথার আগার চুল থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলে,

বলুন!

আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

আপনি কে?

আমার মনিবের নাম বলে বলি,

আমি তার আগ্রহে কাজ করি। উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। আমি বাহক যাত্র।

কি আছে চিঠিতে?

বলতে পারব না। এই যে চিঠিটা।

একটু দেরি না করে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়ার সময় ত্বরও হয়—চিঠিটা ধরার পরিবর্তে আমার হাত ধরে একটা মোচড় দিলে লুলা নির্ধাৎ, কিন্তু আমার কপাল ভালো ওটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল একবার, আমি তখনও দাঁড়িয়ে।

হঁ! তো?

প্রশ্নই বলে দেয় আমি দাঁড়িয়ে আছি কেন? কিন্তু কথা বলে তাকে পটিয়ে চিঠিটা পড়া শুরু করল দেখে যেতে না পারলে আমার ষোল আনার বার আনাই যে নেই হয়ে যাবে তা মাথায় রেখেই বলি,

আপনি চিঠি পড়ে কিছু বলবেন কিনা জেনে যেতে চাচ্ছিলাম।

আমার কুর্তি দেখে কে। টিলম্যান একটানে খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করে চার থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চোখ বুলিয়ে ঠাণ্ডা খাতব গলার শুধু বলে—

যা বলার পরে বলব।

যথেষ্ট, আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তখনও বুঝি নি বাড়ির বাইরে আমার জন্য একটা বিশ্বাস অপেক্ষা করছে। গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় দেখি মনিবের পেয়ারের লোক ভোতলা মোকহেদ ভিড়ের মধ্যে সুড়ৎ করে আড়াল হয়ে গেল। তার মানে মোকহেদ টিকটিকি। আমি কাজটা ঠিকমতো করলাম কিনা। বড় হালকা লাগে নিজেকে। নিজেকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমাকে যে সাতকাহন কথা বলতে হতো তা আর করতে হবে না, মোকহেদই আমার হয়ে কাজটি করে দিল দেখে বহুত খোশ দিলে ঠোন্টের আগার ‘আর মেরি দিল কাঁহি আউর চল’ সুর তুলে মনিবের বাসার সামনে এসে দেখি মনিবও টিলম্যান বকিকের মতো বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার মুখ হাসি-হাসি। তার মানে ভোতলা মোকহেদ আগেই এসে রিপোর্ট দিয়েছে হাশেম্যার মিশন সাকসেসফুল। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মনিব এক সিঁড়ি নেমে এসে আমার নিষ্ঠে চাপড় দিয়ে বলে,

ওয়েল ডান মাই বয়! ওয়েল ডান।

আমি না বোকার ভান করে সরল মনে জানাই,

ওস্তাদ, চিঠি দিয়েছি, পড়িয়েও

বাক্য শেষ করতে দেয় না মনিব।

জানি।

জানেন! কিভাবে জানলেন?

হাশেম, তুমি থাক ডালে ডালে আমি থাকি পাতায় পাতায়।

বুঝলাম না ওস্তাদ।

এই ব্যাটা ব্যাকল! তুই জানিসনে বাতাসও আমার ইকুমমতো চলে? সেই বাতাসই আমারে কইয়া গেছে। তয় বুঝে দ্যাখ আমার কতো খ্যামতা।

মনে মনে হাসি আর বলি, তোমার ক্ষমতা তো মোকছেদ। ওস্তাদের অসম্মান হয় গোমর ফাঁস করে দিলে। বরং তার ক্ষমতায় আমি অবাক হয়ে থেকে থেকে শেষে বলেই ফেলি,

ওস্তাদ, এবার আমার কেইসটা।

মনিব নিপাট ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের এক কথা। কোনো রকম গাঁইগুই নেই, এক টানে পকেট থেকে একটা খাম বের করে বলে,

নে, গুণে দ্যাখ।

আমি খামের মুখ খুলে চারটি পাঁচশ' টাকার নোট দেখেই আবার বন্ধ করে পকেটে রেখে মাথা নিচু করে বলি,

ওস্তাদ, যাই?

মাথা নিচু করার অবসরেই মনিব ঘুরে গেছে, বারান্দায় উঠে গেছে, আমার কথা তার কানে গেছে কিনা বুঝে ওঠার আগেই আমার কানে আসে,

সামনে আরেকটা বড় কাম আছে। টাইম আইলে কমুনে।

সেই কাম কখন এবং টাইমটা কখন আসবে জানবার আগেই মনিব ঘরের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। একবার মনে হয় মনিব আবার বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয়, হাশেম ও হাশেম্যা, এতো কৌতূহল ভালো নয়, সবুর, সবুর, সবুরে নাকি মেওয়া ফলে। তবু ধন্দ যায় না। মনিবের বাড়ির খামের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। কতক্ষণ? জানি নে। হাতে একটা আড়াইশ' টাকা দামের ঘড়ি আছে। কিন্তু ভুলে যাই ঘড়ি দেখতে, ভুলে যাই মনিব যদি দেখে আমি দাঁড়িয়েই আছি তাহলে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আখ ছেলার মতো ছিঁড়েও ফেলতে পারে। এসব বড় মানুষের মতিগতি বোঝা ভার। বরং চলেই যাই। আর ঠিক তখনই ভোতলা মোকছেদের গলা শুনি। ঠিক আমার কানের কাছে।

ভোদাইয়ের মতা খাড়ায়া রইছস ক্যান?

ও মোকছেদ! খাড়ায়া রইছি, ওস্তাদ কি য্যান আরেকটা কামের কথা কইলো, বুঝবার পারলাম না।

খ্যাক খ্যাক করে হাসে মোকছেদ। হাসি শুনে মনে হয় জীবনে এত মজার কথা সে শোনে নি। আরও মনে হয়, মনিব আমাকে দিয়ে যে কাম করাবে তা মোকছেদ জানে।

সময় হলিই জানবার পারবি।

তাহলি তুমি জানো। কি কাম?

কইলাম তো কওয়ার টাইম হয় নাই।

আমিও সময় বুঝে কথাটা ছেড়ে দিই।

মোকহেদ, তুমি ষ্টিলম্যান রফিকের বাড়ির সামনে ক্যান পলায়া আছিলি?

ধরা পড়ে মোকহেদ খাম করে চুপসে যায়। তার চুপসে যাওয়াই বলে দেয় ধরা পড়ুক সে চায় নি, আর ধরা পড়ার শাস্তিও যে কমসম হবে না তাও সে জানে। সামান্য অপরাধে কি কঠিন শাস্তি আরমান পেয়েছে, মুখ ফসকে একবার বেফাঁস কথা বলার জন্য পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়ার পর মনিব বিবেচনা করেছে, চোখ ট্যারা জ্বলিলে আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। বাড়িতে বসিয়ে জামাই-আদরে খাইয়ে-দাইয়ে জ্বলিল চলে যাওয়ার সময় বুঝতে পারে, এই তার জীবনের শেষ খাওয়া।

মোকহেদ আমার হাত জড়িয়ে ধরে। আমার হাতে ওর হাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, হাতের রঙে রঙে ঝড়ের কাঁপন, কাঁপনই বলে যায় ভাই হাশেম, হ্যাশেম্যারে, আমি আরমান হবার চাইনে, আমি এই খবিশ নমরুদ লোকটার চাকরিসিঁরি করি খালি এই প্যাটটার জন্য, ঘরে বৌ-বাক্কার জন্য। বিশ্বাস কর হাশেম, ভাই হাশেম!

হঠাৎ অনুভব করি আমার চোখের পাতায় পানির ভেজা। মোকহেদের অবস্থা যে আমারও। আমি যা করি তা ফকির-কাকরার চেয়ে কম কিসে। ফকিররাও তো প্রকাশ্যেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অভাব-দুঃখ প্রকাশ করে, পরকালে আল্লার রহমত, বেহেশতের লোভ দেখিয়ে পয়সা চাইতে পারে। কিন্তু আমি আবুল হাশেম আইএ ফেল, না পারি খোলা রাস্তায় ফকির সাজতে, না পারি চাকরি বাগাতে। টাকার অভাবে পারি না বড় না হোক মাঝারি গোছের ব্যবসা করতে। কি আছে আমার? কথা, শুধু কথা দিয়ে চিড়ে ভিজিয়ে চলা, তাও যদি চিড়ে ভেজে। আর এই মনিব লোকটি যে নমরুদেরও বাপ, তাও আমারও জানা। শর্বিনার পীরের হুকুম দেয়ার মাঝপথেই গলা কাটা শেষ, আপন ভাই যুদ্ধে গিয়েছিল বলে ভাবিকে হাসতে হাসতে খানদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছিল, এ কথাও তো আমি জানি। মোকহেদের হাতের কাঁপনে আমার এই কথাগুলোই বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু ওকেই-বা বিশ্বাস কি? যদি মনিবকে বলে দেয়। তখন আমার জ্ঞান বাঁচাবে কে?

কিন্তু আমিও মনে হয় সেরানা কন নই। আমার মনেও যে নিজের দুঃখ, মনিবের হারামিগনা আর মোকহেদের ভয় নিয়ে কথারা উথালপাথাল করছে, তার কিছুই বুঝতে না দিয়ে ভ্যাবলা হয়ে নিজেকে বললেও ওকে তনিয়েই বলি,

কামডার চেহারা-সুরত আগে একটু বুঝবার পারলে নিজেরে তৈয়ার করে নিবার পারতাম।

মোকহেদ যেন বুঝে নেয়, আমার দিক থেকে ওর ভয়ের কিছু নেই। এই বোঝাটাই কাজ দেয়। সরে আসে আমার গায়ের কাছে। ফিসফিস করে বলে, তোর এবারকার কামড়া আরেকটু কঠিন।

ছাঁৎ করে ওঠে আমার বুক। ষ্টিলম্যানের কাছে গিয়ে বাপের দেয়া জ্ঞানটা নিয়ে ফিরে এসেছি কিন্তু মার রক্তে দিনে দিনে মাসে মাসে বড় হয়ে ওঠা শরীরটা নিয়ে ফিরতে পারব কিনা সেই চিন্তা মুহূর্তে খাবো খাবো করে ধরে ফেলে। না দেখলেও আমি বুঝতে পারি, কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

মোকহেদও কম হারামি না। কপাল দেখেই ধরে ফেলে।

হ, বুঝছি। কামের আগেই তোর হালুয়া টাইট হওয়ার অবস্থা। কামে গেলে তো হাও-মুতু করে ঘর ভাসায়া দিবি।

সহসা আমার রাগ চড়ে যায়। ঋপ করে মোকহেদের বুকের জামা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে জামার দুইটা বোতাম পটপট ছিড়ে যায়, ওর বুকের ঘন লোম আমার হাতে তুলার বুরুশের আদর দিয়ে গেলেও ভোলবার বান্দা আমি নই। ঋপ ধরা ঝাঁকুনি হতে থাকলে মোকহেদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঝানিক ধতমত খায়, ঝানিক ঢোক গেলে, আমি স্পষ্টই দেখতে পাই, ওর মুখের কথারা জিভ আর ঠোঁটের ভেতরেই দাপাদাপি করছে।

বল শালা, কি কাম?

হাশে, হাশে...

মোকহেদ হাশের সঙ্গে যে ম আছে তাও মনে হয় ভুলে গেছে। আমিই মনে করিয়ে দেই।

এই চুতমারানি, আমি হাশে না, হাশেম। এখন তোর আজরাইল।

আমার আসল নাম না আজরাইলের নাম শুনে মোকহেদ যে পুরো হুঁশে আসে জানি নে, তবে সহসাই স্বাভাবিক গলায় বলে,

হাশেম, এই হাশেম্যা, আমার বুকির বাল খামচায়া ধরছিস কন্যা? ছাড়। ব্যথা লাগে।

বুকের চুল পশম না হয়ে উর্দু হিন্দি কেশ হয়ে যাওয়ায় আমারও হঠাৎই হাসি পায়। হাসতে হাসতেই বলি,

আসলে কামের কথা না কয়া তুই আগেই হাগা-মুতার কথা কইলি দেইখাই তো মাথায় রক্ত উইঠা গেছিল। তো ক কি কাম?

বিশ্বাস করুন, আসল কাজের কথা শুনে ওখানেই আমার প্যান্ট হলুদ ও ভিজে জবজবে হয়ে যাওয়ার অবস্থা। কি অসম্ভব কথা! ওই ষ্টিলম্যানের বোনকে পটাতে হবে? শুনেছি সে নাকি ডেঞ্জারাস মহিলা।

একবার এক চেনা রাজাকারকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে সে রিকশা থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। তিন-চারজন মিলেও তাকে ছাড়াতে পারে না। গলায় টিপটা

আর কয়েক মিনিট স্থায়ী হলেই তাকে সাদা কাপড়ে খাটিয়ায় কর্পূর ছিটিয়ে চারপাশে লোবান-কাঠি জ্বালিয়ে শুতে হতো। কোনোরকমে ছাড়া পেয়ে সেই রাজাকার শত শত গাড়ির মধ্যে দিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, সেই বাঘিনী মহিলার কাছে যেতে হবে মনিবের প্রস্তাব নিয়ে? তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও দেখতে তিরিশ-পঁয়ত্টিরিশের বেশি মনে হয় না, তো তাকে কি বলে পটাতে হবে?

মুহূর্তে আমার মাথায় শতেক চিন্তা সাইক্লোনের মতো ঘুরতে থাকে। নিজে বাঁচা, বৌ-বাচ্চা সংসার বাঁচানো, এসব কাজ স্বামী হিসাবে, বাবা হিসাবে আমি না করলে কে করবে-ভাবতে ভাবতে আমার শরীর তখনই ঘামে প্যাচপেচে হয়ে যেতে থাকে। আমার খুব তেষ্ঠা পায়।

মোকসেদ, মোকসেদ রে, আমারে এক গেলাস পানি খাওয়াবি?

ওড়ওড় করে হেসে ওঠে মোকসেদ।

ক্যান, কইছিলাম না? খালি হাও-মুতুর কথা শুইনাই তো বোম হইয়া গেলি। এখন দেখি তরে বাঁচানোই এক দায় হয় গেল।

তখনো গলায়ই বলি,

তোর মনিব আমার মনিব কি ছিল তুইও জানিস, আমিও জানি। সেই বেটি যে খাজরনী, সে তো মনে হয় আমারে উকুনের মতো টিঙ্কুস কইরা টিপ দিলেই আমি শ্যাব। এখন তুইই ক আমি ক্যামনে আগাই?

মোকসেদ আমার দিকে তাকিয়ে মনে হয় খেজুরের কাঁটা দিয়ে খোঁচাতে থাকে।

শোন হাশেম্যা, তর কাম কথা কয়া ভিজানো। আসল ভিজানো ভিজাইতে গেলে তোর জন্য আমারই ইন্সালিহাহ পড়তে হইব।

এটুকু বলেই মোকসেদ আমাকে একটা রাম ঝাঁকুনি মারে। ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট সনতে পাই আমার হাড়গোড়গুলো পটপট শব্দে জয়েন্ট থেকে খুলে খুলে বাচ্ছে। হিসহিস করে আবার বলে মোকসেদ, তুই না কথার রাজা! এখন দেখতাহি তুই প্রজাও না। বাঁচবার চাস তো লাইন একটা বার কর। আমি এখন যাই। দেখি মনিবের আর কোনো কামটাম আছে কিনা।

দশদশ করে পা ফেলে সেই যাত্রার রাজার মতোই মোকসেদ মনিবের অন্দর মহলে ঢুকল।

আফ্রাহর অশেষ রহমতে আমি এখন সেই টিলম্যানের ছোট বোনের সামনে। টিলম্যান আমার কাছে এখন আর বিষয় নয়। ওখানে আমার কাজ শেষ। এবারে নতুন খেলা। খাজরনি বোনকে পটানো। পটিয়ে মনিবের হাতে তুলে দেয়া। মোকসেদের কাছেই শুনেছি মনিব তার সঙ্গে একবার, শুধু একবার শোবে। মনিব এই ইচ্ছা পূরে রেখেছে সেই একান্তর থেকেই। কারণও আছে। মনিবেরই ডান হাত ককিল এখন হিজড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। ককিল বাপে পেয়ে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু ও যদি জানত খাজরনির হাতের আড়ালে ধারালো ব্রেড আছে, তাহলে কি এগোয়?

যেন আপসে রাজি হচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে কায়দামতো শুধু একটা খ্যাচ, কফিল হিজড়া হয়ে গেল। মনিবের ডান হাতের ওই অবস্থা দেখে মনিব শুধু বলেছিল, তুই ভাবিসনে কফিল, দিন আইলে আমি বাঁও হাত দিয়া শোধ নিমু। সেই শোধ নেয়ার রাস্তা বানানোর জন্য আমার ওপর ভার, এবার টাকার পরিমাণ আরও বেশি। ট্যাকা? ট্যাকা-পয়সা তো পেশাবের ফেনা, হাতের ময়লা। সারাজীবন মানুষেরে কমু ষ্টিলম্যানের বইন আমার কাছে শুইছিল। কথাগুলো মনিবেরই। বলেছিল আমাকে। মনিবের সুখ আমার সুখ, এই নিয়ামতেই খাণ্ডারনির মুখোমুখি দাঁড়াতেই দেখি তার চোখে এক মুগ্ধ দৃষ্টি, চোখের পাতা না ফেলে আমাকে দেখছে তো দেখছেই! এ শালার কি ফ্যাসাদে পড়লাম। মাগি অমন করে তাকায় কেন? চোখ দিয়েই ইন্সালিদ্ধাহ করবে নাকি? তখনও জ্ঞান গম্যি গুলিয়ে খাইনি বলে গলায় ভেজাভেজা দানা নিয়ে বলি,

আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।

আমার কথা শেষও হয় না, খিলখিল করে হেসে ওঠে খাণ্ডারনি।

তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন।

তুমি।

আমার স্বগতোক্তি শব্দ করেই বেরোয় বলে খাণ্ডারনি খলবলে হাসি দিয়ে বলল, তোমাকে তুমি বলব না তো আপনি বলব? ও শানু, শুনে যা, শুনে যা তোর বাবা কি বলে।

এখন দেখি আরেক ডিগ্রি বেশি। প্রথমবারই তুমি বলার সময় আমার গা শিরশির করে উঠেছিল, এবার বাবা শুনে তলপেট মনে হচ্ছে অস্থির হয়ে উঠে বোয়াল মাছের ঘাই দিচ্ছে, মুহূর্তে মনে ঢেউ খেলে যায়—গুটি মারি মনিবের, আমি তো আগে খেলে নিই! খাণ্ডারনি এই বয়সেও কি ফিগারখান ধইরা রাখছে, উহু হুঁ হুঁ হুঁ, মনে লয় তুলার বালিশ তুপতুপা, কি মজাটাই না হইবো রে, আয় মেরি দিল কাঁহি আউর চল, আ যা মেরি দিল! আমি একটা হাত বাড়িয়ে আ যা প্রকাশ করার মুখেই শানু না ফানু দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

মা, মা, তুমি বাবা না কি যেন বললে?

হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক সে রকমই!

শানু না ফানু সহসা চরাচর কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে।

না মা, না!

আর খাণ্ডারনি মেয়ের চিৎকার কি যে হয়ে যায়, মেয়ের চেয়েও বেশি গলায় চেঁচিয়ে ওঠে,

তুমি! তুমি না মরে গেছ? তোমার গা দিয়ে কর্পূর লোবানের গন্ধ বেরোচ্ছে যে!

ও এবং ওরা

এই পাড়ার একমাত্র সবচেয়ে উঁচু বাড়ি নিয়ে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ মাতামাতি হয় নি। শুধু একবার বছর তিনেক আগে চারতলা ও একতলার সাহেব ও বেগম সাহেবের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ওইসব কাজের বুয়া-বেটিদের কল্যাণে কানাকানি হলেও তা বেশিদূর এগোতে পারে নি। কারণ হিসেবে দুইটি কারণ বেশ শক্তিশালী ছিল। একতলার সাহেবের ছিল প্রচুর টাকা আর চারতলার বেগম সাহেবের চারটে ভাইকেই ইউনিভার্সিটির মাথা মাথা লোকগুলো ভয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। পাড়ার লোকগুলো এ খবর ভালোভাবেই জানে। একতলার এমরান সাহেব যোগ চারতলার শাহনাজ সাহেবার নামে পাড়ার দেয়ালে যেদিন লিখন দেখা গেল, ঠিক তার দুদিন পরেই দুটো বিশাল বিএসএ মোটর সাইকেলে পাড়া কাঁপিয়ে চার যুবক পাড়ার মাঝখানে এসে আকাশের দিকে গলা তুলে চিৎকার করে বললো, কোন খানকির বাচ্চা দেয়ালে এসব কথা লিখেছে?

যে লিখেছে সে তখন চার যুবকের হাতের নাগলের মধ্যেই, কিন্তু দেখা গেল সেই সবচেয়ে হুঁতুপি করে দেয়ালের লেখককে পেলে শুধু খুনই করবে না, তার পরিবার-আপনজন সবসুখ দুনিয়া ছাড়া করতে না পারুক দেশ ছাড়া যে করবেই এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে বললো, ভাই, আমি দায়িত্ব নিলাম, সেই বেজন্মাটাকে খুঁজে বের করবোই। চার ভাইয়ের দ্বিতীয়টি একটু বেশি গাটাগোটা। বাম হাতে ঠিলের বালা, গলায় ঠিলের চেন, সেই চেন গলা থেকে টেনে বের করলে দেখা গেল ওটা দুই ভাঁজে ছোট দেখা গেলেও আসলে বেশ বড়। ওটা যে একটা ছোট চিকিৎসার অস্ত্র তা হাতে নিয়ে নাচানো দেখেই বোঝা গেল। বড় অস্ত্রের চিহ্ন তো কোমরে স্পষ্ট। চেন নাচানোর সময় সে অন্যমনস্কভাবে ওটা বারদুয়েক নেড়েচেড়ে দেখে।

দেয়াল লেখকের নাম রনজু। রনজুও অন্যমনস্কভাবে বড় অস্ত্রটি দেখে নেয়। যদি প্রমাণ হয় দেয়ালের কাজ আসলে তারই, তাহলে ওটার ব্যবহার যে দিনেদুপুরে লোকজনের সামনে হতে পারে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ইউনিভার্সিটিতে এই মেজোটিরই বেশি নামডাক। চেন হাফিজ বললে সবাই দ্রুত বিএসএ মোটর সাইকেল ঠিলের বালা ও গাটাগোটা শরীর বাহ্যিক কথা একবারে বলে দেয়। রনজু চোখ কাত করে প্রমাণগুলো একবার দেখে নিয়ে ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে গেলেও মুখে কিছুই প্রকাশ না করে মনে মনে শুধু বলে, শালা শুয়োরের বাচ্চা, তোর বোনই যে আসলে একটা আস্ত খানকি সে খবর রাখিস?

চেন হাফিজ রনজুর কাঁধে বাম হাতটি ঝপ করে রেখে দিলে বালার আঘাতে সে একটু কঁপে ওঠে।

সরি, সরি ভেরি সরি।

ব্যথাটা গিলে ফেলে বলে রনজু,

না না হাফিজ ভাই, লাগে নি।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হাফিজের মুখ। ডান হাতের তর্জনীতে চেনটি নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে বললো,

আপনি আমাকে চেনেন নাকি?

কি যে বলেন হাফিজ ভাই। আপনি হচ্ছেন ইউনিভার্সিটির একটা জুয়েল। আপনাকে চিনবো না? আপনার মতো একজনও যদি আমাদের পাড়ায় থাকতো তাহলে কাউকে কেয়ার করতাম নাকি?

অলরাইট, অলরাইট। তো এখন কথা হচ্ছে এই সব আজীবাজে কথার একটা বিহিত হওয়া দরকার। অন্য পাড়া থেকে এসে এসব বোঝাপড়া করাও ভালো দেখা যায় না, কিন্তু দরকার পড়লে করতেই হবে।

এমন সময় চারতলা থেকে ডাকে শাহনাজ।

আজিজ হাফিজ, উঠে আয়। ওইসব ছোটলোকের সঙ্গে অতো কথা কিসের?

যাই, গ্রাউন্ড ওয়াকটা সেরে আসি। তুমি চা বসাও।

ঘাড় তুলে আজিজ জবাব দিলে চারতলার ঘিলের আড়াল থেকে বোন শাহনাজের মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

শাহনাজ চারতলা থেকে পাড়ার মানুষদের ছোটলোক বললে সাততলার সামনের তিনতলা বাড়ির মালিক আমজাদ সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন,

উনি, উনি কি বললেন?

আজিজ তখন একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলো। আমজাদ সাহেবের প্রশ্নে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পায় সামনেই বয়স্ক একটি মানুষ রাগে কেমন কাঁপছে। সিগারেটটা ধরায় না আজিজ, বরং সামনে দুই পা এগিয়ে এসে তার বাপের বয়সী লোকটির কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বলে,

আপনি মুক্কি মানুষ, আপনি বরং ঘরে যান।

ঘরে যাবো মানে? আপনি বলবেন তারপরে যাবো?

আহ্‌হা, চাচা, এসব ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার।

চাঁচিয়ে ওঠেন আমজাদ সাহেব,

ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপার হোক আর যাই হোক, পাড়ায় সব আজীবাজে কাণ্ড ঘটবে, আর আমরা মুখ বুজে তাই দেখবো?

এবারে হাফিজ আমজাদ সাহেবের একেবারে বুকের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার গাটাগোটা শরীর গরম নিশ্বাসের সঙ্গে আরো যে ফুলে ফুলে উঠছে তা কয়েক হাত দূর থেকে দেখেও বলে দেয়া যায়। তার শরীর শুধু ফুলে ফুলেই উঠছে, কিন্তু মুখে

কোনো প্রকাশ নেই। ঠাণ্ডা চোখে সে আমজাদ সাহেবের মুখের প্রতিটি রেখা, পাকা দাড়ির প্রত্যেকটি গোড়া খুঁটে খুঁটে নিরীক্ষণ করতে থাকলে পরিবেশের সমস্ত বাতাস যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। উপস্থিত পাড়ার সমস্ত বাসিন্দা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে চেন হাফিজ হঠাৎ কোন মূর্তি ধারণ করে। কিছু অসম্ভব নয় সে কোমরে হাত দিয়ে ঝপ করে বড় অস্ত্রটি বের করে বয়স্ক আমজাদ সাহেবের বুকে চেপে ধরতে পারে, হয়তো ট্রিগারটা টেনেও দিতে পারে। এতো বড়ো কাজটি না করলেও ধুম করে একটা ঘুঁষি লাগিয়ে দেয়া তার জন্যে অতি সহজ ব্যাপার, প্রতিপক্ষ বাপের বয়সী কি ছেলের মতো তা বিচার বিবেচনা তার নেই। আমজাদ সাহেবের শরীর তখনও কাঁপছে। কিন্তু কিছুই করে না হাফিজ। শুধু অবিচল গলায় বলে,

বয়স বেশি বলে বেঁচে গেলেন।

আমজাদ সাহেব বলতে যাচ্ছিলেন বয়স কম হলে কি করতে, কিন্তু তার আগেই হাফিজ ভাইদের দিকে ঘুরে ছকুমের গলায় বলে, চল, চল, চা মনে হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কথার রেশ শেষ হওয়ার আগেই চার ভাই চারতলার দিকে পা বাড়ালে দলের সবাই চারজনের যাওয়া দেখে, যেন একটা অখণ্ড আতঙ্ক হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমজাদ সাহেব বিড়বিড় করে শুধু বলেন, এরা কারা?

বিড়বিড় করে বললেও কথাটি শোনে রনজু। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, চাচা, ওরা ওই চারতলার মতিন সাহেবের ওয়াইফের ভাই।

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দেন আমজাদ সাহেব,

সে জানি। কিন্তু ওরা আসলে কারা?

এই একটা প্রশ্নই বারবার করতে করতে আমজাদ সাহেব নিজের বাড়ির দিকে এগোতে থাকলে দল পাতলা হয়ে যায়, একসময় দুটো মোটর বাইক দুই পাশে হ্যাভেল ছড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

পাড়ায় তেমন লোকজন নেই, সমর্থ মানুষেরা অফিসে গেছে, রুজি রুটির ধান্দায় বেগিয়ে পড়েছে, কেউ কেউ পেছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে। তখন আকাশ ভেঙে রোদ নামছে। শাহনাজের বাড়ির জানালা ভেদ করে ইংরেজি গানের চিৎকার রাস্তায় আছড়ে পড়লে আমজাদ সাহেব আবার চারতলার দিকে মুখ তুলে নিজেকেই প্রশ্নটি করেন, এরা, এরা কারা? দুপুরের নিস্তকতা পাড়ায় ভেসে বেড়ায়। কিন্তু আমজাদ সাহেব কান পেতে শোনেন পাড়াময় সেই প্রশ্ন, এরা কারা? তাঁর ওই প্রশ্ন শুনতে শুনতে আর ঘরে বাওয়ার কথা মনে থাকে না।

আজিজ হাফিজরা বোনের বাসা থেকে চা নাশতাপানি সেরে সিঁড়ি কাঁপিয়ে নিচে নেমে এসে দেখে বড়ো আমজাদ সাহেব তখনও তাদের গাড়ির কাছে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখে অবাক হয় আজিজ,

কি চাচা, আপনি এখনও ঘরে বান নি?

যাইনি তা তো দেখতেই পাচ্ছে।

পাচ্ছি। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের নিয়ে আপনার এতো মাথাব্যথা কেন?
তোমাদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি শুধু ভাবছি তোমরা কারা?
হাফিজের হঠাৎ মনে হয় বুড়োর সঙ্গে একটু মজা করা যায়। সে মুহূর্তে নিজেকে
আমজাদ সাহেবের নাতি কল্পনা করে মাঝোমাঝো গলায় বলে,

নানা, এই বয়সে অতো ভেবে নানিকে তাড়াতাড়ি বিধবা বানানো কি আপনার
উচিত হচ্ছে?

চোপরাও অসভ্য জানোয়ার! মুরব্বির সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না?
আমজাদ সাহেবের এই মাটি কাঁপানো ধমকেও হাফিজের মধ্যে কোনো ভাবান্তর
দেখা যায় না, বরং তার রসিকতা করার ইচ্ছে আরো দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। সে আমজাদ
সাহেবের দাড়িতে হাত বুলিয়ে জবাব দেয়,

সময়, নানা, সময়। এখন আমরা নাতিরা রসিকতা করবো, আমাদের নাতিরা
আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি মারবে, এই তো নদীর খেলা। কেন শোনে ননা, নদীর একূল
ভাঙে, ওকূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা?

ওহে ছোকড়া, একটা খাপ্পড়ে তোমার দাঁত খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

তাহলে নানা, তাহলে আমি যে আপনার দাড়ি ধরে খুলে থাকবো!

ঠিক তখনই চারতলা থেকে শাহনাজের গলা শোনা যায়। আজিজ, হাফিজ,
তোরা এখনও যাস নি?

যাচ্ছি বুবু। যাচ্ছি। যাওয়ার আগে নানার সঙ্গে একটু রঙ্গ রসিকতা করে নিই।

স্টপ! স্টপ দোজ সীলি জোকস। গেট লস্ট।

হাফিজদের ইচ্ছে ছিল আমজাদ সাহেবকে নিয়ে আরো কিছুক্ষণ খেলে। কিন্তু উপর
থেকে বোনের চলে যাবার নির্দেশ এলে চার ভাইই তা মেনে নিয়ে মোটর সাইকেলে
ভটভট শব্দ তুলে যাওয়ার আগে বলে, টা টা বাই বাই, নানা, আবার যেন দেখা পাই।

চোখের পলকে আগের মতোই পাড়া কাঁপিয়ে চার ভাই চলে গেলে আমজাদ
সাহেবের মনে হয় অনেক দিন থেকে জুরে ভুগে ভুগে তার চলার শক্তি একেবারেই
লোপ পেয়ে গেছে। তিনি আবার চারতলার শাহনাজকে দেখার জন্যে চোখ তুলতেই
দেখলেন সাততলার জানালায় একটি মুখ তাকে খুব মনোযোগে নিরীক্ষণ করছে।
দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে যায় আমজাদ সাহেবের বুক। কে? কে ওই লোক?
সাততলার ওই বাসিন্দা কে? তিনি চোখ না নামিয়েই চিৎকার করে ডাক দেন,

এই যে শুনছেন?

সাততলার নিরীক্ষণ আমজাদ সাহেবের মুখের ওপর থেকে চোখ না সরালে তার
মনে হয় ওই ব্যক্তির কানে এই যে শুনছেন প্রশ্ন পৌঁছায় নি। তিনি আবার ডাক দেন,

এই যে শুনছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে বলছি। শুনছেন আমার কথা?

সাততলা কোনো জবাব দেয় না, কিন্তু আমজাদ সাহেবের মনে হয় সে তার কথা
শুনছে। তিনি তখন চোঁচিয়ে বলেন,

নেমে আসুন। শুনে যান ওই ছেলে-ছোকরারা আমাকে কি রকম অপমান করে গেল।

আমজাদ সাহেব কথাগুলো এতো চোঁচিয়ে বলেন যে আশপাশের আরো দুই চারটি পাড়ার বধির লোকও শুনতে পারে। কিন্তু সেই লোক শোনে না। সে যে চোখে নিরীক্ষণ করছিল, সেই চোখেই নিরীক্ষণ করে যেতে থাকলে সহসা বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে আমজাদ সাহেবের। লোকটির চোখ দুটো পাথরের চোখ মনে হয় তার কাছে।

আর ঠিক তখনই শোনেন পাশ থেকে রনজু ডাক দিলো,

চাচা, আপনি ওপর দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন?

কে, রনজু? রনজু, দেখেছো, সাততলার ওই লোকটি আমার দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে।

আমজাদ সাহেবের কথায় রনজুও সাততলায় তাকায়। কোথায় লোক? সাততলা তো ফাঁকা। সে অবাক হয়ে বলে,

চাচা, আপনি সাততলায় লোক দেখছেন কোথায়?

কেন, ওই তো জানালায় একটি মুখ।

কি আশ্চর্য! আমি তো কিছু দেখি না।

তুমি দেখো না! কিন্তু আমি তো দেখি। আমি স্পষ্ট দেখছি ওপর থেকে ওই লোক আমাদের ঠিকই দেখছে।

হেসে ফেলে রনজু। বেশ মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়েই হাসে অনেকক্ষণ ধরে। তার মনে হয় এই বয়সে পাড়ার এই বয়স্ক মানুষটির চোখে ঠিক ছানি পড়েছে, মানুষটির মাথার কোনো গুণ্ণগোল দেখা দিয়েছে, মানুষটির বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। সে আমজাদ সাহেবের একটি হাত ধরে তার বাসার দিকে এগিয়ে নিতে নিতে বলে,

চাচা, আপনার শরীরটা মনে হয় ভালো নাই।

তোমার ভুল ধারণা রনজু। শরীর আমার ঠিকই আছে, মাথায়ও কোনো গুণ্ণগোল নেই, চোখেও আমি ঠিকই দেখি।

চাচা, আপনার সব কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু মুশকিলটি হচ্ছে আপনি যা দেখেন তা তো আমি দেখি না।

একটা বড় শ্বাস পড়ে আমজাদ সাহেবের। তার শুধুই মনে হয় এই সময়ের এই বয়সের ছেলেরা দেখেও কেন সবকিছু দেখে না। এদের চোখে এতো অসুখ কেন? তিনি বিড়বিড় করে বলেন,

ওরা কারা? কারা ওরা?

কার কথা বলছেন চাচা? ওই চারজনের কথা বলছেন?

কে ও? ও কে?

বুঝতে পারছিনে কার কথা বলছেন আপনি।

সহসা দুপুরের নিস্তক্কতা খানখান করে পাড়া কাঁপিয়ে চিংকার করে বলেন আমজাদ সাহেব,

তাহলে কি চোখ বন্ধ হলে বুঝবে?

আগে গেলে বাঘে খায়

হ্যারে নূরজান, কতোদিন পর বাড়ি যাইতাছি রে?

নূরজাহান হাঁটছিল আগে আগে। পেছনে দাদি। বেশ পেছনে। বিশ-পঁচিশ হাত না হোক, দশ-পনেরো তো হবেই। নূরজাহান দাদির পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে সে অনেকবারই চেষ্টা করেছে, কিন্তু একসময় না একসময় দেখে সে হাঁটছে বেশ আগে, দাদি ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। সে থামে। দাদি এসে তার সাথে না ধরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় শ্বাস টেনে দম নিয়ে নেয়, দাদি এলে আবার সমান তাল ফেলতে ফেলতে কখন যেন অসমান হয়ে যায়।

দাদির কথার শব্দ বাতাসে ভেসে এসে সে হাঁটা থামিয়ে বলে,

কি কইলা?

দাদি এগিয়ে আসতে আসতেই বলে,

জিগাইছিলাম কতোদিন পর বাড়ি যাইতাছি রে?

মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে নূরজাহান।

তার আমি কি জানি? আমি কি কোনোদিন বাড়িত গিছি?

ঝামটার ধাক্কায় দাদি ধেমে যায়। নূরজাহান কথা তো মিথ্যা বলে নাই। বাড়ি ছেড়ে নূরজাহানের বাপ-মা, দুই চাচা, দাদি, তার বড় ভাই যখন ঢাকা শহরে পাড়ি জমায় তখন তার বয়স দেড় না পৌনে দুই, 'ও দাদি আমার বয়স তখন কতো' এরকম একটা কথা সে জিজ্ঞেস করেছিল গেল সনে, তখন দাদি উঁ উঁ করে মনে করে জবাব দিয়েছিল, 'তুই তখন হাঁটতে পারিস, তয় ভালো কথা ফোটে নাই।' যার কথাই ফোটে নাই, কথা ফোটোর পর বাড়ি যায় নি কোনোদিন, সে কি করে বলবে কতোদিন পর তার দাদি বাড়ি যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকায় দাদি। পানের কষে কষে তরমুজের বিচির মতো দাঁত বের করে হাসেও একগাল। তার নূরজাহানের তো তখন বোঝারই বয়স হয় নি, তখন তো তার কোলে-বিছানায় হাগা-মুতার বয়স।

নূরজানরে, তুই ঠিকই কইছস। আমার এখন সব কথাটোকা বেবাক গুলায়া যায়।

দাদির কথায় চিপ করে হাসে নূরজাহান। তার বুদ্ধি ধীরে ধীরে দানা বাঁধার সময় থেকে শোনা কথা ও দেখা বিষয় সে কখনও স্পষ্ট কখনও ঝাপসা মনে করতে পারে, কিন্তু শিশুকাল যে মানুষের জীবনে একেবারে অন্ধকারের আবরণে জড়ানো একসময়

তা সে কেন, দাদিও জানে, সব মানুষই জানে। তাও দাদির এই প্রশ্নের মধ্যে একটা শিশুটি আছে বুঝতে পেরে নূরজাহান খুব ভালোভাবে নিরিখ করে দাদিকে, দেখলো বুড়ির মুখের কোষে কোষে খুশিরা ওই শিশুদের মতোই দুরন্তপনা করে বেড়াচ্ছে।

দাদি, বুঝছি, বাড়ি যাওয়ার খুশিত তুমি আগাপাছ সব ভুইলা গেছো।

কথা মিছা কস নাই। আমার যিনি সব নতুন নতুন লাগতাকে। মনে হচ্ছে কি জানিস? মনে হচ্ছে তোর দাদার সাথে নিজির বাড়িত যাচ্ছি।

দাদির কথা শুনে খোলা রাস্তাতেই খিলখিল করে হেসে ওঠে নূরজাহান। এক বুড়ি ও তার নাতিটাতিই হবে বয়সের একটা মেয়েকে নিয়ে রাস্তার মাঝপথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখে পথের লোকেরা কিছুই মনে করছে না, কিন্তু খিলখিল হাসি জনাতিনেক লোককে থামিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে একজন আবার চোখ কুঁচকে নূরজাহানকে দেখতে থাকলে নূরজাহান তা না দেখেও বুঝতে পারে তার গায়ে চোখের খোঁচা লাগছে। সে হাসি থামিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকায়। চোখ দিয়ে খোঁচা মারা লোকটি নূরজাহানকে আলপিনের চোখে তাকানো দেখে সহসা ভালো মানুষ হয়ে জিজ্ঞেস করে,

তোমরা, তোমরা কারা?

তাতে তোমার কাম কি?

ঝাঁঝালো গলায় নূরজাহান উল্টে প্রশ্ন করলে লোকটি আরও ভালো মানুষ হয়ে জবাব দেয়,

না, মানে, তোমারে তো এই গাঁর মানুষ মনে হয় না। কোনোদিন তো দেখি নাই। তা তোমরা, কোনে যাবা?

জবাব দেয় দাদি,

আমরা যাবো হরিতলা।

হরিতলা! সে তো এখনও অনেক পথ।

নূরজাহান বিশ্বাসই করতে পারে না তার সত্তর বছরের বুড়ি দাদি গলায় হঠাৎ তিরিশ বছরের জোর পেল কোথায়। সে সোজা দাঁড়িয়ে হাসিনা-খালেদার মতো আঙুল তুলে বলে,

এই ছাঁড়া আমারে তুমি রাস্তা চেনাও? বুড়ি হইছি বলে ভাবিছেও আমি সব ভুলে গিছি, আমি কিছু চিনিনে? এই গাঁর নাম খয়েরসুতি, তারপরে দোগাছি, তারপর খরবাগান, ভাঁড়োলা, তারপরই তো হরিতলা। হাঁটুর সমান বয়স না, সে আয়ছে আমাক রাস্তা চিনাইতে।

চোখ কুঁচকানো নিজের মধ্যে আরও কুঁচকে যায়, কিন্তু তার মধ্যেও দাদি ও নূরজাহান লক্ষ করতে তোলে না সে তখনও কোঁচকানো চোখ দিয়েই নূরজাহানের গোটা শরীর মাপামাপি করছে। কেঁপে যায় নূরজাহানের শরীর, ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত দাদির গা বেয়ে নামতে থাকলে নূরজাহানই বলে,

দাদি, দাদি, পা চালাও।

হ্যাঁ, চল।

ধাঁই ধাঁই করে হাঁটা দেয় দুজন। রাস্তার লোকগুলো দুইকালের দুটি মানুষকে একই গতিতে হাঁটতে দেখে থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। যেতে যেতেই দাদি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো মানুষ কয়টি তখনও হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

দাদি, ও দাদি! আর কতো দূর?

আর বেশি না। পা চালা, এই তো আসে পড়িছি।

হঁ আসে পড়িছেও। তুমি না কি কি সব গাঁর নাম কলে, তারপর হরিতলা, তাহলি কেমনি করে আসে পড়িছ্যাও?

ভুল কই নাইরে নূরজাহান, ভুল কই নাই। চালা, পা চালা।

নাতনিকে পা চালাতে বললেও দাদি ঠিকই বোঝে, অনেক পথ হাঁটার অভ্যাস তার নূরজাহানের নেই। ঢাকা শহরের এক ঘিঞ্জি বস্তি থেকে নূরজাহান, নূরজাহানের মার গার্মেন্টস কারখানায় যেতে পনেরো-বিশ মিনিটের বেশি লাগে না। সেই যাওয়ার দুরত্ব বস্তির সামনে দুই চক্কর দিলেই তো শেষ, নূরজাহান এতো লম্বা পথ তো কখনও হাঁটে নি।

আমি বুঝতিছিরে নূরজাহান, তুই এতো পথ হাঁটিস নাই।

ক্যান, কুরবানির গোশতের জন্যি তো একবেলায় কতো পাড়া গিছি।

তা গিছিস। কিন্তু সে যাওয়া, আর এই যাওয়া এক নারে, এক না।

দাদির এই জবাবে নূরজাহান বোঝে কথাগুলো বলতে কষ্টরা তার গলা আটকে আটকে ধরছে। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। যে আশা তার সস্তর বছরের বুড়ি দাদিকে যৌবনে ফিরিয়ে নিয়ে পায় গতি দিয়েছে, সেই আশা পূরণ হবে বলে শোনাশোন কথা কানে এসেছে, তখন না গিয়ে হাত-পা ছেড়ে কবরের মতো ঘরে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পড়ে থাকে আর তাজা বিষ হাতে তুলে খাওয়া একই কথা। নূরজাহানের মনে হয় দাদির পায়ের গতি যেন একটু বাড়ছে। আরেকটু বাড়লো।

ও দাদি! দাদি!

কি?

তোমার জমি তো দৌড়ায়ে পলাচ্ছে না।

ধমকে যায় দাদি। নূরজাহানের মুখের দিকে খানিক স্থির চোখে তাকিয়ে বলে,

না পালালিও তাড়াতাড়ি না গেলি যদি রাগ করে!

নূরজাহান আগের মতোই খিলখিল করে হেসে উঠতে গিয়েই থেমে যায়। তাকায় আশপাশে। না, কোনো পুরুষ মানুষ নেই। সাথে সাথেই মনে হয় চোখ দিয়ে খোঁচানো লোকটির চোখের কথা, ওরকম চোখ সে তাদের বস্তির বছির কোবাদ লালু কিয়ামুদ্দিনের চোখে দেখেছে, কিন্তু ওই চোখ পর্যন্তই। গা ফুটে বয়স বেরুলে লোকের চোখকে দোষ দিয়ে লাভ কি জেনেও নূরজাহান মনে মনে যতোগুলো গা বেঁধে গাল আছে সবগুলো দিয়ে হাসতে হাসতে বলে,

তোমার জমি কি মানুষ যে রাগ করবি?

দাদি এবারে থমকে নয়, থেমেই যায় পুরোপুরি। নূরজাহানের খুতনিটা ধরে
আদর আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে,

জমির রাগ মানষির চায়েও বেশি। আদর না পালি ঠিক পলা যায়।

ক্যান, দাদা কি জমিক আদর করতে না?

করতে রে, করতে। আমার চায়েও জমিই ছিলে তার বেশি আপন। সেই জমি
পর পর দুই বছর ভালো ফসল দিলে না, তখন তোর দাদা কি করলে জানিস?
গালাগাল করলে লাখি মারলে, বেচে দেবো বলে ভয়ও দেখালে। কিন্তু জমি তখন
কিছুই কলে না। পরের বছর, হেঁ ঠিক পরের বছর, কি কবোরে নূরজাহান, জমি
একদিন ভুস করে পদ্মার মধ্যি ডুব দিলে। আমরা চোখের মণি ফাটায়ে দেখলেম,
পদ্মা কেমন করে খাবো খাবো করে আগায়ে আসলে, গিলে খালে আর তাই দেখে
তোর দাদা নদীর কিনারেই ওই যে শুয়ে পড়ে বুক চাপড়ালে, মাটিত কপাল ঠুকলে,
কিন্তু আর উঠে দাঁড়ালে না, কোনোদিনই না। সহসা মনে হয় নূরজাহানের, তার দাদি
দাদার মতোই যদি এখানে মাথা ঠুকতে থাকে, মাথা ঠুকে ঠুকে আর উঠলো না, তখন
তার আপন জেলা হলেও সে কোনোদিন দেখেনি, এটা তার কাছে বিদেশে বিড়ুই ছাড়া
আর কিছুই নয়; তখন, তখন সে কি করবে? আর তখনই সে দাদিকে জাপটে ধরে।

দাদি! দাদি!

না, আমার কিছু হয় নাই রে, আমার কিছু হয় নাই। আমি মরবের চাই তোর দাদা
যেখানে শুইছিলে, আল্লা যদি বরাত রাখে, সেখানে শোবো, কিন্তু আগে আমি চোখ ভরে
দেখবের চাই পদ্মা আমার জমি আমাক ফেরত দেছে। দেখলিই আমার শান্তি।

পদ্মায় চর জেগে নূরজাহানের দাদার জমি তো ফেরত দিয়েছেই; আরও দিয়েছে
আফিলুদ্দিন, বয়েন মোল্লা, কাজেম, শহের আলী, আকাস, ময়েজ, রিফাতুল্লা, জব্বার
মুন্সির জমি। তাদের ওয়ারিশরাও এখন জমি ফিরে পাওয়ার আশায় ছুটতে শুরু
করেছে হরিতলায়।

ও দাদি, আফিলুদ্দিন চাচা, জব্বার মামুরা কি এতোক্ষণ পৌঁছা গেছে?

গেছে মনে হয়।

দাদি, আমরা তো সব একসাথেই আসলেম, কিন্তু ওরা সব আগে চলে গেল,
আমাদের জন্যে একটু দাঁড়ালেও না!

না দাঁড়ালে তো বয়েই গেল!

হাসে নূরজাহান।

দাদি, আমার মনে হয় ওরা ভাবেছে আগে গেলি আগে পাওয়া যাবি।

খিক করে হেসে উঠলো দাদি।

শোন, আগে গেলি বাঘে খায়, পাছে গেলি সোনা পায়। আমরা পাছে যাবি,
আমরা সোনা পাবো।

যেতে যেতে হাসতে হাসতেই বলে নূরজাহান,
সোনা পালি তুমি আবার গয়না বানায়ে নিকে পুষো।

ওরে মাগি, আমার কথা কয়ে নিজের বিয়ের কথা মনে করিয়ে দিলি, আমি কি
বুঝিনে? হবি রে হবি, সব হবি, সব, সব!

শেষের সবগুলো শব্দগুলো মনে হয় দাদি গিলে গিলে উচ্চারণ করছে। গিলে
গিলে বললেও নূরজাহান বাতাসের গায় কান পেতে শুনতে পায়—জমি ফিরে পেলে
বাড়ি হবে, ফসল হবে, উঠোনে ধান কলাই মসুর জমবে, বাড়ির সীমানায় কলার
গাছে কাঁচাকলা সবরি কলার কাঁদি নামবে, গোয়ালে গরু না থাকলে বাড়িই মানায়
না, গরুর দুধ হাটে যাবে, শীতে পিঠে হবে, ধান হওয়া মানেই তো মুড়ি-চিড়া, আরো
কতো কি, তখন!

ওরে নূরজাহান, দেখিস কতো ছ্যাড়া তোক বিয়ে করার জন্য বাড়ির আশপাশ
দিয়ে ঘুরঘুর করবি; দেখিস, দেখিস আমার কথা ফলে কিনা, না ফললি আমার নামে
কুস্তে পুষিস।

দাদি, তোমার কথা শেষ হয়েছে?

কোনো কথা রে?

ওই যে সব, সব!

খুব বড় একটা শ্বাস পড়ে দাদির। নূরজাহানের মনে হয় শ্বাসের বাতাসে উড়ে
যাবে, সে বাতাস আঁকড়ে ধরেই স্থির দাঁড়িয়ে যায়। দাদির মনের উত্থালপাতাল সে
অনুভব করে ভীত গলায় ডাকে,

দাদি, ও দাদি!

ক। শুনতিছি!

পাছে গেলি আমরা সোনা পাবো?

পাবো।

সত্যি সোনা দাদি, সত্যি সোনা?

ঘুরে দাঁড়িয়ে, নূরজাহানের সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে হিসহিস করে বলে,

সত্যি না তো মিথ্যে?

কিন্তু দাদি, যারা আগে গেছে তারাও তো সোনা পায়ে যাবের পারে!

তাহলি বাঘ বসে রয়েছে কি কামে? যাক আগে পাবি, তাকই খাবি।

দাদি, বুঝলেম। কিন্তু বাঘ খায়ে তার যদি খিদে আরও বাড়ে যায়?

দূর মাগি, খাওয়ার পরও খিদে বাড়ে মানষির, জন্তু-জানোয়ারের না। প্যাট ভরা
থাকলি মানুষ বাঘের গলা চুলকে দিয়ে গেলিও বাঘ কিছু কয় না।

দাদি, বুঝলেম তোমার কথা। দাদি, একটা কথা কও, খাওয়ার পরও অনেক
সময় মনে হয় না প্যাট ভরে নাই? তখন মনে কর না আরেকটু খাওয়া পালি প্যাট
আরও খানিক ভরতে? দাদি, তোমার কি মনে নেই, আমাদের গার্মেন্টের মালিক তার

মিষের বিয়ের পর প্যাকেটে করে যে বিরানি দিছিলে, তা দুইজনেরই হয় না, আমরা একটু একটু খায়ে কই নাই যে আরও যদি দিতো। কই নাই দাদি?

মাঝা ঝাঁকায় দাদি। কথাটা নূরজাহান একা বলে নাই, সে বলেছে, তার ছোট নাতি বলেছে, বাটার বৌ বলেছে। কিন্তু সে বলাবলি তাদের পেটের মধ্যেই ওতোপ্তি করে করে একসময় ক্লান্ত হয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কতক্ষণের ঘুম?

মাঝরাতও আসে না, দাদি বোকে খিদে তাকে যেমন জাগিয়ে দিয়েছে, তেমনি জাগিয়ে রেখেছে তাদের বস্তির ঘরের সবাইকে। স্পষ্ট মনে আছে দাদির, খাওয়ার পরও খিদে থাকলে একসময় মনে হয় ঘর দরজা জানালা হাঁড়ি পাভিল মায় তেল চিটচিটে কাঁথা বাগিশও খেয়ে ফেলি। নূরজাহান মাদি কথাটা মিথ্যে কয় নাই।

দাদি, আমি কি কথাটা মিথ্যে কইছি?

নারে না, তুই মিথ্যে কস নাই। খিদের আরেক নাম বাঘ। বাদদে ওসব কথা। চল তাড়াতাড়ি পা চালা। বেলাবেলি গায় না গেলি রাস্তিরে কোনে থাকবোনে?

বুড়ির পায়ে আবার ধাঁই ধাঁই শক্তি দেখে আরও অবাক হয় নূরজাহান। কয়েক মাস আগেই সে শুনেছে দাদি এখন সম্বর। কিন্তু হাঁটায় তা একেবারেই প্রমাণ করে না বলে তার মনে হয় জমি নয়, মাটি নয়, দাদি অন্য কিছু, আরও কিছু পাওয়ার জন্য এখন পাগলের মতো ছুটতে শুরু করেছে, অস্থির হয়ে উঠেছে।

অস্থিরতা তার পরও বিকল থেকেই।

বিকলেই ভাঁড়োলা গ্রামের এক আখবুড়া লোক তাদের বস্তি খোঁজে, দাদিকে খুঁজে খবরটা দিতেই চেষ্টা করে ওঠে দাদি, মোকছেদ, মোকছেদ, তুমি ঠিক কচ্ছেও আমারে জমি আবার জাগেছে? আল্লার কিরে খায়ে কও ভাই, পদ্মা আমারে জমি আবার কিরায়ে দেচ্ছে? কও আল্লার কিরে, খোদার কসম?

হাসে মোকছেদ।

চাচি, আমি এতোদূর তো মিথ্যে কওয়ার জন্য আসি নাই। পদ্মা জমি গিলে খাওয়ার পর যারা যারা চলে গিয়েছিল, তারা একে একে আসতি শুরু করেছে। চাচাক আমি চিনি বলেই ছুটে আসলেম খবরটা দেওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি না গেলি যদি বেদখল হয়ে যায়? দেরি করো না চাচি, দেরি করো না। এখন মানুষ আর মানুষ নাই, বাঘের মতো হা করেই থাকে।

দাদির তাও রক্তনা দিতে একদিন দেরি হয়ে যায়। ঢাকা থেকে আসতে বাসভাড়া, রিকশাভাড়া ধার-কর্জ করে এসেও দেরি হওয়ার কারণে যদি দেখতে পায় বাঘেরা সব গিলে ফেলেছে, তাহলে শরীরের শেষ রাখাটা কোথায় রাখবে? স্বামী-স্ত্রীর মাটিতে মিশে যাওয়া মাটিতেই তার থাকার ইচ্ছে।

নূরজাহান, পা চালা।

দাদি, আমি পা চালানো ক্যা, দৌড়েবেরও পারি। তুমি তো তা পারবে না।

নূরজানরে, আমারও ইচ্ছে করে দৌড়াই। এক কুড়ি বয়েস আগে হলিও দৌড় দিবের পারতেম। কিন্তু মরার মড়া ঢাকা শহর আমার সব শক্তি গিলে খায়ছেরে, হজম করে ফালায়ছে।

দাদি, তোমার বয়স তো এখন তিন কুড়ি দশ, সে হুঁশ আছে?

আছে রে মাগি, আছে। গাঁর মানষির এইটা আবার একটা বয়স?

নূরজাহান তা মানে। অভাবি লোক কোথায় নেই? অভাব থাকলেই শরীরে নানান অভাব দেখা দেয় এটা তো নূরজাহান নিজেই দেখেছে বস্তিতে তাদের পাশের ঘরেই। জমিলা তারই বয়সী। দেখতে দেখতে শুকিয়ে বাঁশ, তারপরে পাটকাঠি, একসময় সুতোর কাছাকাছি এলে ডাক্তার বলেছিল, এই পরিবেশে থাকলে এই মেয়েকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয়। খোলা জায়গায়, খোলা আলো-বাতাসে, যদি উন্নতি হয়! জমিলার মা কপাল চাপড়ে কাঁদে। খোলা জায়গা, সে তো আকাশের নিচে, শীতে ঠান্ডার কামড়, গরমে ঝলসানো গা, এছাড়া মুক্ত আলো-বাতাসের ঘরদোর কে দেবে তাকে?

চোখ ঠিকরে নূরজাহান দেখলো তার দাদির বয়স এক কুড়ি কেন, দুই কুড়ি থেকে তিন কুড়ি কমে গেছে, পায়ের ঝড়ের গতিই যেন বলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি, ওরে নূরজান, তাড়াতাড়ি হাঁট, পারলে আমার মতো হাঁট, পায় অমন মেহেদি লাগিয়ে হাঁটলে আমরা গিয়ে দেখবো জমি জমির জায়গাতেই আছে, কিন্তু আমরা নাই, মোকছেদ যে বলে গেল জমির জন্য লোকে বাঘের মতো হা করে বসে আছে।

দাদি, একটু আস্তে!

ধুর ছেড়ি, আস্তে হাঁটার সময় কই? মোকছেদের কথা মনে নাই? ওরে, ওই তো ভাঁড়েলা মসজিদির গম্বুজ দেখা যায়, তারপরেই তো আমারে হরিতলা। নূরজানরে, বেলা আছে অনেক, কিন্তু সময় যে নাই, সময় যে খুব কম!

ঠিক গ্রামের সীমানায় এসে নূরজাহান বসে পড়ে।

বসলি ক্যা?

পাও চলে না দাদি, পাও চলে না।

আরে পাগলি, এই, এইতো আমারে গাঁও হরিতলা।

আমরা আসে গিছি?

হেঁ। এখন তেনই তো এই গাঁও শুরু।

আর আমারে সেই জমি?

ওই যে তালগাছ, ওই তালগাছের পশ্চিমেই আমারে জমি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে নূরজাহান,

ওই তালগাছ কি তখনও ছিলে?

হু-হু করে কেঁদে ওঠে দাদি। যে মানুষটার পায়ে কিছুকণ আগেও ছিল ঝড়ের গতি, কখনও কখনও বিজলির গতির মতোও মনে হয়েছে নূরজাহানের, সেই মানুষটা

কাঁদার সাথে সাথে শরীরের সব শক্তি যেন খেয়ে ফেলে। দাদির পা আটকে যায়। দাদি ধপাস করে বসে পড়ে গ্রামের সীমানায়। রান্ধসি পদ্মা ওই তালগাছের কাছে এসেই খেমে যায়। যেন তার যা খাবার খাওয়া হয়ে গেছে, গিলেগুলে তার পেট ঢপঢপ করছে। তার আর এগোনোর শক্তি নেই। চরের পর চর, বাড়ির পর বাড়ি, গাছের পর গাছ চোখের পলকে পেটে পুরে পদ্মা দম নিল, রেহাই দিল তালগাছ, রেহাই দিল না নূরজাহানের দাদা-দাদি, বাপ-মার জমিটাকে।

কপাল চাপড়ে কাঁদতে থাকে দাদি।

দাদি, ও দাদি, জমির কাছে যাবে না?

জমি! আমারে জমি?

হেঁ, যে জমির জন্যে তুমি উড়তি উড়তি আসলে, সেই জমির কাছে যাবে না?

এবারে মাটি চাপড়ায় দাদি।

ওরে নূরজান, আমার যে পায় আর জোর নেই রে!

চৌঁচিয়ে ওঠে নূরজাহান।

একবারে কাছে আসে পায় জোর নেই, কি কও তুমি?

সত্যি রে নূরজান, আমি আর হাঁটবের পারবো না।

ছটফট করতে থাকে নূরজাহান। তার শরীরে ক্লান্তি থাকলেও সে ঠিকই যেতে পারবে তালগাছের সীমানায়, কিন্তু তার দাদির পায়ের শক্তি যে বাঘে খেয়ে ফেলেছে এই কথাটা মনে হতেই তার সারা শরীর হিম হয়ে আসে, তাহলে আগে যারা এসেছে; আর তাবতে পারে না নূরজাহান।

হাতের জীবন

আজ তিনদিন হয় রাজা রাজধানীতে নেই। মৃগয়ায় গেছেন। মৃগয়া যতোটা তার চাইতে রাজকর্ম ও রাজ্যের কোলাহল থেকে দূরে বহুদূরে বনে বনান্তরে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে মনটাকে আবার সতেজ ও চাঙ্গা করে আসাটাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এর মধ্যে দু'একটা ভালো ও নিরাপদ শিকারের সুযোগ জুটে গেলে সেটার সদ্যবহার করা যাবে, না গেলে নয়। সঙ্গে পারিষদ আছে, বিদূষক আছে, নৃত্যগীতের জন্যে নটরা আছে, আছে প্রচুর খাবার ও পানীয়। এসবে দলের চল্লিশজন সদস্যের হেসেখেলে দশদিন চলে যাবে।

বাইরে মৃগয়া বা ভ্রমণে যাওয়ার সময় দলের সঙ্গীসার্থীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে তার সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকে। রাজ্য অনুচরের কষ্ট সেতো রাজ্যেরই দুর্নাম, রাজ্যের শাসনের অপবাদ। রাজা সেটা হতে দিতে রাজি নন। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক তার সম্মানের মতো। এ কারণে তিনি বহুদিন গভীর রাতে শুধু একজন শক্তিশালী দেহরক্ষী নিয়ে ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বেরিয়ে যেতেন, কোনো প্রজার সেই রকম দুঃখ-কষ্ট দেখলে পরদিনই পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে ডেকে এনে রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য করতেন। রাজ্যের এই বদান্যতার কথা রাজ্যের সবাই জানে বলে এ রাজা যেন মানুষ নয়, দেবতা।

কিন্তু এই দেবতুল্য রাজ্যের মনে একটা জায়গায় সুখ নেই। রাজ্যকার্যে ক্লান্ত হলে বিশ্রাম বা আমোদ-প্রমোদের বাইরে গেলে রানি কোনোসময়ই তার সঙ্গে যান না। ওই রাজপ্রাসাদই যেন তার সাম্রাজ্য, প্রাসাদের ছাদই তার আকাশ, সেখান থেকেই তিনি দিনের বেলায় অধিবাসীদের দেখেন, রাতে আকাশের তারা ও চাঁদ দেখেন। রানির এই আবদ্ধ জীবনযাপন রাজাকে বড় পীড়া দেয়। তার বড় সাধ হয় রাজ্যের জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি অংশগ্রহণ না হয় না করলেন, কিন্তু যেসব কাজে চিন্তা প্রকল্প হয় সে সবগুলোতেও অংশগ্রহণে কেন যে অনিচ্ছা তা তিনি বুঝতে পারেন না। এবারেও মৃগয়ায় যাবার আগে তিনি রানির হাত দুটি ধরে মিনতি করেই বলেন,

তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

রানি তখন জানালায়। দূর আকাশে তার দৃষ্টি। কিন্তু তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে না এনেই জবাব দেন,

কোথায়? হয় মৃগয়া, না হয় সমুদ্র তীরে কিংবা বিদেশ ভ্রমণে?

মৃগয়ায়।

মানে ওই বনে জঙ্গলে? অসহ্য!

অসহায় বোধ করেন রাজা। তবু তিনি রানির পাশে বসে প্রথমে একটা চুপন দিয়ে স্নান হেসে বললেন,

বনজঙ্গলেরও আলাদা সৌন্দর্য আছে। সেখানে গাছে গাছে পাখি আছে, মাটিতে পশুদের বিচরণ আছে, আর সব পশুপাখির ডাকাডাকি, সে যে কী অপূর্ব, রানি, বনের সবুজ যে কতো ঘন হতে পারে সে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না।

হাত ইশারায় রানি ধামিয়ে দেন রাজাকে। রাজা আগ্রহী হয়ে রানির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জবাব শোনার জন্যে। অবশেষে জবাব আসে, যাবো না।

এরকম একটি উত্তর হতে পারে ভেবেও জনাব শুনে রাজা ঈষৎ চমকে ওঠেন। যাবে না! কেন?

কোনো কেন নেই। যাবো না।

খানিকক্ষণ স্থির বসে থেকে রাজা যাওয়ার সময় আবার রানির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে সামান্য হাসির রেখা। রেখাটি বক্র।

কি অর্থ, কী বোঝায় ওই বক্র রেখায় বুঝতে পারেন না রাজা। একবার মনে হয় হাসির কারণ তিনি জেনে তবে মৃগয়ায় যাবেন। পর মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নেন না কিছুই জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ এই মুহূর্তে রানি কঠিন প্রতিজ্ঞার যে বর্ম ধারণ করে আছেন তা ভেদ করা সম্ভব নয়। সময়ও কম। তাছাড়া প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর না মিললে মনোভাব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। দেশ শাসককে বহু বিষয়ে নিরুত্তাপ নির্লিপ্ত থাকতে হয়। প্রাসাদের বাইরে মৃগয়ায় যাবার জন্যে সাজসাজ রব শেষে সবাই অপেক্ষমান, এই অবস্থায় প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিলম্ব তাদের মনে অহেতুক সন্দেহ জাগতে পারে। ক্ষুণ্ণ মনে বেরিয়ে যাবার আগে রাজা দরোজার কাছ থেকে আবার ফিরে তাকান। এবারে রানির হাসিতে বক্র রেখার সঙ্গে আনন্দেরও মিলন ঘটেছে। তখন তিনি প্রাসাদ অভ্যন্তরের প্রধান প্রহরীকে ডাক দেন। প্রহরী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

এসো আমার সঙ্গে।

আবার চোখ পড়ে রানির দিকে। এখন হাসিতে বক্র রেখা বা আনন্দ নেই, সেখানে কৌতূহল ও উৎকর্ষার মিশ্রণ।

প্রধান প্রহরীকে পরামর্শ দিয়ে রাজা অমাত্যদের দিকে পা বাড়ালে প্রহরী প্রাসাদ অভ্যন্তরে ফিরে আসে। তার মুখ হাসির আভায়ে উজ্জ্বল, আর তা কেবল বোঝে রানিই।

তা, রাজার সঙ্গে কি পরামর্শ হলো?

জোরে হেসে ওঠে প্রহরী।

এতে হাসির কি আছে?

আমার দায়িত্ব যে আরো বেড়ে গেল।

কৌতুহল আর ধরে রাখতে পারে না রানি।

কি কথা হলো তাড়াতাড়ি বলো।

কথা হলো, রাজা আপনাকে কড়া পাহারায় রাখতে বলেছেন।

দুজন একসঙ্গে হেসে ওঠে। একজনের হাসিতে নূপুর নিকণ, আরেকজনের মেঘমন্ড্র; দুয়ে মিলে অলিন্দে অলিন্দে হাসির ঢেউ খেলে যায়। প্রধান প্রহরী ছাড়া আর কারো রানির নিজস্ব এলাকায় প্রবেশাধিকার নেই বলে হাসির শব্দে সবাই গুনলেও বুঝতে পারে না হঠাৎ কোন পুলকে তাদের মনে এমন হাসির ঝরনাধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে রানি,

তা তোমার প্রহরা কখন কড়া হবে?

সব সময়ই।

দ্যাখো, হেঁয়ালি জবাব দেবে না। আমি হচ্ছি রানি। রাজধানীতে রাজা অনুপস্থিত, তাঁর অবর্তমানে শাসনদণ্ড এখন আমার হাতে। আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করলে তোমাকে কয়েদখানায় রাখতে পারি, কাঁসি দিতে পারি, শূলে চড়াতে পারি।

আপনার সব শাস্তি আমি একসঙ্গে গ্রহণ করলাম। তা বলুন, আমাকে এখন কি করতে হবে।

আমি এখন ছাদে গিয়ে রাজা কতোদূর গেলেন দেখবো।

হাসে প্রহরী। হাসি মুখে নিয়েই বলে,

গেলেন কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে?

চোখ মটকে তাকান রানি,

দ্যাখো, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

বাইরে থেকে ধমক মনে হলেও প্রহরী জানে এটা প্রকৃতই প্রশয়। রানির প্রশয়ই তো তার এখন বড় সম্পদ। এই সম্পদে সমৃদ্ধ না হলে আজ দেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামের এক অজ্ঞাত কৃষক হয়ে জীবন কাটাতো, কে তার খোজ রাখতো। ভাগ্য, ভাগ্যই তাকে আজ গ্রাম ছেড়ে শুধু রাজধানীতে নয়, রাজপুরীর ভেতরেই শুধু নয়, খোদ রানির প্রধান প্রহরীতে পরিণত করেছে। অশেষ দয়াবতী রানি। সমস্ত অনুগ্রহ উজাড় করে দিয়েছেন। রাজার অনুপস্থিতিতে, অবর্তমানে এই প্রধান প্রহরীই আরো প্রধান হয়ে ওঠে রানির জীবনে। কে ভেবেছিল এইভাবে তার ভাগ্য খুলে যাবে, কে চিন্তা করেছিলো দেশে এতো মানুষ থাকতে গ্রামে তার কুঁড়েঘরেই রানি গিয়ে আশ্রয় চাইবে। স্বপ্ন। আজ স্বপ্ন তার কাছে। এখন বাস্তবতা বড় বেশি বাস্তব মনে হলেও কখনও কখনও কল্পনাকেও হার মানিয়ে যায়, আর তখন সে প্রহরার মতো গুরুদায়িত্ব ভুলে গিয়ে চুপচাপ বসে শুধু আকাশ দেখে, দেখে আর ভাবে আকাশের ঠিক কোন অংশের নিচে তার বাড়িটা রয়েছে,

তার বৌ বাচ্চারা রয়েছে। তখন তার মনে এক অংশে আশ্রয় প্রবল হয়ে ওঠে আর নয় আর নয়, ঘরে ফিরি, ঘরে ফিরি, কিন্তু আরেক অংশ শাসনে সম্ভ্রান্ত করে দেয়, রানির রক্তচক্ষু ও হিংস্রতা পশু করে ফেলে তাকে। এক সময় রানির সঙ্গসুখ তাকে ভুলিয়ে দেয় অতীত, মন থেকে দূর করে দেয় গাছে ছায়ায় পাখি ডাকায় ভরা তার ছোট্ট কুঁড়েঘরটিকে, ঘরের অধিবাসীদের।

ভাগ্য ছাড়া কি?

ঝড়ের রাতে কাজেম আলী বৌ ও দুটো শিশু সন্তান জড়িয়ে ধরে অপেক্ষায় আছে কখন ঝড় থামবে, কিন্তু ঝড় রাগী হিংস্র মোষের মতো গাছপালা আছড়ে ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে, বাতাসের ক্রুদ্ধ হংকারে কানের কাছে মুখ রেখেও বৌয়ের কথা শুনতে পায় না, তখন সে নিশ্চিত হয়ে যায় তার দরমার দরোজার সামনে মৃত্যু ভয়ংকর ধাবা বিস্তার করে আছে, দরোজা খোলা পেলেই ভেতরে প্রবেশ করবে। ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে ওঠে কাজেম,

ও বৌ, যদি ঘর ভাঙে পড়ে?

কি কও?

কই, ঘর ভাঙে পড়লি সকলেই মারা পড়বো।

একমাত্র মারা পড়া শব্দ দুটিই বোধগম্য হয় বৌয়ের কাছে। সে স্বামীকে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে ধরলে দুজনেরই বোধ হয় মৃত্যুর জন্যেই তাদের এখন অনন্ত অপেক্ষা। ঝড়ের বেগ কমে না।

এই সময়, হাঁ, এই সময়ই, বাতাস না মানুষের ধাক্কা বোঝা যায় না, ঘরের দরোজা খুলে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকায়, বিদ্যুতের আলোয় স্বামীস্ত্রী দুজন চোখ ঠিকরে দেখলো দরজার সামনে এক মূর্তি ঘরে প্রবেশ করতে উদ্যত।

চিৎকার করে ওঠে বৌ,

আজরাইল, আজরাইল!

সে চিৎকার মূর্তির কানে যায় না। সে প্রাণপণে দরোজা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে।

কিডা, কিডা?

কান কাটিয়ে চুঁচিয়ে ওঠে কাজেম।

মূর্তি নড়ে না, কোনো জবাব দেয় না। বেড়ার কাঁকফোকর দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক ঘরে ঢুকছে, সেই ঝগড়াহারা আলোয় বৌ আর কাজেম দেখে মূর্তি তখনও নিশ্চল, আজরাইল হলে তো তার এভাবে বসে থাকার কথা নয়।

কখন থামবে এই ঝড়, আর কখন এই মূর্তি তাদের কাছে স্পষ্ট হবে? কাজেম শুধু ভাবে তার দুঃখের জীবন বুঝি এইরকম একটা নিরুত্তর অন্ধকার পিও হয়েই তার কাঁধে চেপে থাকবে। কে এই মূর্তি? আজরাইল না মানুষ? জিন না ডাকাত? কথা বলে না কেন? অপেক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই।

ঝড়ের গতি কমে আসে। তখনও মূর্তি নিশ্চল। এখন স্বাভাবিক গলায় ডাকলে
মূর্তি নিশ্চয়ই শুনবে আশায় কাজেম ডাক দেয়।

কিডা? কিডা তুমি?

কম্পিত গলায় জবাব দেয় মূর্তি,

আমাকে চিনবেন না।

কাজেম ও বৌ দুজন একসঙ্গে চমকে ওঠে। এ যে নারীকণ্ঠ! বৌ বলে,
মিয়ে লোক।

শুনিছি।

এই ঝড়ে মিয়ে লোক! একা!

আমিও তো তাই কই, মিয়ে লোক! একা!

আজরাইল নয়, অশরীরী নয়, ডাকাতও নয়, শুধু মানুষ এবং মেয়ে মানুষ এই
ভয়ংকর ঝড়ের রাতে কোথা থেকে এসে আশ্রয় নিলো জানার আগ্রহে দু'জন ছটফট
করতে থাকে। আবার ডাকে কাজেম,

এই যে শুনিছ্যান?

কোনো জবাব নেই।

আবার ডাকে। আবার ডাকে। ঝড় ধেমে গেলেও অন্ধকার দূরীভূত হয় নি,
বিদ্যুতের চমক আর আগের মতো নেই। নারী যে ঘরেই আছে সে বিষয়ে তারা
নিশ্চিত এবং নারী যে বিপজ্জনক নয় তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কাজেম বৌকে
বলে,

বাণ্ডি জ্বালাও।

বৌ স্বামীকে ছেড়ে হাতড়ে কুপি হাতে তুলে বলে,

হায় আত্মা, যে তেল ছিলো, তাও কুপি পড়ে যায়ে শ্যাষ।

তা হলি এখন কি করা?

বাকি রাত এমনিই বসে থাকা ছাড়া উপায় কি?

স্বামীত্বী কেউ জবাব দেয় না। আবার দুজন শরীরে শরীর লাগিয়ে বসে থেকে
অন্ধকারের ভয়, ঘরে একজন অচেনা অদেখা মানুষের উপস্থিতির ভয় তাড়াতে
তাড়াতে একসময় দেখতে পায় বেড়ার ভেতর দিয়ে ভোরের আভা প্রবেশ করতে শুরু
করছে। সেই আভা ফিকে হয়, আলোর রেখা স্পষ্ট হয়, আর তখনই তারা স্পষ্ট
দেখতে পায় দরোজার কাছেই নারী একটা পিও হয়ে শুয়ে আছে। গভীর ঘুমে
আচ্ছন্ন।

ফিসফিস করে বৌ বলে,

ডাকবো?

না। দেখা যাক।

কিডা, মানুষটা কিডা?

কবো কেমনি ।

দেখতি তো ভারি সোন্দর ।

মনে হয় যিনি রানি ।

কাজেমের রানি শব্দ সম্পূর্ণ হয় না, যে মানুষটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে যেন মৃত হয়ে ছিলো, সেই মানুষ তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসে কাতর স্বরে বলে, আশ্রয় দিন, আমাকে একটু আশ্রয় দিন ।

আপনে, আপনে কিডা?

আমার পরিচয় জেনে প্রয়োজন নেই । আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি । বিপদ না হলে এই সাংঘাতিক ঝড়ে কেউ বাইরে বেরোয়?

যুক্তিটি মানে কাজেম ও তার বৌ । একে ঝড়ের রাত, তার ওপর রানি রাজকন্যার মতো চেহারার একজন রমণী তার কুঁড়েঘরে আশ্রয় যখন নিয়েছে তখন তার বিপদ যে কতো বড় তা বুঝিয়ে না বললেও তারা বোঝে । কিন্তু তাদের কৌতুহল মেটাতে কে?

দেখেন, আপনি যেই হন, এইরকম বাড়িতে আপনার মতো একটা মানুষ, লোকে দেখলি কি কবো?

রমণীর মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে । গৃহকর্তার প্রশ্ন অমূলক নয় । এমন জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরে তার অবস্থান অবশ্যই শোভা পায় না, কিন্তু বাইরে বিদ্রোহীদের এবং তাদের চরদের চলাচল যে কোনো মুহূর্তে আবিষ্কার করে ফেলতে পারে তাকে । সে কাজেম ও বৌয়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কাতর গলায় বলে,

জানাজানি হলে আমার বিপদ তো আছেই, আপনাদেরও বিপদ হবে । আমি যে এখানে আছি তা যেন কাকপক্ষীও জানতে না পারে ।

কাকপক্ষী জানলেও জানতে পারে কিন্তু বাইরের লোকে জানবে না । বনের গা ঘেঁষে কাজেমদের ছোট সংসারে ছোট দু'টি সন্তান ছাড়া পঞ্চম কোনো ব্যক্তি নেই । সারাদিন হালচাষ করে ক্লান্ত কাজেম যখন ঘরে ফেরে তখন বৌয়ের সাথে গাছেরাও তাকে শীতল বাতাসে স্নাত করে ক্লান্তি দূর করে দেয় । এই জীবন আর কোন জীবনের সঙ্গে তুলনা হতে পারে জানে না কাজেম, জানার আগ্রহ তার নেই ।

মাটি ও প্রকৃতির স্নেহে সুঠাম যে দেহটি সে পেয়েছে সেটাই তার বড় সম্পদ, এই সম্পদেই সে সমস্ত সৃষ্টি তখনই করে দেবার সামর্থ্য রাখে ।

ভীত গলায় জানতে চায় কাজেম,

তাহলি আপনে কিডা?

রমণীর একবার মনে হয় আসল পরিচয় প্রকাশ করে । কিন্তু এই সহজসরল কৃষক সম্প্রতি মনে হয় রাজ্যের কোনো খবরই রাখে না যে রাজ্য এখন বিদ্রোহীদের দখলে, রাজা এখন তার মতোই পলাতক, কিন্তু তিনি এখন কোথায়? রাজত্ব, ক্ষমতা, রাজসুখ, সবই তাদের ছিলো কিন্তু এখন প্রকৃতির এই অধিবাসীদের কাছে সবই

মূল্যহীন, অর্থহীন। রমণী কাজেমের কথার জবাব না দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনকে দেখতে থাকলে অধৈর্য হয়ে ওঠে কাজেম,

কলেন না আপনে কিডা?

ধীরে ধীরে বলে রমণী,

আপনি তো হাটে মাঠে ঘাটে যান, বাইরে কিছু শোনেন নি?

হ শুনছিলাম।

কি শুনেছিলেন?

শুনছিলাম যে দ্যাশের রাজা বদলাইছে।

আর কিছু শোনেন নি?

হ শুনছিলাম যে রাজা নাকি পলাইছে।

হায় আল্লা, আমরা চাষাভূষা মানুষ, রাজা কই গ্যাছে না গ্যাছে তা আমরা কেমনে জানবো? আর...

ব্যগ্র হয়ে ওঠে রমণী,

আর? আর কি?

রাজা যাউক আর আসুক, আমাগো কি? আমরা মাটির সাথে, ঝড়-বিষ্টির সাথে লড়াই করে বাঁচি, রাজা আইলেই বা কি যাইলেই বা কি?

নরম গলায় জিজ্ঞেস করে রমণী,

এখন যে অবস্থায় আছেন এর চেয়ে ভালো থাকতে ইচ্ছা করে না?

তা তো করেই। কিন্তু করলিই তো আর পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর যদি সহায় হন তাহলে পাবেন।

ঈশ্বর! ঈশ্বর, মানে আল্লা?

রমণী মুচকি হেসে মাথা নাড়লে কপাল চাপড়ে কাজেম শুধু বলে, আল্লার তো আর খায়ে-দায়ে কাম নেই।

আসলেই ভাগ্য ছাড়া কি? ঠিক দশদিনের মাথায় গ্রামপ্রান্তর ভেঙে বাড়ি বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে পলাতক রাজার সৈন্যরা কাজেমের বাড়িতে রানিকে আবিষ্কার করে সোনার চৌদোলায় করে যখন তাকে নিয়ে যায় তখন কাজেম বাড়ি নেই, দূর নদীর ধারে জমিতে চাষ দিতে গেছে। আজ তার চাষে মন নেই, কেবলই কে যেন ঘর থেকে আয় আয় ফিরে আয় বলে ডাকে, কে ডাকে সে বুঝতে পারে না। বৌ সন্তানদের পাশাপাশি আশ্রিতা রানির মতো দেখতে অপরূপ রূপসীকে সে মন থেকে তাড়াতে পারে না কিছুতেই, সে কিছুতেই সিঁকাস্তে আসতে পারে না তার ওই দরিদ্র সংসারে একজন অজানা অচেনা মানুষের উপস্থিতি আনন্দদায়ক না বিরক্তিকর। আল্লা তাকে এ কোন পরীক্ষায় ফেললো! আকাশ ভাঙা রোদ মাথায় নিয়ে চাষ থামিয়ে সে ভাবতে ভাবতে সহসা গা ছাড়া দিয়ে উঠে বাতাস গাছ আকাশ প্রকৃতি নদীকে শুনিয়ে বলে, সুন্দরী, তুমি যেই হওনা ক্যান তুমাক আজ আমি তাড়াবোই।

লাঙ্গল কাঁধে ফেলে গরু দুটিকে তাড়িয়ে নিজেও তাড়া খাওয়া মানুষের মতো
দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির কাছাকাছি এসেই হাঁক দেয়,

বৌ, সে মাগি কোনে?

ছুটে আসে বৌ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,

আন্তে কও, লোকে শুনবি।

লোকে শুনে তো বয়ে গেল। তাড়া, হারামজাদিক তাড়া একুনি।

বৌ মুখ চেপে ধরে কাজেমের।

শোনো, সাংঘাতিক খবর।

ধমকে যায় কাজেম। মুখ থেকে বৌয়ের হাত সরিয়ে কাঁপা গলায় বলে,

কি? কী হয়েছে?

ওই মিয়ে লোক তো রানি।

হাত-পা অবশ হয়ে আসে কাজেমের। রাজার সৈন্যদের আগমন, চৌদোলায় রানির
গমন, পলাতক রাজার আবার রাজ্য ফিরে পাওয়ার বিবরণ কিছুই কানে যায় না তার,
ওধু চোখের সামনে ভাসে ওই রূপ যৌবন নিয়ে রানি তার কুঁড়েঘরে থেকে কী কষ্টই না
করে গেছে, আর কষ্ট পাবার জন্যে রানি শান্তি দেবার উদ্দেশ্যে রাজা পেয়াদা পাঠিয়ে
তাকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছে। মাটি চাপড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে কাজেম,

আত্মা, আত্মা, আমি তুমার কাছে কী গুনাহ করিছিলেম?

কাজেম আর জমি চাষে যায় না, ঘর সংসারে কোনো কাজে মন নেই, গাছের
পাতার পতনের শব্দ হলেও মনে হয় এই বুঝি রাজপেয়াদা এসে গেছে। সে জীর্ণ
কুটিরের খুঁটির সাথে নিজের জীবন মিলিয়ে রাজদরবারে চরম শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা
করতে করতে, একসময় রাজবাড়িতে যায়। কিন্তু তখনো সে কি ভাবতে পেরেছিলো
রাজার চাইতে রানির অনুগ্রহই তার জন্যে নানা উপচার সাজিয়ে বসে আছে?

সেই আসা, তার আর পর্ণকুটিরে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি।

সেদিন সকাল থেকে আকাশে সূর্য নেই। শেষ রাতে কোথা থেকে এতো মেঘ এসে
ব্রহ্মতারা শুক্রতারা সব তারা ঢেকে দিলো, ভেবে পায় না কাজেম। মেঘশূন্য আকাশ
মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার সময়ও কাজেম খোলা আকাশের নিচে বসে তার সংসার,
ভবিষ্যৎ, নিজের জীবন মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে দেখতে আর কিছুই দেখতে পায় না,
তার মতো মানুষ আর কতোদূর ভাবতে পারে। ভাবতে পারে না বলে ঘুম আসে না,
ঘুম আসে না বলে পোটা রাতটা বাইরেই বসে কাটিয়ে দেয়।

বৌ হাত ধরে টেনে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে দিতে দিতে বলে,
এতো ভাবো কি কামে? আমরা তো রানির কোনো ক্ষতি করি নাই।

তাও সত্য। তবু ভয় বার না। অন্যায় না করে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে থাকার যজ্ঞগা
কাকে বোঝাবে কাজেম, মানুষের জন্যে কিছু অদৃশ্য ও অনির্দেশ্য শান্তির উৎস

কাজেমের মতো মানুষ চিহ্নিত করতে না পারলেও শাস্তিটা ভোগ করে ঠিকই, আর এখানেই তার কষ্ট। রানি চলে যাবার সময় খুশি হয়ে কিছু পুরস্কার দিয়ে যায় নি, আবার এমন কিছু আশার কথাও শুনিতে যায় নি যে সে খুশিমনে চাষবাস করে আশায় ভরসায় দিন গুণতে পারে। রাজধানীর ঝড়, প্রকৃতির ঝড় তার সংসারেও ঝড় তুলবে আগেই যদি কাজেম বুঝতো তাহলে সে যে করেই হোক রানিকে তার কুটিরে আশ্রয় দিতো না।

রানির প্রধান গ্রহরী নিযুক্ত হওয়ার সাতদিন পর কাজেম অনুমতি চায়, আমি বাড়ি যায়ে বৌ বাচ্চা দেখে আসি।

রানি বাঁকা চোখে তাকায় কাজেমের দিকে। ঠোঁটে তার নিস্তরঙ্গ হাসি।

তোমাকে তো যেতে দেবার জন্যে আনা হয় নি। তুমি চলে গেলে আমাকে পাহারা দেবে কে?

খতমত খেয়ে যায় কাজেম। রানিকে পাহারা দেবার লোকের অভাব? যার উচ্চারিত হুকুমে নয়, শুধু চোখের ইঙ্গিতেই শত শত দাসদাসী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়, তাকে পাহারা দেবার কেউ থাকবে না! বিষয়টি মাথায় ঢোকে না কাজেমের। সে হাত কচলাতে থাকে।

শোনো, সেই ঝড়ের রাতে আমাকে আশ্রয় দিয়ে তুমি যে আমার কি করেছো তা যদি তুমি বুঝতে তাহলে গৈয়ো ভূতের মতো কথা বলতে না।

এ কথার কি অর্থ হয় মাথায় ঢোকে না তার। তবে কি করেছো বলতে কিছু যে একটা করেছে বুঝে সে অসহায়ের মতো বলে,

আমি কি করিছি?

করিছি না। বলো, করেছি।

না, আমি তো কিছু করি নাই।

দ্যাখো কাজেম, রাজবাড়িতে থেকে তোমাকে কথা শুদ্ধ করতে হবে, সুন্দর করতে হবে। এখানে গ্রামের ভাষা চলবে না।

মনে মনে হায় হায় করে ওঠে কাজেম। তবু সে বলে,

আমি গাঁও গেরামের মানুষ, শুদ্ধ কথা তো শিখি নাই!

রানি শান্ত গলায় বলে,

শেখো নাই! শিখবে। আমি তোমাকে শেখাবো।

কিন্তু আমার বৌ বাচ্চার কাছে যাওয়া?

ধমক মেরে ওঠে রানি।

আবার বৌ বাচ্চা! তারা সুখেই থাকবে। রাজকোষ থেকে টাকা যাবে, তাদের খাওয়া পরা থাকবে, কোনো অসুবিধা হবে না।

ধমকে কাজেমের আর বলা হয় না তার বৌ ও দুটি শিশু সন্তানের কাছে যাওয়ার জন্যে মন অস্থির হয়ে উঠেছে, বলা হয় না এই রাজসুখ তার ওই পর্ণকুটিরের সুখের

কাছে কিছুই নয়; মাঠ, চাষবাস, ঘরে ফিরে বৌয়ের হাতে চকচকে কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার মতো সুখ আর কোথায় আছে? কাজেম স্ববির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা আবিষ্কার করে রানি তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে, সে হাসি ঠোঁটের শুধু নয়, চোখেও নাচানাচি করে যাচ্ছে। কি বলতে চায় রানি? অথবা রানি কি চায় তার কাছে?

খাস কামরায় রানি নিয়ে যায় কাজেমকে।

এখন মাঝে মাঝে বৌ বাচ্চা সংসারের কথা মনে পড়ে কাজেমের। রানির সঙ্গসুখের বাইরে একা একা কিংবা আকাশভাঙা মেঘবৃষ্টি, তুমুল ঝড় এলে মনে চকিতে খেলে যায় তার কুটিরের কথা, রানির অনুগ্রহে তার কুটিরটি আরো সুন্দর আরো মজবুত হয়েছে কিন্তু তা দেখতে কেমন, অথচ তা দেখতে যাওয়ার অনুমতি নেই। গত আশ্বিনের ঝড়ের পরদিন কাজেম আরেকবার বাড়ি যাবার কথা ভুলেছিলো। আবার জবাব দিয়েছিলো রানি,

রাজার রাজ্যে সবকিছু রাজার, কিন্তু আমার রাজ্যে তুমি শুধু আমার।

ব্যস, তার কোনো কথা নয়। বৌ বাচ্চার কথা কখন যে মন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কাজেমের, জানে না। সে এখন শুদ্ধ কথা বলতে পারে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে আভাসে ইঙ্গিতে কি কথা হয়, সব বুঝে ফেলে চোখের পলকে, কোন কথা কোন বাতাস রানির জন্যে সুখকর তা এখন কাজেম যতোটা বোঝে, স্বয়ং রাজাও মনে হয় তা বোঝেন না। কাজেমের কাছে একদা আশ্রয় তার জীবনে এতোটা সুখময় সুফল দেবে অকল্পনীয়। আকস্মিকভাবে সেদিন রানিই প্রশ্ন করে কাজেমকে,

তোমার বৌ বাচ্চার কথা আর মনে হয় না?

চমকে ওঠে কাজেম। শান্ত গলায় বলে,

মনে হলেই বা কি করে করবো?

ওরা ভালো আছে।

আপনি কি জানেন?

রাজার রাজ্যে আমার নিজস্ব চর আছে না! তোমার ঘরদোর মজবুত হয়েছে, খাওয়া ও পরার কোনো অভাব নেই, আর কি চাই?

কাজেম কোনো জবাব দেয় না। চকিতে মনে হয় রানিরও তো সবকিছুই আছে, তারপরেও তো তাকে ছাড়ে না! এখন আর কোনো কিছু রহস্য নয় তার কাছে। রানির বিলাসিতা ও খেয়ালের সে অংশীমাত্র। এই জীবন তো চায় নি কিন্তু ওই জীবনে ফিরে যাওয়ার উপায়ও এখন আর তার জানা নেই। জানতে গেলে কে জানে মৃত্যু নেমে আসবে কিনা।

আজ বিকেলে আকাশটি বড় মনোরম। সারাদিন যে সূর্যতাপ গেছে তা মনে হয় ওষে নিয়েছে আকাশ। বাতাসটি স্নিগ্ধ, দিনের উত্তাপটি কোমল, প্রকৃতিটি বড় বেশি

বিনম্র । রানি প্রাসাদের ছাদে পায়চারি করছেন, প্রধান গ্রহরী কাজেম ছাদের প্রবেশ পথে অলসভঙ্গিতে বসে । রানির পায়চারি দেখছে সে । হঠাৎ থেমে যায় রানি ।

কাজেম!

বলুন ।

আমার একটা সাধ পূরণ করতে পারবে?

কি সাধ রানি?

আমার হঠাৎ মনে হলো আমি কোনোদিন চাষা দেখি নি । চাষাদের কথা শুনি, কিন্তু তারা দেখতে কেমন, রানি হিসেবে আমার মনে হয় দেখা উচিত । তারাও তো আমাদের প্রজা!

হেসে ফেলে কাজেম ।

চাষা? আপনি দেখেছেন ।

দেখেছি! কোথায়?

আমার বাড়িতে । আমাকে ।

থমকে যায় রানি । মুহূর্তের জন্যে । নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

কঙ্কনো না । আমি তোমার বাড়িতে সূর্যালোক দেখি নি, পাখি দেখি নি, গাছপালা দেখি নি, তোমার স্ত্রী সন্তানদেরকেও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না ।

রানিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দেয় কাজেম,

আর আমাকে?

হ্যাঁ, তোমাকে দেখেছি । কিন্তু চাষা হিসেবে নয় । দেখেছি পুরুষ হিসেবে । যে মানুষ আসলেই পুরুষ, সে কখনোই চাষা হতে পারে না । আমি দেখতে চাই আসল চাষা ।

কাজেম খানিকক্ষণ রানির চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করে এ কোন খেলায় রানিকে পেয়ে বসলো । মানুষের অনেক খেলার কথাই সে শুনেছে কিন্তু চাষা দেখতে চাওয়া কোন খেলায় সে আরো ভালো বুঝবার জন্যে বলে,

দেখুন, এই মানুষই ভদ্র, আর এই মানুষই চাষা ।

কাজেম, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না । চাষা ঠিক কাকে বলে আমি তাই দেখতে চাই ।

স্বিধায় পড়ে যায় কাজেম । এই রাজপ্রাসাদের ভিতরে সে চাষা কোথায় পাবে । চাষা এনে দেখানো যায় কিন্তু বাইরে যাবার অনুমতি তার নেই, একমাত্র রাজা যখন অন্তরমহলে এসে রানির সঙ্গে একান্ত সময় কাটান, সেই সময়টুকু বাদে সর্বক্ষণই তাকে গ্রহরায় থাকতে হয় । হ্যাঁ, এ জন্যে রানির বিশেষ অনুগ্রহ সে পায় ঠিকই, কিন্তু বাইরের জীবন তার কাছে এখন মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয় । সে মাথা নেড়ে বলে,

বাইরে যাবার অনুমতি পেলে চাষা এনে দেখাতে পারি ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে রানি । বলে,
এই সুযোগে বাইরে যাবে? ওটি হবে না ।
তাহলে কিভাবে সস্তব?
লোক লাগাও, চাষা ধরে আনুক ।
রানিকে আড়াল করে হতাশা চেপে শান্ত গলায় বলে কাজেম, তাই হবে ।

রাজা মৃগয়ায় গেছেন আজ চারদিন । কবে ফিরবেন তা নিয়ে রানির উদ্বেগ নেই,
তার এখন আকুলতা চাষা কেমন দেখায়!
কি হলো কাজেম? রাজ্যে কি কোনো চাষাই নেই?
আছে, নিশ্চয়ই আছে । লোক লাগিয়েছি, কিন্তু চাষার মতো চাষা পাওয়া যাচ্ছে
না বলে আনা হচ্ছে না ।

ঠিক আছে, আর একদিন সময় দিলাম ।

সে রাতে রানিকে সঙ্গ দিয়েও কাজেমের বারবার মনে হয় সে বড় একা ।
এতোদিন পর তার অতীত জীবন, গ্রাম, প্রকৃতি, খোলা আকাশের খেলা চোখের
সামনে বড় বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে, সে ম্রিয়মান হয়ে বসে থাকে । রানি তখন ঘুমিয়ে ।
সারাটা রাত তার ঘুম আসেনা, এতোদিন রানির সঙ্গলাভে তার কাছে স্পষ্ট, খেয়াল
চরিতার্থ করার জন্যে তিনি যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, মৃত্যুদণ্ড দেয়াও
তার কাছে ছেলেখেলার মতোই ব্যাপার । হাতে মাত্র আর একদিন সময় ।

আজ শেষ বিকেল । রানি ছাদে বসে আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে যাওয়া দেখতে
দেখতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন কাজেম ছাদের কোনায় ঝুঁকে রাস্তা পরখ
করছে ।

কি দ্যাখো কাজেম?

ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দেয় কাজেম,

মনে হয় পেরেছি ।

কি?

চাষা ।

উঠে দাঁড়ান রানি । কাজেমের কাছে আসতে আসতে বলেন,

কৈ? কোথায়?

চৌচিরে ওঠে কাজেম,

এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে দেখা উচিত নয় । রাজ্যের লোক হাসাহাসি করতে পারে ।

তাহলে চাষাকে ডাকো এখানে ।

ইতস্তত করে কাজেম । বলে,

অন্দরমহলে! চাষাকে?

চৌচিরে ওঠেন রানি,

আমি রানি । আমার হুকুম ।

নির্দেশ মান্য করে কাজেম দ্রুত ছুটে যায় ফটকের কাছে । ফটকের প্রহরী প্রধান প্রহরী কাজেমকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কাজেম ঠান্ডা গলায় নির্দেশ দেয়,
ডাকো ওই লোকটিকে ।

কোন লোক?

ওই যে হাতে দুই শিশি নিয়ে যে লোক যায়, তাকে । আমি ছাদে গেলাম ।
কাউকে দিয়ে তাকে ছাদে পাঠিয়ে দেবে ।

প্রহরী চাষাকে ডাকার জন্যে ছুটলে কাজেম ছাদে চলে যায় ।

খানিক অপেক্ষার পরই চাষা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ছাদে ঢুকলে কাজেম এগিয়ে যায় ।
এসো, কি ব্যাপার! তুমি কাঁপছো কেন?

তোৎলাতে থাকে চাষা,

আমি কি করছি, আমার কোনো দোষ নেই ।

হেসে ফেলে কাজেম, হাসেন রানি । রানিই বলেন,

না না তুমি কোন দোষ করো নি । আমিই তোমাকে ডেকেছি । তুমি কি চাষা?
হ্যাঁ রানিমা ।

রানি ভালো করে লক্ষ করেন চাষাকে । হাঁটু সমান লুঙ্গি, দুই কি তিন জায়গায়
তালি, ধূলি-ধুসরিত পা, মাথায় ক্লক চুল, চোখের কোণে কালি, চোয়াল চূপসে গেছে ।

তুমি কি করো?

মাঠে হালচাষ করি রানিমা!

এই শিশি বোতল নিয়ে কোথায় যাও?

চাষা সাহস ফিরে পায় । রাজার দয়ার কথা সে শুনেছে, সেই রাজারই রানি
নিশ্চয়ই দয়াবতী, সে মনে মনে ভাগ্য খুলে গেছে আশা করে খুশি হয়ে ওঠে । বলে,

এই শিশিত ইকটু সষ্যের ত্যাল কেনবো, আর এই শিশিত আমার হাইতে
ছাওয়ালের জন্যে ওষুদ লেবো ।

দ্বিতীয় শিশির কথাটা বোধগম্য হয় না রানির কাছে । জিজ্ঞেস করেন কাজেমকে,
কি বললো?

বললো তার হাইতে ছেলের জন্যে ওষুদ কিনবে ।

অধৈর্য হয়ে ওঠেন রানি ।

ওই হাইতে ছেলে কাকে বলে?

উৎসাহিত হয়ে ওঠে চাষা । বলে,

আমি কই?

বলো ।

রানিমা, হাইতে হচ্ছে হাতে করে লিয়ে আসা । দাঁড়ান, আরো ভালো করে
বুঝাই । মনে করেন আমাদের রাজা মরে গেল, আর আপনে আপনার ছাওয়াল মিয়ে

সাথে করে, মানে হাতে লিয়ে আসে আমাক বিয়ে করলেন। সেই হাতে করে আসা ছাওয়াল মিয়ের নাম হাইতে ছাওয়াল মিয়ে।

চাষা যে উপমা দিয়ে রানিকে ব্যাপারটা বোঝায় তা রানির কডোটা বোধগম্য হলো বোঝার জন্য কাজেম তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, রানির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে যেন আঁশ্বন বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ঋতমত খেয়ে যায় চাষা। আবার তোৎলাতে তোৎলাতে বলে,

রানিমা, রানিমা!

চিৎকার করে ওঠেন রানি,

কাজেম।

বলুন।

চাষার স্পর্ধা দেখেছো? বলে কিনা রাজা মরে গেলে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাকে যদি বিয়ে করি! ডাকো, ডাকো জন্মাদকে।

রানি, ও চাষাভুষো মানুষ, ওর মতো জবাবই ও দিয়েছে।

তাই বলে এই উদাহরণ? বললাম না জন্মাদ ডাকতে?

কোনো জবাব দেয় না কাজেম। ঘুরে দাঁড়ায়। চাষার দিকে। তাকায়। মনে হচ্ছে কাজেম সমস্ত দৃষ্টিশক্তি দিয়ে চাষার গায়ের চামড়া ভেদ করে হাড়মাংস রক্ত মজ্জা শিরা উপশিরা দেখতে পাচ্ছে।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রানি,

এখনো ডাকলে না জন্মাদকে?

সোজা ঘুরে দাঁড়ায় কাজেম। রানির চোখে চোখ স্থাপন করে শান্ত, স্থির গলায় বলে,

আমিই আজ জন্মাদের ভূমিকায়।

তাহলে হত্যা করো ওই বর্বর চাষাকে।

মেঘমল্ল হয়ে জবাব দেয় কাজেম,

না! আর না!

অচেনা

নয় বছরের স্বপ্নার বোঝার কথা নয় মার ভেতরে একটা অস্থিরতা চলছে। কিন্তু সে বুঝে ফেলে। সহসা বুঝতে পারে বাবারও কেমন একটা অস্বাভাবিক আচরণ, কারণ তার মনে হয় কোনো কারণ ছাড়াই বাবা থেকে-থেকেই বড় বড় শ্বাস ফেলছে। সে দীর্ঘশ্বাসের কথা শুনেছে, বাবার অমন লম্বা লম্বা শ্বাস শুনে বোঝে এটাই দীর্ঘশ্বাস। মার অস্থিরতা দেখেছে মা একটা জায়গায় স্থির বসে থাকছে না, একটু পরপরই উঠে সজল দাদার ঘরের দরজায় খানিক দাঁড়িয়ে চলে আসে, কখনও ভেতরে গিয়ে বিছানায় বসে। স্বপ্নার মনে হয় কোথায় যেন একটা ব্যাপার ঘটছে। একবার ভাবে দাদিকে জিজ্ঞেস করবে, একবার ভাবে কথাটা সজলকে জিজ্ঞেস করাই ভালো। তার একমাত্র ভাই। দুই ভাইবোনের মধ্যে ছয় বছরের পার্থক্য থাকলেও স্বপ্নার মনে হয় ভাই-ই তার সবচেয়ে আপনজন, সবচেয়ে বড় বন্ধু। সে প্রথমে যায় সজলের ঘরে। সজল মাথার নিচে দুই হাত পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের সিলিং দেখছে।

স্বপ্নাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে মুখ ঘুরিয়ে বলে,

কিরে, কিছু বলবি?

দাদা, তুমি বলবে?

কি? কি বলবো?

দাদা, মা বাবা অমন করছে কেন?

সজল বোঝে স্বপ্না তার কাঁচা বয়স দিয়ে ঠিকই বুঝতে পেরেছে মা ও বাবার মধ্যে একটা ভয়ংকর ভাঙচুর চলছে। সে ভাঙচুরটা তাকে নিয়েই। কিন্তু সে কথা স্বপ্নাকে কিছুতেই বলা যাবে না। বললেই কেঁদে কেটে এমনকি চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে সমস্ত পরিকল্পনা তছনছ করে দিতে পারে। সজল মুহূর্তে এটাও বুঝে যায় পরিকল্পনা ভেঙে গেলেও তেমন কিছু নয়, কিন্তু তার গরে লোক জানাজানি হলে বিপদ সারা বাড়িতে, বাড়ির লোকজনের সবার। সজল আদর করে ডাকে,

আয়, কাছে আয়।

দাদা, মা বাবা অমন করছে কেন?

কী, কী করছে?

কেমন, কেমন যেন করছে। মা বাবা তো কখনও এমন করে না!

সজল স্বপ্নকে হাত ধরে বিছানার ওপর টেনে তুলতে তুলতে দ্রুত জামার খুঁট তুলে চোখ মুছে নেয়। বিছানায় বসিয়ে স্বপ্নার চোখে চোখ রেখে বলে,

তোমার নাম তো স্বপ্না! বল, রাতে কি স্বপ্ন দেখেছিস?

দাদা, চালাকি করো না। আমি ঘ্রিতে পড়ি। সব বুঝি।

হেসে ফেলে সজল।

তাহলে তো তুমি পাকা বুড়ি। তুমি যখন বুড়িই তখন তোমারই তো বোঝার কথা!

এবার সত্যিই চোঁচিয়ে ওঠে স্বপ্না। যে ভয় করছিলো সজল, সেটাই মনে হয় ঘটতে যাচ্ছে ভেবে সে ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। ছুটে আসে মা বাবা। দাদি আসে না। দাদি তখন জোহরের কাথা নামাজ পড়ছে। মা বাবা ছুটে এসে দেখলো সজল স্বপ্নার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করে বাবা,

কী? কি হয়েছে। স্বপ্না ওভাবে কাঁদলো কেন?

না। না। কিছু না। তোমরা যাও।

সজল কথাটা এতো সহজভাবে বলে যে সেটাও স্বপ্নার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। সে এক ঝটকায় সজলের হাত ছাড়িয়ে খাট থেকে নেমে দপদপ করে ঘরের বাইরে চলে গেলে মা বাবা সজল, তিনজনের একজনও বাধা দেয় না। যেন তিনজনই একসাথে বোঝে তাদের অস্থিরতা অস্বাভাবিকতা কোনো কিছুই স্বপ্নাকে বুঝতে দেয়া যাবে না, আপন মনে কেঁদে কেটে ওর শিশুমন যা বোঝার বুঝুক। সারাটা দিন স্বপ্না একা একা ঘুরে বেড়ায়, পুতুল বা খুঁটি কিংবা বুড়ি ছোঁয়া খেলতে পাশের বাসায় সখি আনুদের ওখানেও সে যায় না।

সন্ধ্যার পর সজল নিজের ঘরের দরোজা লাগিয়ে দিলে মা বাবা এমনকি দাদিও জিজ্ঞেস করে না দরোজা লাগালো কেন। সহসাই গোটা বাড়িই যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে স্বপ্নার কাছে। মনে হয় বাড়ির আনাচে কানাচে ঘরের কোণায় কোণায় নানা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, কিন্তু যে প্রবল অভিমান ও কষ্ট তাকে সেই যে ঘিরে আছে তা থেকে কিছুতেই মুক্তি মিলছে না। স্বপ্না এখন এটুকু বোঝে, এখন আর কোনো কিছুই স্বাভাবিক নয়।

স্বাভাবিক যে নয় সে তো মাসখানেকের বেশি সময় ধরেই বোঝা যাচ্ছে। স্বপ্না জেনেছে যুদ্ধ চলছে, অনেক অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের পাড়ায় এখনও সেই ধরনের কিছুই নেই বলে সে অনুমান করতে পারে না যুদ্ধের সত্যি সত্যিই চেহারা কেমন! মারামারি সে দেখেছে। আনুর সাথেই পুতুল খেলা নিয়ে তার মারামারি এমনকি চুল ছেঁড়াছিঁড়িও হয়েছে, পাড়াতেই বাড়ির সীমানা নিয়ে আজাহার মাষ্টার ও খবির দারোগার ছেলে মোকসেদের মধ্যে সে কী ভীষণ লাঠালাঠি, রক্তারক্তি ব্যাপার। এটা মারামারি, কিন্তু সেই মারামারি কতোখানি গুরুতর হলে যুদ্ধ হয় তা স্বপ্না অনুমান করতে পারে না বলে এই অস্বাভাবিক বাবা-মা-তাই-বাড়ির পরিবেশ

তার চোখে অচেনা হতে হতে সব, সবাই দূরে বহুদূরে হারিয়ে যেতে থাকে, সে গাড়ি
সন্ধ্যার আকাশে চোখ গঁথে চুপচাপ বসে থাকে।

দাদি শুধু একবার বলে,

ভর সন্ধ্যায় আঁধারে বসে থাকতে নেই।

মুখ খামটা দিয়ে ওঠে স্বপ্ন।

আমি বসে থাকি না থাকি তোমার কি? তুমি বুড়ি, তোমার সখ হয় দিনদিন করে
নাচো না হয় গান গাও।

অন্যদিন হলে দাদি হয়তো গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে দিতো না হয় মাকে
ডেকে বলতো বৌমা তোমার মেয়ে এ কেমন ব্যবহার শিখেছে? আশ্চর্য হয় স্বপ্ন।
দুটোর কোনোটাই না করে দাদি স্বপ্নার মাথা নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে মাথা কপাল
ও মুখে পাগলের মতো চুমু দিতে দিতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে স্বপ্নার আবার
মনে হয়, দাদি! দাদিও কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে! সে অতি কষ্টে মাথাটা
ছাড়িয়ে নিয়ে শুধু বলে,

দাদি, তুমিও!

থমকে যায় দাদি। ওর বাবা-মা সারাদিন ওর সাথে যে আচরণ করেছে তা দাদির
চোখ এড়ায় নি, শেষে সে নিজেও সেই আচরণ করে বসলে স্বপ্নাকে ছেড়ে দিয়ে দুই
হাতে বাতাস খামচাতে খামচাতে ঘর ছেড়ে বারান্দা ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে
যেতে চিৎকার করে বলে,

বৌমা, বৌমা, শিগগির এসো!

রান্নাঘর থেকে মা, বড় ঘর থেকে বাবা, সজলের ঘর থেকে সজল ছুটে বেরিয়ে
এলে দাদি কাঁপতে কাঁপতে আঙুল তুলে শুধু তার ঘর দেখিয়ে বলে,

স্বপ্না! স্বপ্না!

চেনিয়ে ওঠে মা,

কি হয়েছে স্বপ্নার?

কোনো জবাব নেই দাদির কাছ থেকে। মা-বাবা সজল ও দাদি একসঙ্গে ঘরে
টুকে দেখলো স্বপ্না জানালার শিকে মাথা ঠেকিয়ে পশ্চিম দিগন্তের গাড়ি টকটকে লাল
আকাশ দেখছে। তার চোখের পাতা স্থির। বাবা তার মাথায় হাত রেখে শান্ত গলায়
ডাকে,

মা, মা স্বপ্না!

বাবা, মা, ভাইয়া, দাদি, তোমরা আমার সাথে এমন ব্যবহার করছো কেন? আমি
কি করেছি?

জড়িয়ে ধরে মা।

না মা, তুমি কিছুই করিস নি।

তাহলে তোমরা এমন করছো কেন?

বাবা অবাক হয়ে ভাবে মাত্র নয় বছরের স্বপ্না হঠাৎ বড় হয়ে গেল কখন? সত্যিই তো তারা কেউই আজ সারাদিন সুস্থ মানুষের মতো ব্যবহার করে নি স্বপ্নার সাথে। এখন তার খেলে বেড়ানোর বয়স, পুতুল বিয়ে দেবার বয়স, ঘাসপাতা বালি ইটের টুকরো দিয়ে রান্না রান্না খেলে চপচপ করে খেয়ে উহ! কী ঝাল, ওহ! কী মজা বলে উল্লাস প্রকাশ করার বয়স, কিছু মেয়েটি একদিনে যেন নয় বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বাবা স্বপ্নাকে বিছানায় বসিয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে,

মারে! তুমি ক্লাস খিতে পড়ো, কিছু কিছু বুঝতে পারো, চারদিকে কি ঘটছে না ঘটছে তার অনেক কিছুই তুমি জানো না। আমরা জানি। দেশে এখন যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ আমাদের পাড়া থেকে বোঝা না গেলেও আমরা দেশ বিদেশের রেডিওর খবর শুনে বুঝি, কী একটা মহা বিপদ যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে। আমরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে, রেডিওর সাউন্ড কমিয়ে বিবিসি আকাশবাণীর খবর শুনি তুমি দেখেছো, আমরা শুনি যুদ্ধ এখন কি অবস্থায় আছে, কোথায় কোথায় আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা যুদ্ধ করছে, দেশের ভবিষ্যৎ কি, আমাদের কি হবে তাই শুধু ভাবছি, তোমার মা ভাবছে, তোমার দাদি ভাবছে, তোমার ভাইয়া ভাবছে, আমরা বড় বলে অনেক কিছুই বুঝতে পারি, তাই আমাদের সবার মন খারাপ, খুব খারাপ, মা স্বপ্না, তোমাকে ওইসব বিপদের কথা বলে মন খারাপ করিয়ে দিতে চাই নি।

সহসা প্রশ্ন করে স্বপ্না,

কিন্তু আজ তোমরা আমার সাথে একেবারে অন্যরকম ব্যবহার করছো কেন?

জ্ঞান হেসে জবাব দেয় বাবা,

আজ আমাদের মনটা একটু বেশিই খারাপ।

কেন?

কুঁপিয়ে কঁদে ওঠে মা।

সে তুই বুঝবি নে, তা তুই বুঝবি নে মা!

মা স্বপ্নাকে বুকের মধ্যে এমনভাবে চেপে রাখে যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোতে পারে না, শুধু শোঁতানির মতো একটা শব্দ বেরোতে থাকলে মনে হয় চরাচরে এই শব্দটি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সংসারের পাঁচটি মানুষ এখন নিশ্চল জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে ও বসে থাকে। টিকটিক করে দেয়াল ঘড়ি চলছে, মাথার উপর ক্যান চলছে, কাছেই ডোবায় অনেকক্ষণ থেকেই একটা সাপে ধরা ব্যাঙের একটানা ককণ আর্তনাদ চলছে। কিছুক্ষণ পর মা স্বপ্নাকে নিয়ে স্বপ্নার নিজের বিছানায় না শুইয়ে তাদের বিছানায় শোওয়াতে গেলে সে অবাক হয়।

তোমাদের বিছানায় কেন মা?

আজ থেকে তুই আমাদের সাথে থাকবি।

দাদির ঘরে কে থাকবে?

দাদি স্বপ্নার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জবাব দেয়,
দাদি একাই থাকতে পারবে।

এই জবাবটিও অস্বাভাবিক লাগে। স্বপ্নার মনে আছে, সে চারবছর বয়স থেকে কিছুদিন দাদির সাথে একই খাটে থাকতো, পরে ঘরেই আরেকটা সিঙ্গল খাট ফেলে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দাদির ঘরে থাকা বড় আরাম ও আনন্দের। স্বপ্নার মনে হয় তার দাদি গল্পের জাহাজ। দাদি গল্পকে গল্প না বলে শাস্তর বলে। যা খুশি বলুক। স্বপ্নার লোভ ওই শাস্তরের গল্পগুলো দেখা। দাদি এমনভাবে বলে যে মনে হয় যেন ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে।

সেই দাদি বেশ কিছুদিন জমিয়ে শাস্তর বলে না। কেন বলে না দাদিকে জিজ্ঞেস করলে প্রায়ই স্বপ্নার চুলে বিলি কেটে কেটে যুদ্ধ সম্পর্কে টুকটাক যা জানে তা বলে, যা বলে তার চাইতে দম নেয় বেশি, মাঝে মাঝে পানিও খায়, কখনও কখনও শূন্য দৃষ্টি মেলে থাকতে থাকতে একসময় আল্লা আল্লা করে উঠে বলে, আল্লা, এই গল্পব কবে শেষ হবে?

সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত মা স্বপ্নাকে ছেড়ে ওঠে না। মাঝে দাদি খালায় স্বপ্নার ভাত তরকারি মার কাছ দিয়ে যাওয়ার পর মা তাকে খাইয়ে দিতে থাকলে আবার অবাক হয় স্বপ্না। এটাও তার কাছে আরেক অস্বাভাবিক ব্যাপার। সে বড় হয়েছে। নিজ হাতে খেতে পারে। সে নিজে কৈ মাছ বেছে খায়। তারপরেও মা খাওয়ায় কেন?

মা, আমি তো নিজেই খাই!

মা কোনো কথা না বলে একমনে খাওয়াতে থাকলে স্বপ্নার হঠাৎ মনে হয় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে ওয়াক ওয়াক করে ভাতের দলা উগড়ে দেয়। দিতে দিতেই দেখলো তার বমির শব্দে বাবা দাদি ও ভাইয়া তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন করতে যায় স্বপ্না কেন, এভাবে ঘিরে আছো কেন, কিন্তু কিছুই না করে শুধু ঢকঢক করে একগ্লাস পানি খেয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ে। আর চোখ খোলে না। সজল কাছে বসে মাথায় হাত বুলায়ে দিতে থাকলে স্বপ্না চোখ না খুলেই এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দেয়। সে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় বাড়ির সবাই, এমনকি তার পোষা বিড়ালটাও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সারাদিনে সে একটাবারও তার কাছে আসে নি। বিড়ালটা খুব কাছেই করুণ গলায় মিউমিউ করছে। চোঁচিয়ে ওঠে স্বপ্না,

তাড়াও, তাড়াও! ওটাকে তাড়াও এখন থেকে!

এরপর স্বপ্নার আর কিছু মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে মা বাবার ঘরের দরজায় বড় ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। শব্দেই তার ঘুম ভাঙে। প্রথমেই তার মনে হয় আমি কোথায়! ডানপাশে তাকায় সেখানে দাদির খাট নেই, দাদি কোথায় গেল? সে প্রাণপণে শুধু একটা ডাকই দিতে পারে,

দাদি!

ডাক দিয়েই উপলব্ধিতে আসে সে মা বাবার বিছানায়। মা তাকে সঙ্ক্যারাতে তাদের বিছানায় নিয়ে এসেছে। আর তখনই সে বোঝে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ সত্য। বালিশ থেকে দ্রুত মাথা তুলে আলো আঁধারিতে দেখতে পায় দরজার দুটো পাল্লাই খোলা, চৌকাঠের আগে পিছে চারটি মানুষ দাঁড়িয়ে।

মা!

এই তো মা, আমি এখানে।

তোমরা দরজার কাছে কি করো?

উত্তরের অপেক্ষা করে না স্বপ্না। দুই হাতে মশারি টেনে তুলতে গিয়ে মশারি বাঁধার দড়ির খানিকটা ছিঁড়ে চলে আসে, তার জন্যে থমকেও যায় না, লাফ দিয়ে নেমে দরজার কাছে এসে লষ্ঠনের স্বল্প আলোয় দেখলো দাদি বাবা ভাইয়া মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে, শুধু মায়ের কোঁপানি শুনতে পাওয়া যায়, বাবার বড় ও গভীর একটা শ্বাস কানে আসে, দাদির আত্মা তুমি রহমানুর রহিম বোঝা গেল, আর তার সজল ভাইয়া? স্বপ্না দেখলো সজল তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে। সজলের চোখে পানি আছে কিনা তা স্বল্প আলোয় বুঝতে পারে না, তবে স্বপ্না এটা বুঝতে পারছে তার ভাইয়া কোথাও চলে যাচ্ছে। সজলের কাঁধে শুধু একটা কাপড়ের ব্যাগ। গলা চিরে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বাবা মুখ চেপে ধরে স্বপ্নার। ছটফট করে উঠে বাবার হাত ছাড়াতে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বাবা বললো,

স্বপ্না, মা স্বপ্না! বিপদ! আমাদের বড় বিপদ! চেষ্টাও না মা, চেষ্টাও না। পাড়ার লোক বুঝতে পারলে আমরা কেউ বাঁচবো না। বিপদ! আমাদের খুব বিপদ!

স্বপ্নাকে চেষ্টা কতে হয় না। বাবাই হাত সরিয়ে নেয়। ঠিক তক্ষুনি সজল স্বপ্নাকে কোলে তুলে নিয়ে কপালে মুখে পানলের মত চুমু খেতে খেতে বলে,

স্বপ্না, স্বপ্নারে, আমি চলে যাচ্ছি!

কোথায়?

যুদ্ধে।

যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে এতো লুকোছাপা কেন মাথায় ঢোকে না স্বপ্নার। ছোট ছেলেমেয়েরা যা করে তা হচ্ছে মারামারি, আড়ি দেয়াদেয়ি, কথা বন্ধ, কিন্তু এ কেমন মারামারি যে তাকে মারামারি না বলে যুদ্ধ বলে? যুদ্ধ কাকে বলে বুঝতে না পেরে স্বপ্না অল্পট শব্দ শুধু উচ্চারণ করে,

যুদ্ধ!

কথার জবাব দেয় বাবা।

হ্যাঁ মা, যুদ্ধ। তুমি বড় হলে বুঝতে পারিস্তানিরা পক্ষির মতো, কুকুর বেড়ালের মতো আমাদের ভলি করে মারছে, দালালরা আমাদের পাকিস্তানিদের কাছে ধরিয়ে দিচ্ছে, তারা যে কতোজাবে অত্যাচার করছে মা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! সবচেয়ে বড় ভয় তোমার ভাইয়ের বয়সী ছেলেদের নিয়ে। ওদের যখন-তখন

যেখানে-সেখানে থেকে ধরে নিয়ে যায়, মেরে ফেলে নদীতে ভাসিয়ে দেয়, সজলকে বাড়িতে রাখতে আর সাহস পাই নে মা, কে কোনদিন ধরিয়ে দেয়, তোমরা দুটি ভাইবোন, আমাদের আর কি আছে, আল্লা, আল্লা, আমার সজলকে সহি-সালামতে রেখো আল্লা, তোমার হাতেই ওকে তুলে দিলাম!

স্বপ্নার সহসা মনে হয় সে বড় হয়ে গেছে। সজলের একটা হাত ধরে বলে,
ভাইয়া, তুমি কবে আসবে?

চারটি মানুষের ফোঁপানো কান্নার মধ্যে স্বপ্না সজলের একটা কথাই শুধু বোঝে,
আসবো, শিগগির আসবো।

রাতের অন্ধকারে সজল হারিয়ে খেলে ঘরের চারটি মানুষ শুধু অন্ধকার দেখে। আকাশের তারা দেখে, বাইরে খোলা মাঠে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলছে দেখে, পূর্ব আকাশে কৃষ্ণপঙ্কের চাঁদের উদয় দেখে। রাতের বাকি অংশে আর কেউ ঘুমায় না। মা দরজার চৌকাঠের উপরেই বসে থাকে, বাবা এঘর ওঘর পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝেই বলে,

স্বপ্নার মা, কী করলাম, এ আমরা কী করলাম? ছেলেটা তাও চোখের সামনে ছিলো, দেখতাম আছে, কিন্তু এখন কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কি খাবে উহ্! কী কঠিন পরীক্ষায় তুমি ফেললে আল্লা?

মা কোনো জবাব দেয় না। শুধু দাদি বলে,

আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়েছো, আল্লাই হেফাজত করবে।

সহসা তিনজনকে অবাক করে দিয়ে স্বপ্না বলে,

বাবা, তুমিই না বললে পাকিস্তানিরা যেভাবে মানুষ মারছে, তাতে ভাইয়াও যদি মারা পড়ে? গেছে, ভালোই তো হয়েছে!

মা চৌকাঠ ছেড়ে ছুটে এসে স্বপ্নাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে কি বলে বুঝতে পারে না স্বপ্না। তার শুধু মনে হয়, সে ভুল বলে নি।

কথা বলে বাবা।

স্বপ্নার মা, স্বপ্না মনে হয় ঠিকই বলেছে। কিছুই না করে চোখের সামনে অসহায়ের মতো মরতে দেখলে সহ্য করতে পারতে? আমি পারতাম? মা, স্বপ্না পারতো? তার চেয়ে যুদ্ধে গিয়ে যদি অন্তত দুটো পাকিস্তানিকেও খতম করতে পারে, খতম করে মারাও যায়, সে মৃত্যুও অনেক বড়। স্বপ্নার মা, চিন্তা করে দেখো, আমরা কি নিজেরাই সজলকে সামনে ঠেলে দিই নি? কী করতে পারতাম বসো? আমরা ঘরে থেকে এক আল্লা আল্লা করা ছাড়া আমাদের আর কী করার আছে? মন শক্ত করো স্বপ্নার মা, মন শক্ত করো। আমাদের সজল ফিরে না আসা পর্যন্ত বুকে পাথর বেঁধে থাকো।

স্বপ্নাও ভাই বোঝে তার সজল ভাইয়া ফিরে না আসা পর্যন্ত সবাইকে বুকে পাথর বেঁধে থাকতে হবে। একসময় মনে হয় পানিতে তার চোখ ভরে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে

চোখ হাত দিয়ে দেখে পানির লেশমাত্র নেই। শুকনো খটখটে। তখন সে নিজেই মা বাবার হাত ধরে বিছানায় যায়, দাদিকে বিছানায় পাঠায়, সারারাত না ঘুমিয়ে কাটায়। বাকি রাত কেউ কোনো কথা বলে না।

স্বপ্নকে দেখে সবচেয়ে বেশি অবাক হয় বাবা। মনে মনে বলে, মেয়েটা আমার রাতারাতি এতো বড়ো হয়ে গেল কি করে? জিজ্ঞেস করে,

হ্যাঁ গো স্বপ্নার মা, মনে হয় না স্বপ্না অনেক বড় হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়।

সজল এসে দেখলে হয়তো চিনতেই পারবে না।

হেসে ফেলে মা।

কী যে বলো না! আপন বোনকে দেখে চিনতে পারবে না?

না স্বপ্নার মা, কথা তা না। মানুষের বয়সে বড় হওয়াই বড় না। দেখছো না, আমাদের স্বপ্না এখন মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে যে মনে হয় বয়স কতো, মনে হয় পাকা বুড়ি।

স্বপ্নার বাবা, ও হঠাৎ বড় হয়েছে কবে বলতে পারো?

কবে?

আমাদের সজল যখন চলে যায়।

চমকে ওঠে বাবা। মা একবিন্দু মিথ্যে বলে নি। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে, ভূমি, ভূমি বুঝলে কি করে?

মা বড় একটা শ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে জবাব দেয়,

ও যখন অভিযোগ করে বললো ভাইয়া চলে যাবে তোমরা আমার কাছে লুকালে কেন? আমি কি জনে জনে বলে বেড়াতাম? আমার ভাই এখানে পড়ে পড়ে মার খেয়ে গেলে আমার কষ্ট লাগতো না? তোমরা আমাকে ছোট ভেবে কিছুই জানতে দিলে না, বুঝতে দিলে না! মা, বাবা, আমাকে যদি বুঝিয়ে বলতে তাহলে আমি ভাইয়াকে আরো ভালো করে দেখতাম, সারাদিন একসঙ্গে কাটাতাম, এ তোমরা কি করলে বলো? কী অন্যায় করেছি আমি?

আর কোনো প্রশ্ন হয় না, আর কোনো জবাব আসে না, দুটি প্রাণী নিরুত্তর থেকে স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে সজলের ছবি ঐকে দেখে।

সজল চলে যাবার সতেরো দিনের মাথায় পাশের পাড়ার হামিদ খবর আনে। সজল ভালো আছে, আগরতলায় মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে ট্রেনিং নিচ্ছে। মা শুধু জানতে চায়,

হ্যাঁ বাবা, খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হয়তো?

চাচিমা, একি বাড়ির যতো হয়? ওই হিসাবের খাওয়া। কষ্ট তো আছেই!

মা কেঁসে উঠলে ছুটে আসে স্বপ্না।

মা, ভাইয়াকে তোমরাই যুদ্ধে পাঠালে! কষ্ট হলে কি করবে? এখানে থেকে মারা যাওয়ার চাইতে ওখানেই ভালো আছে না?

স্বপ্নার জবাবে মা-বাবা যতোটা অবাক হয় তার চেয়ে বেশি হয় হামিদ। হেসে বলে,

স্বপ্না, তুমি এতো বোঝো কি করে?

ঠোট উল্টে জবাব দেয় স্বপ্না,

কী জানি! মন বললো, বললাম।

চাচিমা, মনে হচ্ছে স্বপ্না একটা পাকা বুড়ি।

হামিদ ভাই, আমিও কি বলি না বলি কিছুই বুঝি নে।

স্বপ্নার জবাবে দাদি মা বাবা হামিদ হাসতে থাকলে চারজনের হাসির দিকে স্বপ্না খানিক তাকিয়ে থেকে ধীরে পারের ফিরে যেতে থাকে। চারজন আবার খেমে যায়, খেমে কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে মাটি দেখে, ঘাস দেখে, মেঘ দেখে, মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে মুরগির খাবার খাওয়া দেখে।

রাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে জানতে চায় স্বপ্না,

ভাইয়া কবে আসবে?

জানি নে মা, জানি নে।

হামিদ ভাই কিছু বলে নি?

না।

ও! মা, তোমরা সেদিন মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী কী সব বলেছিলে? মুক্তিবাহিনী কারা মা?

ওই যারা লড়াই করছে।

তাদের কেমন দেখা যায়?

হেসে ফেলে মা। বাবা জবাব দেয় স্বপ্নার প্রশ্নের,

মুক্তিবাহিনী নাকি দেখা যায় না।

তার মানুষ না?

হ্যাঁ তারা মানুষ। তোমার ভাইয়া যেমন মানুষ। তবে তারা দেখতে খুব সুন্দর, যারা দেখেছে তারা বলে মুক্তিবাহিনী নাকি দেখতে ফেরেশতার মতো। চোখ সরানো যায় না। এতো সুন্দর যে বলে শেষ করা যায় না মা!

স্বপ্না আর কোনো প্রশ্ন করে না। চোখ বন্ধ করে সজলকে দেখতে চেষ্টা করে তার ভাইয়া কতো সুন্দর হয়েছে। সজল সুপুরুষ হয়ে উঠছে এমন একটি কথা পাড়ায় বলাবলি হয়, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে চালু আছে, কিন্তু বাবা যেরকম সুন্দর বললো তাতে নিশ্চয়ই টকটকে গায়ের রং, এতোই সুন্দর যে চোখের পাতা পড়ে না। স্বপ্নার মনে হয় কালই তার খেলার সাথি আনুকে ভাইয়ার কথা বলবে, তার ভাইয়া যে রাজপুত্রের মতো দেখতে সুন্দর হয়েছে তা বলবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় ভাইয়া

সম্পর্কে কিছুই বলা যাবে না। বলা বারণ, ভাইয়া যে যুদ্ধে পাকিস্তানিদের মারার জন্যে গেছে একথা জানাজানি হলে তারাই মারা যাবে। তাহলে স্বপ্না কাকে তার ভাইয়ার গল্প শোনাবে? এমন গল্প না শোনাতে আনন্দ কোথায়, গর্ব কোনখানে? তার খেলার সাথিরা তখনবে আর অবাকের উপর অবাক হয়ে যাবে, অথচ বলা নিষেধ। মা বাবা নিজের ছেলের কথাও মানুষকে বলবে না? কালই দাদিকে সাক্ষী রেখে মা বাবাকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে স্বপ্না। করবেই করবে।

স্বপ্না প্রশ্ন করে, কিন্তু কোনো জবাই মেলে না। এই বাড়িতে সজল নামে যে একটি ছেলে ছিলো, বড় ভালো ছেলে ছিলো, ছাত্রও ভালো ছিলো, আচারে ব্যবহারে খুবই নম্র সভ্য ছিলো তা যেন কেউ মনেই করতে চায় না এখন, সবাই এরকম হয়ে যায় কেন? মাঝে মাঝেই স্বপ্না দেখে মা রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে তা আছেই, দাদি নামাজ পড়তে বসে কাঁদে, মোনাজাতের সময়ই বেশি কাঁদে, বাবা সারা দিন-রাতে ঘুরে ফিরে ভাইয়ার বইখাতা উল্টে-পাল্টে দেখে, অথচ জিজ্ঞেস করলে এমন ভাব দেখায় যেন ওই নামে কেউ ছিলোই না। পাড়াতেও দুই চারজন সজলের কথা জিজ্ঞেস করেও সদুত্তর পায় নি, স্বপ্না নিজেই বাবাকে বলতে শুনেছে সজল? ও তো ওর নানাবাড়িতে থাকে! বাবার মিথ্যাচার যেন কেমন কেমন লাগে স্বপ্নার কাছে।

হঠাৎ একদিন দাদি বলে,

স্বপ্না, তুই আমার কাছে থাকবি?

অবাক হয় স্বপ্না।

কেন, এতোদিন পর কেন?

আমার না রাতে ভয় ভয় করে।

হাসে স্বপ্না,

আমি যে এতোদিন থাকি নি, তোমার ভয় করে নি?

না।

তাহলে আজ কেন?

স্বপ্নার জবাবে দাদি ওকে বুকের গভীরে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ মাথায় হাত বুলায়, কপালে ঘুঁষে চুমুও খায়, দাদির হঠাৎ আদরে প্রথম হকচকিয়ে গেলেও পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবে আবার এ কোন খেলা? সজল চলে যাওয়ার দিন বাড়ির চারটি মানুষ তার সঙ্গে অচেনা মানুষের মতো আচরণ শুরু করেছিলো, আবার যেন সেই রকম। তাহলে কি আর কেউ রাতের আঁধারে চলে যাবে? সে কি বাবা? হাত পা অবশ হয়ে আসতে থাকে স্বপ্নার। চাপা চিৎকারে জিজ্ঞেস করে,

দাদি, দাদি, আমাকে তোমার কাছে রাখতে চান্ধো, বাবা কি চলে যাবে?

হাসে দাদি। বলে,

না রে পাগলি, না। বাবা বাবে না। আমিই তোকে বলছি। আমার একা থাকতে ভালো লাগে না। তুই আজ থাক। থাকবি তো?

দাদি এতো কাতর স্বরে বলে যে স্বপ্না না করতে পারে না। সে শুধু এটা শর্ত জুড়ে দেয়,

শাস্তর বলতে হবে কিন্তু।

দাদি গরুর গাড়িতে প্রথম স্বপ্নরবাড়ি যাচ্ছে, দাদা কিভাবে গাড়ির পেছন পেছন হাঁটছে আর মাঝে মাঝে গাড়ির ছেয়ের পর্দা তুলে বৌ দেখছে গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্না কখন যে ঘুমিয়ে গেছে টের পায় নি, রাতে কখন যে ঘুম ভেঙেছে তাও বুঝতে পারে নি, শুধু পাশের মানুষটির গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারে সে তার মা নয়। দাদি। তক্ষুনি তার মায়ের জন্যে মন হু হু করে ওঠে। দ্রুত বিছানা ছেড়ে ওঠে স্বপ্না। সঙ্গে সঙ্গে দাদি তার হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলে সে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে মা মা বলে বাবা-মার ঘরের দরজার সামনে গিয়েই দেখতে পায় বাবা খাটের ওপর স্থির হয়ে বসে, দেখতে পায় মা কাত হয়ে শুয়ে, আরো দেখে ঠিক তারই শোবার জায়গায় চাদর মুড়ি দিয়ে আর কে যেন শুয়ে আছে।

মা! কে? কে ও?

মা চোখের পলকে ঘুরে শুয়ে স্বপ্নার চোখে চোখ রেখে, মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে শশশ শব্দ তুলে জানিয়ে দেয় কোনো কথা নয়, কোনো শব্দ করা যাবে না। স্থির হয়ে যায় স্বপ্না। শুধু এটুকু বোঝে একটা রহস্য ওখানে জমাট বেঁধে শুয়ে যাচ্ছে। বাবা চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে,

স্বপ্না, ও সজল।

স্থির দাঁড়িয়ে যায় স্বপ্না। ভাই! তার সজল ভাই! তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় শুয়ে থাকে মানুষটিকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই মায়ের নিষেধ মনে হতেই হাত বাড়িয়েও টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে বলে,

আমাকে বলো নি, তোমরা কেউ বলো নি!

কথাগুলো শুনতে পায় বাবা। সে পরম আদরে এক হাতে স্বপ্নার মাথাটা নিজের বুকের কাছে নিতে থাকে, আরেক হাতে সজলের মুখের কাছে চাদরটুকু সরিয়ে দিলে স্বপ্না দেখে বৃষ্টিতে ভেজা রোদে পোড়া একটা কালচে তামাটে মুখ কী গভীর প্রশান্তিতে ঘুমুচ্ছে। চোখ ফেরাতে পারে না স্বপ্না। থেকে থেকেই তার মনে হতে থাকে এতো সুন্দর, এতো সুদর্শন তার ভাই, সত্যিই কি তার ভাই নিশু হয়ে শিশুর পুতুলের মতোই অল্পটা বুকের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। তার ভাইয়া আজ যে রাতে আসবে এই কথাটা তাকে যে আগে কেউ বলে নি, এই অভিমানটা তখন তার আর থাকে না।

পানেট

আমার সামনে আমাকেই কথাটা না বললে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। আমার ধারণা কোনোভাবেই বিশ্বাস করার মতো কথা এটা নয়। আপনি শুনলে নিশ্চিত বলবেন মফিজের মাথা খারাপ হয়ে গেছে বলে অস্বাভাবিক কথা বলতে পারে। হবে হয়তো। কিন্তু আমি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষটা পাশে বসে সিগারেট টানছি, ওর কথা শুনছি, ওর সিগারেট শেষ হয়ে গেলে আমার কাছ থেকে চাইলো, আরেকটা দে তো! ভালো তো সিগারেটটা!

তুমি না হয় পুরো প্যাকেটটাই রাখো।

মফিজ তা না রেখে স্রেফ একটাই সিগারেট বের করে আগের সিগারেটের আগুন থেকে নতুনটা ধরিয়ে খুব তৃপ্তি করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, জানিস রফিক, এই পনেরো-ষোলো দিনে উনিশরকম সিগারেট খেয়েছি!

বলো কি?

হ্যাঁ। যতই ভাবি খাবো না, ততই দেখি বেশি বেশি খাচ্ছি। কোনো ব্র্যান্ড বাছ-বিচার নেই। আসলে বুঝতে পারছি, প্রচণ্ড টেনশন নিয়ে থাকতে হচ্ছে বলে টেনশন তাড়ানোর জন্যে একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।

মফিজের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করছি। আমার স্থির বিশ্বাস জানো এই সিগারেটটা শেষ হয়ে গেলে ও আরেকটা চাইবে। আমি তো পুরো প্যাকেটটাই দিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটার বেশি দুটো কিছুতেই নেবে না। ওর সিদ্ধান্তের ওপরই ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে শরীরটা সবেমাত্র তুলেছি, তখনই মফিজ সেই অবিশ্বাস্য কথাটা শোনায়।

যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, তোর ঘর আছে, ঘরেই তো যাবি। যা!

মনে হয় মফিজ চাইছে না আমি যাই। আবার বসে পড়ে বলি, তুমি মনে হয় কিছু বলতে চাইছ!

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে মফিজ। ওর এই হাসি আমার পরিচিত। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কারো চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলে বুঝতে পারতাম এখন একটা মজার ঘটনা বা গল্প বলবে। আরো লক্ষ করেছি, ও পারতপক্ষে

শ্রোতার মুখ থেকে চোখ সরায় না, পাছে ওর কথাগুলো শ্রোতার কানের এপাশ-ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

জানিস রফিক, এজন্যেই আমি তোকে পছন্দ করি।

মফিজের এটাও আরেকটা খেলা। অন্যের চোখে দৃষ্টি গেঁথে রেখে খানিকক্ষণ খেলিয়ে নেয়। খেলানোর সময় যদি সিগারেট টানতে থাকে তাহলে সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে বের করবে, মুখ দিয়ে রিং বানিয়ে বের করবে, যেন চোখে ধোঁয়া লেগে চোখ সরু হয়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে সরু চোখে শ্রোতাকে দেখে যায়, দেখেই যায়, যেন গোয়েন্দা অপরাধীর চোখের শিরা-উপশিরা ও বুকের রেখা পড়ে অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছে। এখানে, এই সকালে ওর বাড়ির পাশেই রাস্তায় বসে ওর কথা শোনার জন্যে আমি যেখানে মুখে কিছু প্রকাশ না করেও ছটফট করছি, সেখানে মফিজ মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে নিজেকে আরো গুটিয়ে নিচ্ছে। অথচ ওর অন্যের চোখে চোখ রেখে কথা বলার চরিত্র সম্পর্কে যখন আমি খুব ভালো জানি, তখন বুঝতে পারছি, ও এই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলবে, পাকিস্তানি আর্মির জ্বালাও-পোড়াও মারো-কাটো নিয়ে কথা তুলবে এবং বলবে ওর ঘরবাড়ি সহায়-সম্পত্তি সব পুড়ে যাওয়ার করুণ ঘটনা। জানি, সে ঘটনা শোনা খুব কষ্টকর। তবু শুনতে হবে। শুনতে হবে বলেই আমি সকালবেলা ওর কাছে ছুটে এসেছি।

আমি আসলে ঢাকা থেকে ছুটে এসেছি বাড়িতে। বাড়িতে আমার মা ভাই-বোন আছে, ২৫ মার্চের পর আমার একমাত্র মেয়ে ও স্ত্রীকে আরো নিরাপত্তার জন্যে পাবনায় পাঠিয়ে ঢাকায় একা একা দিন কাটিয়ে, বাড়ির খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে যখন ধৈর্য দুমড়ে মুচড়ে যেতলে হরে যাওয়ার অবস্থা, তখনই বাড়ি থেকে লোকমুখে হলেও বিশ্বস্ত খবরই আসে, ভালো আছে, ভালো আছে সবাই। এই ভালো আছে ও ভালো নেইয়ের মধ্যে যে-খবরটা আমাকে গভীরভাবেই বিষণ্ণ করে, সেটি হচ্ছে মফিজের বাড়িটি নেই। মিলিটারি পুড়িয়ে দিয়েছে।

আমার একমাত্র ফুকাতো ভাই মফিজ। আমার চাইতে আট-নয় মাসের বড়। বড় বলে তুমি সম্বোধনে সম্মান দিই, কিন্তু একসঙ্গে সিগারেট খাওয়া, সুন্দরী মেয়ে মহিলাদের দেখলে আহা উহ্ করে শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ নিয়ে গবেষণা করতেও আমাদের বাধে না, ওখানে বড়-ছোট কাজ করে না। বয়সের অধিকারে মাঝে মাঝে মুকুবিয়ানা কলাতে চাইলেও সেটা কখনো মাত্রা ছাড়ায় না, কখনো কখনো আমি মফিজকে মনে করিয়ে দিই,

বড় ভাই কী কখনো ছোটভাইকে বিড়ি খাওয়া শেখায়?

হাসে মফিজ।

আসলে কী জানিস রফিক? ধূমপানটান মাঝে মাঝে একা করতে ভালো লাগে না। সঙ্গীসাথী থাকলে ব্যাপারটা জংশন হয়। আর তুই যখন হাতের কাছেই আছিস, তখন তোকেই সঙ্গী বানাই।

কিন্তু আক্কা টের পেলে হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

টের পাওয়াবি না!

কিন্তু গন্ধ?

লে বাক্কা! সেটাও শিখিয়ে দিতে হবে? শোন, গন্ধ মারার জন্যে জামপাতা না হয় এলাচ কিংবা লবঙ্গ চিবোবি! গন্ধ বাপ বাপ করে পালাবে।

মফিজের এই শিক্ষা কাজে লাগে নি। কলেজে পড়ার সময় আক্কা সিগারেটের গন্ধ বুঝতে পেরে কষ্টে ও ঘৃণায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তা দেখে মনে হয়েছিল, এর চাইতে দুটো চড়খাপ্পড় খাওয়াও ছিল অনেক ভালো। তবু আমি ধূমপান ছাড়তে পারি নি, কিন্তু শুনেছি আমার ধূমপান-গুরু মফিজ সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। শৌখিন ধূমপায়ীদের মতো খায়। কিন্তু সে কত বছর আগে? মনে পড়ে না।

ততদিনে আমি আর পাবনায় নেই। আমি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা বহুদিন থেকেই। বাড়ি যাই না কতদিন, তাও মনে পড়ে না। হঠাৎ গেলে একদিন, বড়জোর দুইদিন, আবার ঢাকা। রাস্তায় বেরোলে পরিচিত মুখ চোখে পড়ে না। আমার নিজ জন্মশহরে এক বিদেশী অতিথির মতোই ঘুরে বেড়াই। হাতেগোনা যে-কয়বার গিয়েছি, সব বারই যে মফিজের সঙ্গে দেখা হয়েছে তা-ও নয়। আমাদের বাড়ি লাগোয়া বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনোবার ফুপুর বাড়ি যাই নি। মফিজের খোঁজ নেওয়াও প্রয়োজন মনে করি নি। রাস্তায় দেখা হলে, কিরে, কবে এলি? জিজ্ঞেস করে। তেমনি আমিও তুমি কেমন আছো-র সাথে ঢাকার খবর কী, চাকরি-বাকরির খবর কী, ঘরবাড়ি কবে করবি জাতীয় প্রশ্নের মধ্যেই কথারা ঘুরতে থাকলে একসময় আমি বলি, চলি। মফিজ বলে, যাইরে, বাড়িতে আসিস। জবাব দিই, যাবো। অথবা, এবারে মনে হয় হলো না। আগামীবার।

অবাক হয় মফিজ। পাশাপাশি বাড়িতে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালে আরেক বাড়ির খবর যেখানে নেওয়া হয়ে যায়, সেখানে গিয়ে কুকুকে দেখে আসাও হয় না বলে খানিক খারাপ লাগে, পরে ঠিকই ভুলে যাই। এমনিই দশ-এগারো বছর আগে একবার বাড়ি এসে দেখি মফিজের পশ্চিম দিককার কালো টিনের ঘরটা নেই, উত্তরের খড়ের ঘরটা নেই, সেখানে নতুন ঢেউ খেলানো টিনের চালে সূর্যের আলো চিকচিক করছে। জিজ্ঞেস করি,

মা, মফিজ নতুন ঘরদোর বানাল কবে?

এইতো মাস দেড়েক।

দেখে বড্ড ভালো লাগছে।

যাও না, গিয়ে দেখে এসো।

মা না বললেও এবারে আমি নিজেই যেতাম। মফিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে, ঘরদোরের চেহারা কিরকমে, দেখেই বোঝা যাবে বাড়ির চারপাশে একটা

শান্তি আর সুখ গলাগলি দাঁড়িয়ে আছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে মফিজের সদর দরজার কাছে থেকেই হাঁক দিই,

ওস্তাদ! ঘরে আছো?

আমার গলা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ভাবি।

কে? কী কপাল আমার! গরিবের বাড়িতে হাতির পা?

ভাবি, হাতি নই, গাধা।

আমাদের চোখে হাতিই। তা কবে এলেন?

রাতে। আমার ওস্তাদ কই?

ভাবি চোখ দিয়ে ইশারা করে বাথরুম দেখায়, আর সে-মুহূর্তেই মফিজ সেখান থেকে বলতে বলতে বেরোয়,

আমাকে আর ওস্তাদ বলবি না।

কেন?

আমি তো বিড়ি-সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। কিন্তু তনলাম তুই নাকি সিগারেটের পাছায় পাছায় আতন দিয়ে বাস?

মফিজের এ-কথার জবাব না দিয়ে আমি চোখ ঘুরিয়ে বাড়ি দেখতে থাকলে এক ফাঁকে লক্ষ করি, মফিজের মুখমণ্ডল গর্ব ও আনন্দ গলে গলে পড়ে মুখের চারপাশ স্নিগ্ধতায় ভরে তুলছে।

বড় ভালো লাগল!

কিছু বললি?

না, বললাম, বড় ভালো লাগল। কেন লাগল জানো?

কী?

আমাদের ফুলের পাঠ্যবইয়ে একটা আদর্শ বাড়ির ছবির কথা মনে হলো। বাড়ির চারভিটের চারটি ঘর, পূর্ব ও দক্ষিণ কোণায় রান্নাঘর, অদূরে গোয়ালঘর, সব মিলে যায়, পাঠ্যপুস্তকের আদর্শ বাড়ির সাথে মিলে যায়।

মফিজ, এ না দেখছি সেই পাঠ্যপুস্তকের বাড়িরে!

হাসে মফিজ।

রকিক, তুই না কত বই পড়েছিস! তোর তো আরো বলা উচিত নিকোনো উঠোন, উঠানের কোণায় কোণায় গাঁদা ও দোপাটি ফুল, এক কোণায় পারবার খোশে পারবার বাকুম বাকুম, উঠোন ও খোলার মুরগি খুঁটে খুঁটে খাবার খায়, বল ঠিক কিনা?

আরে এইজন্যেই তো তুমি আমার ওস্তাদ। আমি বেশি লেখাপড়া করলে কী হবে, করি তো হিসাব-নিকাশ ডেবিট-ক্রেডিটের কাজ, সেখানে কল্পনা খাটানোর কোনো সুযোগ নেই।

মফিজের সেই তৃপ্ত মুখ্যাবিটি দীর্ঘ, দীর্ঘদিন আমার চোখে লেগে ছিল। আমি বহুজনকে আদর্শ বাড়ি বলতে মফিজের বাড়ির কথা বলেছি, কিন্তু সেই বাড়িটা যে

নেই ভো নেই হয়ে গেছে তা নিজ-চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করতাম না। শুধু, শুধু চারঘরের চারটে ভিটে, রান্নাঘরে, গোয়ালঘর, পায়রার ঘরই নেই, রান্নাঘরের উপরে ঝাঁকড়া জামগাছটার ডালপাতাগুলো পুড়ে কালো হয়ে শূন্যে ঝুলে আছে। জামকালে মাটিতে জাম পড়ে পড়ে উঠোনের একটা কোণও বেগুনি হয়ে থাকত, আদর্শ বাড়ি হওয়ার আগেও ভাবি বাটিতে জাম-লবণ দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সামনে মেলে দিয়েছে। এখন ওখানে কেবল জামগাছের অবয়ব।

না, মফিজের সামনে আর বসে থাকা যায় না। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই ওর শরীর ও মনের ভেতরটা ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাবে, কিন্তু তার চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই দেখে গা ঝাড়া দিয়ে সত্যিই উঠে পড়ে বলি, মফিজরে, ঘরে যাই।

কোনো জবাব দেয় না মফিজ। না দেওয়াতেই মনে হয় আমার পায়ে বেড়ি পড়ল। যাওয়ার অনুমতি দিলে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেত, না দিয়ে বসে আরো কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো, কিন্তু আমি তখন অসহায়ের মতো বাতাস আঁকড়ে ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা করি। মনে পড়ে, কালরাতে বাড়ি পৌঁছে মা বলে ডাক দিলে আমার সহস্রা মনে হয় বাড়ির সমস্ত অঙ্ককার ভেঙেচুরে মা, বৌ, ভাই, বোন, রাখাল, কাজের বেটি, লজিং মাস্টার, এমনকি বাড়ির পোষাকুকুর লাটু পর্যন্ত বেরিয়ে এলো; দেখতে দেখতে মফিজের বাড়ির পূর্বপাশের হোসেন মিস্ত্রির দুই ছেলে, তাদের বৌ-বাচ্চা, সব, সবাই বেরিয়ে এলো কিন্তু সেখানে মফিজ নেই।

মা, মফিজ আসে না?

হ্যাঁ। তুমি আসবে বলে সারা বিকেল-সন্ধ্যা বসেই ছিল, তুমি আসছো না বলে ওর সে-কী চিন্তা! মাপরেবের নামাজ, এশার নামাজ পড়ে জায়নামাজে বসেই কেঁদে কেঁদে তোমার জন্যে দোয়া করল। আমাদেরও কী চিন্তা। তা বাবা রফিক, এত দেরি হলো কেন?

মা, দেশ কি আর দেশ আছে? সারা রাত্তায় কত যে পোড়া বাড়িঘর, ভাঙা ঘরদোর, লাশও দেখেছি মা, মিরপুর ব্রিজের পূর্বে মাঠে দুটো লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি, দেখলাম কাক আর শকুন আর কুকুরের কামড়া-কামড়ি, রাত্তা থেকেও পচা লাশের গন্ধে টেকা যায় না মা, সহ্য করা যায় না। মা, আমার আসলে আগে থেকে বাড়ি আসার খবরটা দেওয়া উচিত হয় নি। মিরপুরে আসার পর বাসের সব প্যাসেঞ্জার লা ইলাহা ইলা আনতা পড়তে পড়তে এসেছে, আমিও এদেছি, তবু মা জাবি নি ঠিকমতো পৌঁছতে পারব।

ছোটবোন মাকে মনে করিয়ে দেয়,

মা, সব কথা কী বাড়ির বাইরেই সারবে?

সব্বিং করে মা-র। আমারও। যে-ঘরে আসার জন্যে এতটা বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে এলাম, সেই ঘরেই ঢোকা হয় না দেখে আমার নিজেরই অবাক লাগে।

বৌয়ের কোল থেকে মেয়েকে নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে জানতে চাই, আনজুম, মফিজ কোথায়?

কী জানি! মফিজ ভাই তো কিছুক্ষণ আগেও ছিল। মনে হয় তক্ষুনি এসে পড়বে।

ওর বাড়ি কী একেবারেই পুড়ে সাফ?

আর বলো না। শুধু মাটি।

ভাবি বাচ্চারা কোথায়?

কোন গ্রামে যেন! সেখানে ভাবির এক চাচা থাকে। শুনেছি সেখানেই।

মনে ঝাঁকুনি লাগে। ভাবি-বাচ্চারা কোথায়, মফিজ কোথায়, সব এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে আমার কাছে। জিজ্ঞেস করি আনজুমকে,

মফিজ খায় কোথায়? থাকেই বা কোথায়?

বড় একটা শ্বাস পড়ে আনজুমের।

আর বলো না! তার থাকা-খাওয়ার ঠিক নেই, ঘুমানোরও ঠিক নেই। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার কি জানো? মানুষটা এখনো মাঝে মাঝে এমনভাবে হাসে যে মনেই হয় না তার মতো অতো সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর কেউ হলে ঠিক পাগল হয়ে যেত, না হয় হার্টফেল করত।

আমার তখনই মফিজের ভিটে দেখতে যেতে পা তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু জানি, ঢাকা থেকে বিপদ-আপদ ডিঙাতে ডিঙাতে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে বাড়িতে পৌঁছানোর পর এখন কেউই আমাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না। আনজুম আমাকে বোঝে বলে আরো আগলে রেখে বলে,

মফিজ ভাই তার খোলা ভিটেতেই ঘুমায়।

এ্যা! বলো কী? যদি বৃষ্টিটিষ্টি আসে!

আসে কী? পরশু রাতে তো আকাশভাঙা বৃষ্টি হয়ে গেল। সেই বৃষ্টির মধ্যে মফিজ ভাই শুধু একটা মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির ভিটেয় বসে সারারাত কাটিয়েছে।

পাগল-টাগল হয়ে গেল নাকি?

নাহ্! তেমন কোনো লক্ষণই নেই। কাল সকালে দেখলেই বুঝবে।

আনজুমের কথা মাথায় নিয়ে রাতে থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম ভাঙার সাথে সাথে মনে মফিজের মুখ ভেসে ওঠে, ভাবি, এখনই গিয়ে দেখি আসি মফিজ শূন্য ঝাঁঝে ভিটেতে শুয়ে আছে কিনা, থাকলে কীভাবে আছে, এখন ওর মানসিক অবস্থাই বা কেমন? আমার আসার পক্ষে চরম অনিশ্চয়তা আর ধকল আর ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে পড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম আসার আগ দিয়ে আনজুমের সঙ্গে সঙ্গম করার ইচ্ছে জাগলেও ঘুমের কাছেই হার মেনে যাই। রাতে প্রথম ঘুম ভাঙার পর এই প্রথম জড়িয়ে ধরি আনজুমকে, কিন্তু কোথায় আনজুম, সে-ও গভীর ঘুমে। জাগাই না ওকে। জড়িয়ে ধরেই চোখ চেপে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতেই দেখি চোখের সামনে মফিজের অবয়ব। আমার মনে হয় মফিজ বলছে, আশ্চর্য! তুই

আমার সঙ্গে দেখা করলি না? জবাব জোটে না আমার মুখে। বিড়বিড় করে বলি, সকালে, সন্ধ্যাই যাবো।

সহাস ঘুম ভাঙে আনজুমের। ডেঙেই আমার বিড়বিড় শুনতে পেয়ে বেশ জোরেই একটা ধাক্কা দেয়,

শুনছ, এই শুনছ?

শান্ত গলায় জবাব দিই, আমি জেগে।

কিন্তু তুমি যেভাবে বিড়বিড় করেছিলে তাতে মনে হচ্ছিল তোমাকে কোবায় ধরেছে।

আনজুম, মনে হলো মফিজ আমাকে এসেই দেখা না করার জন্যে বকলো। সত্যিই তো! ওর এতবড় বিপদের পর এসেও অন্তত ভিটেটাও দেখতে যাই নি, খারাপ লাগারই কথা! আমি এখন যাই? যাবো আর আসব।

মুখ চেপে ধরে আনজুম।

কেপেছো? এই রাতে? মরে গেলেও তোমাকে যেতে দেবো না।

আনজুম আমাকে যেতে দেয় নি। ওর ভালোবাসার গভীরে আমি ডুবে যাই, আমরা দুজনেই ডুবে যাই, একসময় ঘুমিয়েও যাই, সহসাই ঘুম ভাঙে পাখির কিচিরমিচির ডাকে। জানালার একটা পাল্লা সামান্য একটু খুলেই দেখতে পাই রাত নেই, সূর্যও ওঠে নি, বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে চরাচর। আমি তো এই সময়েই মফিজের কাছে যাবো কথা দিয়েছি। আনজুমের দিকে তাকিয়ে দেখি বড় আনন্দ আর তৃপ্তি মুখে মেখে ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাকি নে, পাছে মুখের ওই সুখময় প্রলেপ মুছে যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মফিজের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে একবার থমকেও যাই। গিয়ে কী দেখব, মফিজ খোলা আকাশের নিচে শূন্য ভিটেয় শুয়ে আছে, কী অবস্থায় আছে ও সেই দৃশ্য দেখে সহ্য করতে পারব কিনা। নানা দ্বিধায় জড়িয়ে শেষে জড়িত পায়েই গিয়ে দেখি, আসলেই কিছু নেই, খোলা আকাশের নিচে শূন্য ভিটেয় মফিজও নেই। মনে হয় বাড়ি পৌঁছে যখন দেখি নি তখন ও নিশ্চয়ই রাতে আসেই নি। আনজুমও এইরকম একটা কথা বলেছিল। কোথায় খায় কোথায় থাকে ঠিক নেই। মফিজদের ঘরের ভিটের দাঁড়িয়ে যখন বাড়ির চারপাশ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি, তখনই শুনি, রফিক, আমি এখানে।

তাকিয়ে দেখি মফিজ অদূরেই একটা ঝাঁকড়া নিমগাছের নিচে বসে সিগারেট টানছে। ধীরে ধীরে যাই ওর কাছে। আশ্চর্য, মফিজ আমার দিকে চোখ তুলল না, শুধু পাশে বসতে বলে একমনে সিগারেট টেনে যেতে থাকলে সময়টা আমার কাছে দীর্ঘ অন্তরিকার ও প্রচণ্ড তারি মনে হতে গাকে, তারপর এ-কথা ও-কথা সে-কথার পরই মফিজ আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে থাকে। তার লাগে আমার। মনে হয় এটা পাগলের হাসি। আরো মনে হয় শান্ত পাগলরা যে-কোনো সময় ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। শুকনো গলায় ডাকি, মফিজ!

বল, শুনছি।

তুমি ওভাবে হাসো কেন?

লেবাক্বা, হাসি পেলে হাসব না তো কাঁদবো?

কিন্তু কেন হাসছ?

মফিজ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বামহাতের তর্জনী ও মধ্যমা ভি আকার বানিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে মনে পড়ে, হ্যাঁ, এই তো সেই আগের মফিজ, সিগারেটে আমি যখন পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তখন, তখনই যেন গুরুদক্ষিণার মতো দুই আঙুলের মাঝখানে সিগারেট গুঁজে দিচ্ছি।

হঁ! জানতে চাচ্ছিলি হাসছিলাম কেন? শোন। একেবারে গোড়া থেকে বলব?

বুঝতে পারছি আমার ধৈর্য ধারণ করা কষ্টকর হয়ে উঠছে। বলি, প্রিজ, বলো।

মফিজের দিক থেকে আর কোনো কথা আসে না দেখে মুখ ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ বন্ধ, চোঁট-দুটো বিড়বিড় করছে। ডাকি,
মফিজ! মফিজ!

আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে কাঁপিয়ে তোরই চাচাতো ভাই মঞ্জু বলে গেল পালাও, সবাই পালাও লিগলির, মিলিটারি এসে গেছে, পাড়ায় ঢুকে পড়েছে, ওই, ওইতো বয়েন মোস্তার বাড়ির কাছেই গুলির শব্দ, আমি তখন দিশেপিশে না পেয়ে তোর ভাবি ও ছেলেকে বললাম, দৌড়াও, দৌড়াও তোমরা, আমি ঘর থেকে টাকা-পয়সা গয়নাগাতিগুলো নিয়ে আসি, ওরা চলে গেল, আমি ঘরের চৌকাঠের কাছে পৌঁছেই দেখি, যদি ভেতরে গিয়ে ওগুলো বের করতে থাকি, ততক্ষণে ওরা নির্ধাত এসে যাবে, আর আসা মানেই আমি নেই। রফিক, আমি আর দ্বিতীয় চিন্তা না করে একদৌড়ে বড় রাস্তার ওইপাশে তোদের আমবাগানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে দেখলাম, মিলিটারি আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। মনে মনে বলি, এশ শালারা, একটা মানুষও পাবি না যে মারবি, মানুষ মারতে না পারলে বাল হেঁড় বসে বসে! ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছি। কিন্তু রফিক, একবারও মনে আসে নি ঘরে আশ্রয় দেবে, ঘুণাকরেও না। হঠাৎ দেখি পিলপিল করে, দৌড়ে বেরিয়ে আসছে তরোরের বাচ্চারা। আর তারপরেই চারভিটের চারটে ঘর, রান্নাঘর, পোশাকঘর, পায়রাঘর খোপ, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জানিস রফিক, তখন আমার এটাও মনে হয়েছিল পাকিস্তানি হারামজাদা মিলিটারিদের চোখে শত্রু আমি নই, আমার ঘরগুলো, যেন ঘরগুলোর ওপরই সব আক্রমণ। তো গোড়া! ঘর পুড়িয়ে যদি আশ মেটে তো গোড়া! আমি দেখছি কী গমকে গমকে আশ্রয় উঠছে, যেন আশ্রয়ই আশ্রয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত উঁচুতে উঠতে পারে তার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। বল রফিক, তুই-ই বল, আমার কিছু করার ছিল তখন? একমাত্র চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিইবা করতে পারতাম। দে, আরেকটা সিগারেট দে।

সিগারেটের আশ্রয় থেকেই সিগারেট ধরিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কিম মেরে বসে থাকে মফিজ। আমি ডাক মিইনে, আসলে দিতে পারি নে, গায়ে হাত দিয়ে কিম

থেকে জাগিয়ে দেবো, তাও করিনে, সত্যি বলতে, করতে পারি নে। একসময় নিজেই জাগে মফিজ, রফিক আহিস?

হ্যাঁ, তোমার পাশেই তো।

আমার বাড়িটি এত ভালোভাবে পুড়েছে কেন জানিস?

কেন?

আমার বাড়ির সমস্ত খুঁটি কড়ি বরগা খাঁটি ঘি দিয়ে পানেট করা ছিল।

কী ছিল?

অবাক হয়ে জানতে চাইলে মফিজ চিপ করে হেসে জবাব দেয়,

পানেট মানেও ভুলে গেছিস? পানিতে কাঠ-বাঁশ অনেকদিন ডুবিয়ে রেখে যে সিজন্ড করা হয়, ওহো! ভুলেই তো গেছি তোর এখন দেশের মাটির সঙ্গে যোগাযোগই নেই। থাকলে ঠিক বুঝতি।

মফিজ পুরো ব্যাখ্যা করার আগেই যে পানেট শব্দটির অর্থ আমি বুঝেছি তা আর বলার সুযোগ পাইনে, তার আগেই সে আমার চোখের গভীরে চোখ রেখে প্রশ্ন করে,

রফিক, ঠিক করে বলত, আমার বাড়িটিই শুধু পুড়লো কেন? তোদের বাড়িটা কেন পুড়ল না? আমার বাড়ির চাইতেও তোদের বাড়িটা বড়, পুড়তেও অনেক সময় লাগত, আগুন পুড়িয়েও আনন্দ পেত, তাও হারামির বাচ্চারা শুধু আমার বাড়িটির দিকে নজর দিল? আসলে কী জানিস রফিক, ওরা মনে হয় ঠিকই জেনেছে তোদের বাড়ি পোড়া না পোড়া সমান কথা, পোড়াতে হবে আমাদের।

আমি ছটকট করে উঠি।

মফিজ, তোমার কথা ঠিক নয়। ওরা যেভাবে জ্বালাও-পোড়াও চালিয়েছে, তাতে কোনো কোনোটা হঠাৎ বেঁচে গেছে। আমাদেরও সে-রকম।

রফিক, পাগল বোঝাস না আমাকে। লুট করতে, পোড়াতে এসে কেউ কী প্রথমে ছোট জিনিসে হাত দেয়? তুইতো এসেছিস আমার বাড়ি, যাকে তুই আদর্শ বাড়ি বলেছিলি, সেটি কেমনভাবে পুড়েছে দেখতে।

মফিজ! মফিজ!

দেশের বাড়ির সঙ্গে যার যোগাযোগ নেই, সে দেশের কী বুঝবে রে? দরদ দেখাতে এসেছিস?

বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো, না। তুমি মাকে জিজ্ঞেস করো, আনজুমকে জিজ্ঞেস করো, জানতে চাও তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছি কিনা?

মফিজ আবার খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে, যেন শব্দগুলো টিপে টিপে বলে,

রফিক, রফিকরে, তোর জন্যে আমি সারারাত পোড়াভিটেয় জেগে বসে ছিলাম।

নিয়মের নিয়ামত বুড়ো

বৃদ্ধ নিয়ামত আলীর তিনরকম নিয়মের প্রথম দুটি আয়ত্তে আসে দু তিনদিনের মধ্যে। তৃতীয় নিয়মটি বেশ পরে, যখন প্রথম ও দ্বিতীয়ের মাঝে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। এরও মাঝে আরেকটি নিয়ম চালু হয়, কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে বৃদ্ধ নিয়ামত আলীর এখন সর্বমোট নিয়ম সাড়ে তিনরকম। চাররকম বললেও ক্ষতি নেই। গত পঁচিশ বছর ধরে সে এগুলো পালন করে আসছে।

সেই বৃদ্ধ নিয়ামত আলী, পিং আসমত আলী, সাং হরিতলা, ইউনিয়ন দরিরামপুর, থানা নাজিরগঞ্জ, জেলা পাবনা-র বয়স এই আশাড়ে একষষ্টি হলো। একষষ্টির বুড়ো খুব একটা কম বুড়ো না হলেও নিয়ামত আলীকে অতো বুড়ো দেখায় না। পঞ্চাশের ওপর আরো তিন-চার বছর ধরা যেতে পারে। গ্রামে তার চেয়ে দশ-পনেরো বছরের বড় বুড়ো মানুষও আছে, যাদের ‘ও! আমাগো আসমতের ব্যাটা নিয়ামত, ও তো সেদিন চোখের সামনে ন্যাংটা হয়! ঘুরে বেড়াইলো!’ জাতীয় কথা শুনে নিয়ামত একদিন বাপের কাছে জন্ম-তারিখ জানতে চায়। বাপ দাড়িতে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে বলে, ‘তারিখ কি আর মনে আছে? তোমার জন্মের সময় ফজলি আম ছিলো।’

হো হো করে হাসে নিয়ামত। ‘ফজলি আম তো দুইমাস আড়াই মাস ধইরা থাকে।’

আসমত আলী আবার দাড়িতে হাত বুলায়, ‘মনে আছে তোমার জন্মের সময় দুই-তিনদিন ধইরা বিষ্টি ছিলো।’

নিয়ামত আলী জন্মের কাছাকাছি আসে, ওটা হয় আশাড় না হয় শ্রাবণ হবে। কিন্তু সাল? সেটারও একটা সমাধান হয়ে যায় যদিও সে-সময়ের ইতিহাস নিয়ামত আলী কেন তার বাপেরও সঠিক জানা নেই। সে বাপের মুখে শুনেছে যেবার বাংলা ভাড়াভাঙি নিয়ে কি সব নাকি গুগুগোল হয়েছিলো তারও হু সন পরে তার জন্ম। সে তখন বাংলা বলতে বোঝে মুখের ভাষা, সেটা আবার কি করে ভাঙে জিজ্ঞেস করতে বাপ জবাব দেয়, ‘বাবারে, দ্যাশের নাম, দ্যাশের নাম।’ নিয়ামত সেই দেশ কতোবড় আকাশের চারপাশে চোখ বুলিয়েও কল্পনায় আনতে পারে না, আকাশ তাদের গ্রাম হরিতলা, উত্তরে কৈজুড়ি, দক্ষিণে সোনাকান্দা, পশ্চিমে গয়েশপুর, আর পূর্বে

গয়নাতারা গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে তা কি করে হয়? সেগুলোরও পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে আকাশ আছে, গ্রামের পর গ্রাম আছে। তাহলে সত্যি কতো বড় সেই দেশ জিজ্ঞেস করলে বাপও জবাব দিতে পারে না। বাপের কথা থেকে বুঝেছিলো তাদের জমিদার হরিচরণের নায়েব সদানন্দ বলেছে বাংলা ভাঙা নিয়ে ইংরেজ হিন্দু আর মুসলমানের লড়াই বাধা আর বাকি নাই।

সেই হিসেবে নিয়ামত বুড়োর জন্য উনিশশ' এগারো সালে। বাপ আসমত আলী বলে তেরোশ' আঠারো। তেরোশ আঠারো কতো পেছনে ভাবতে গিয়ে নিয়ামত আলী শুধু দেখলো কস্তো কস্তো গরম বর্ষা শীত রোজার ঈদ বকরা ঈদ পার হয়ে গেছে আকলিমা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, গহেরদি ফুলটুনি কোল আলো করে ঘরে এসেছে, সে শুণে মেলাতে পারে না। এখন তার কানের পাশের চুলে পাক, আকলিমা দু একটা তুলে দিতে গেলে 'ব্যথা লাগে ব্যথা লাগে' বলে 'উহ-হ' করে, নিয়ামত এখন দিনে-দিনে বুড়োর দলে ভিড়ছে। তার এখন বয়স চলে ছত্রিশ। অথচ সে এখনো আব্বাহ-রসুলের রাস্তায় এলো না বলে বাপ আসমত আলীর ভারি দুঃখ। নিয়ামতের মা ঘরে তখন হামনিদিত্তায় পান ছেঁচছে, আসমত আলী ঘরের দরোজার কাছে মোড়ায় বসে। পান হাতে নিয়ে সে বসে থাকে।

'কি হইলো। মুখে দ্যান না ক্যান। কি ভাবেন?' জিজ্ঞেস করে কুলসুম বিবি।

'ভাবি, নিয়ামত বুড়া হতে চললো, আব্বাহ-রসুলের নাম করবো কবে?' দু হাত দূরে বৌকে কখনো বললেও উঠানের ওধারে ঘরের দাওয়ার বসে নিয়ামত ঠিকই শুনে পায়। সে তখন কাটারি দিয়ে আপনমনে কোঁচের লাঠিটা চেঁছে চেঁছে তেলতেলে করতে করতে উঠানের গায়ে বেড়ার ধারে লাউয়ের মাচানের নিচে মুরগির পেটের তলার পাঁচ ছটা তুলোর মতো বাচ্চার তিরতির করে ছুটোছুটি করে আদর কাড়া দেখছিলো। 'উঠানের আরেক কোণায় বড় চুলোতে ধান সেদ্ধ চলছে। চুলোটা উঠানে গর্ত করে বানানো। আকলিমাকে সাহায্য করছে বদির মা। বাপের কথা শুনে হাতের কাজ বন্ধ করে থম্ মেরে বসে থাকে নিয়ামত। সঙ্গে সঙ্গে তার বাপের আব্বাহর চিঠি দেয়ার গল্পটা মনে হয়। আব্বাহ তার এক বান্দারে দুনিয়াতে সবরকম মৌজ করার অনুমতি দিয়াও কইছিলো, 'মাঝে-মাঝে চিঠি পাইবা।' 'কিসের চিঠি' 'পাইলাই বুজবা। পাইলে ঠিক হয় চাইলো।' সে বান্দা দুনিয়ায় যতো অকাণ্টা কুকাণ্টা কাম করে আর মাঝে-মাঝে তাবে, কই, আব্বাহর চিঠি কই; একদিন আজরাইল আইসা কর 'চলো, সময় হয় গেছে। বহুত বদকাম করছো। দোজখ তোমারে গিলা খাওয়ার জন্যে হ্য কইরা রইছে।' বান্দা কর, 'কৈ, চিঠি পাই নাই।' আজরাইল কর 'পাইছো।' বান্দা কর 'আব্বাহ মিথ্যে কথা কর।' আজরাইল তখন কর, 'মনে কইরা দ্যাখো যেদিন চুল পাকলো টের পাইলা সেইদিন চমকাইয়া ওঠো নাই? যেদিন একটা দাঁত পড়লো সেইদিন বুড়ো হইছো মনে পড়ে নাই? যেদিন পাকের চামড়া কুঁচকাইছে টের পাইলা সেদিন বুড়া বাপের কথা মনে হয় নাই? যেদিন

বুঝা চোখে কম দেখতামো সেদিন বুকটা ধড়াস কইরা ওঠে নাই? উঠছিলো। ওইগুলো আত্মাহুত চিঠি। লও, এখন চলো। আমার বহুত জ্ঞান কাবেজ বাকি আছে।' বাপ সেই চিঠির কথাই মনে করিয়ে দিলো কি না মনে হতেই তার প্রথমেই কানের পাশে চুল পাকার কথা মনে হয়। আরো কোনো আলামত এতোদিনে দেখা গেছে কি না চিন্তা করতে করতে সে ধান সেঁকুর হাঁড়ির গায়ে একটা ধানের ওপর চোখ স্থির করে ফেলে। হঠাৎ বদির মার 'ওরে লয়া গেলো লয়া গেলো' চিৎকারে চমকে উঠানের আকাশেই চিলের পায়ে মুরগির বাচ্চা উড়ে যেতে দেখে তার প্রথমেই মনে হয় আজরাইল ঠিক এমন করে বান্দার জ্ঞান নিয়ে আকাশে উড়ে যায়। সে চিলের পেছন পেছন দৌড়ানোর পরিবর্তে ঘরে গিয়ে চৌকির ওপর আবার থম মেরে বসে থাকে। বাইরে তখন মা বৌ ও বদির মার একত্রে 'ধর ধর' চিৎকার তার কাছে হাটুরে মারের চিৎকারের মতো মনে হতে থাকে।

ধর ধর চিৎকার যখন আর চিলেরও কানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নেই তখন 'গুলামের ব্যাটা গুলাম ছিল, মড়া গোকুখোর ছিল, হারামির হারামি ছিল' বলে তিনজন একজনের ওপর দিয়ে আরেকজন গালাগাল করতে করতে বাড়ি ফিরে আসে। আকলিমা দেখলো এই অবেলায় অসময় তার স্বামী ঘরের ভেতরে নেই হয়ে বসে আছে। ব্যাটাছেলে মানুষ বাড়িতে এতো বড় একটা বিপদে সাহায্য না করে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে দেখে 'আপনের কি এই আক্কেল' বলে অভিযোগ জানাতে গিয়ে দেখলো নিয়ামতের খুতনিটা বুকের মাঝামাঝি নেমে এসেছে। সে স্বামীর পিঠে হাত রেখে আস্তে ধাক্কা দিলেও নিয়ামত নড়েচড়ে না। এবারে সে ভয় পায়। জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে চৈচিয়ে উঠতেই নিয়ামত মাথা তুলে বলে, 'কি হইছে, চ্যাচাও কি কামে?'

আপনে যে খোন্দার মতো বইসা আছিলেন!

চিৎকার শুনে বাপের ঘর থেকে আসমত আলী 'ও বৌ কি হইছে' জানতে চায়, কুলসুম বিবিও ছুটে আসে। নিয়ামত তখন স্বাভাবিকভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'না কিছু হয় নাই।' বুড়ো বাপ-মা দুজনই ব্যাটা ও ব্যাটার বৌয়ের কোনো নিজস্ব ব্যাপার মনে করে চুপ করে যায়। নিয়ামত শান্ত গলায় বলে, 'আমার পাঞ্জাবি আর টুপিটা বার করো।'

কোঁচের কাজ বাদ দিয়ে হঠাৎ পাঞ্জাবি আর টুপি কেন কথাটা বুঝতে আকলিমার কিছু সময় লাগে। সে জানে লাঠি চাঁহার কাজ শেষ হলেই তার স্বামী কোঁচে কাঁটা বসিয়ে রাতে দোস্তদের সঙ্গে আমন ধানের ক্ষেতে মাছ ধরতে যাবে। ক্ষেতে এখন কোমর পানি, পানি ছাড়িয়ে হাতখানেক উপরে ধান ভসছে। স্থির পানিতে যেখানেই ধানের মাথা নড়ে সেখানেই নিচে মাছের নড়াচড়া এ-কথা সবাই জানলেও তার স্বামীর মতো অব্যর্থ নিশানা এ হরিতলা গ্রামের খুব কম লোকের হাতেই আছে। আজ ককককে চাঁদনি রাত। এই রাতেই কোঁচ হুঁড়ে মাছ মারার উপযুক্ত সময়। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করে, 'পাঞ্জাবি টুপি ক্যান?'

গ্রামে মিলিটারি নেমেছে। কিন্তু গ্রামে মিলিটারি নামে নাই। মেজরের পায়খানার খুব বেগ হয়েছিলো, গাড়ি খুব জোরে চালিয়েও আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের আগে ক্যাম্পে ফেরা সম্ভব নয়। জফরাবাজ গ্রামের কাছে এসে অসহ্য হয়ে উঠলে চিৎকার করে ওঠে মেজর, থামাও, থামাও।

নিশ্চয়ই আশেপাশে মুক্তি এসে গেছে ডেবে সেপাইরা ট্রাক ও জীপ থেকে ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে মাটিতে শুয়ে পজিশন নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলো, না, কোথায় মুক্তি, মুক্তির নাম গন্ধ তো নেইই, শুধু মেজর জলার দিকে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দুই সেপাই মেজরের পেছনে পেছনে দৌড়ে চিৎকার করে ডাকে,

স্যার, স্যার, কি হইয়াছে?

মেজর কোনো জবাব না দিয়ে প্যান্টের বেল্ট ও বোতাম খুলতে শুরু করলে সেপাই দুজন মুখ টিপে হেসে ফিরে আসে। আরো একজন হাসে। বদু। সে আপন মনে গল্পের ঘাস কাটছিলো।

কোমর সমান ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে বদু সেপাইদের চোখ বাঁচিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শোনে মেজর চিৎকার করছে, বাঁচাও, বাঁচাও। ইহা কি? ইহা কি?

চিৎকার শুনে বদু ঘাসের আড়াল ফাঁক করে দেখে প্রথমে বুঝতে পারে না কি হতে পারে মেজরের, কিন্তু সহসা মনে আসে এই জলা তো জোঁকে ভরা, সেদিনই তার বাম পায়েই তিনটে ছিলে জোঁক, ডান পায়ে একটা মোষে জোঁক লেগে কতোক্ষণ ধরে যে রক্ত ঝেয়েছে সে বুঝতেই পারে নি, পরে হাত দিয়ে ছাড়াতে না পেরে লবণ লাগাতেই আলগা হয়ে পড়ে গেল। তাহলে কি মিলিটারি সায়েবের গায়ে জোঁক লেগেছে? সে তখনই প্রাণপণে মালেক মৌলবির বাড়ির দিকে দৌড়ায়।

মিলিটারি চলে গেছে, গ্রামের যে ঘরের লোক তখনও পালায় নি, ছুটে আসে সবাই। বাতাসেই জানাজানি হয়ে গেছে মালেক মৌলবিকে মিলিটারিরা মেরে রেখে গেছে।

মরে নাই মালেক মৌলবি, মরে না মালেক মৌলবি। আজরাইলের ঘর থেকে ফিরে আসা মালেক মৌলবির ছোট বৌ মাঝেমাঝেই স্বামীর বিড়বিড় শুনে কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে,

কি কন, কি কন আপনে?

বৌয়ের সব কথাই কানে যায় মৌলবির, কিন্তু মনের কথা গলায় এসে আটকে গিয়ে মুখ দিয়ে আর বেরোয় না, ছোট বৌ বোঝে তার স্বামী প্রাণপণ চেষ্টা করছে বলতে। কিন্তু মৌলবি যে বলতে চাইছে, হায় আত্মা, তোমার পিয়ারা পাকিস্তানের জন্য এতো কিছু করলেম, সেই পাকিস্তানি মুমীন ভাইরে তুমি এমনি করে কষ্ট দিলে, এই বছরই তুমি এমন বর্ষা দিলে, সারা দ্যাশ দুশমনি করতেছে, আর শ্যাঘে কিনা জোঁক, সেও পাকিস্তানের দুশমন হয়ে গেল?

অন্য অনু

সূর্য পশ্চিমে অনেক হেলে পড়লেও দিনের উত্তাপ কমে নাই, পিচের রাস্তায় তখনও ভাপ উঠছে। এখনও রাস্তায় অনেক মানুষ বেরোবে না মনে করেও পশ্চিম রামপুরা নিবাসী গৃহবধু রেহানা কিছু সাংসারিক কেনাকাটার জন্যেই বাড়ির কাছাকাছিই একটা মার্কেটে যায়। যা প্রয়োজন তা কিনতে দুই থেকে তিন দোকানই যথেষ্ট এবং সময়ের হিসেবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু রেহানা বিশ থেকে পঁচিশটা দোকান ঘুরে এবং ঘড়ির হিসেবে একশো আটচল্লিশ মিনিট পার করে যখন বাইরে আসে তখন তার হাতে মাত্র দুটো শপিং ব্যাগ এবং কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার পেটটা আগের তুলনায় একটু বেশি ফোলা। শপিং ব্যাগ দুটোর ওজন পাঁচ ও সাত কেজি।

মার্কেটের ভেতরে বারো বেতর বছর বয়সী একটা ছেলে রেহানার মুটে হাতে চেয়েছিলো। পাশ্চা দেয় নি রেহানা। না দেবার অবশ্যি একটা জোর কারণ আছে। বছর দুয়েক আগেই এই মার্কেটেই ঈদের বাজার করতে এসে অনেকটা ওই বয়সীই এক কুলি নিয়ে এক বড় ধাক্কা খায়। ঈদের বাজার, প্রচণ্ড ভিড়, রেহানা তিনটে ব্যাগ নিয়ে তা কিছুতেই সামলাতে পারবে না ভেবে কুলি নেয়, কিন্তু সেই ছোকরা ব্যাগ দুটো নিয়ে দিব্যি হাওয়া হয়ে গেল। রেহানা সারা মার্কেট আঁতিপাতি খুঁজেও পার নি। না পাওয়াতে যে পরিমাণ দুঃখ হয়েছে, সেই দুঃখটা আরো বেশি হতে পারতো যদি দামি পাঁচটি শাড়ির বড় প্যাকেটটি থাকতো কুলির হাতে। হারানো ব্যাগে ছিলো চাল-ঘি, মশলাপাতি ও কাজের ছেলে, বুয়ার জন্যে একটা একটা কাপড় ও জামা। সেই থেকে রেহানা পারতপক্ষে ভিড়ভাটা বেশি দেখলে কুলি নেয় না, স্বামী সঙ্গে থাকলে কুলির দায়িত্বটা বেশি কম ভাগ করে নেয়। আর না থাকলে যতোটুকু সে নিজেকে বহন করতে পারে, ততোটুকুই কেনে।

এখন হাতে পাঁচ ও সাত কেজি মোট বারো কেজি জিনিস বহন করে মার্কেটের বাইরে এসেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায় রেহানা। বলা নেই কওয়া নেই রাস্তা এমন ধূ ধূ হয়ে গেল কিভাবে। আসার সময় দিনের গরম ও রাস্তার ভাপে লোকজন খুবই কম থাকলেও তার দুই মিনিট কম পাক্কা দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সবকিছু গমগমে হয়ে

যাওয়ার কথা, সেখানে কোনো মানুষ নেই, এমনকি রাস্তায় রিকশা, বেবি, মিশুকও নেই। কার, বাস, ট্রাকও হাওয়া হয়ে গেছে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রেহানা। দুই হাত জোড়া বারো কেজি জিনিস নিয়ে সে কি করবে। এই সময় একটা কুলিরও দেখা নেই। একটা ছোকরা হোক, যুবক বা মাঝবয়সী কিংবা বুড়োবুড়ো একটা কুলি পেলোও সে বেঁচে যেতো, নইলে মার্কেট থেকে সোয়া কিলোমিটার রাস্তা সে হেঁটে যাবে কি করে। কি হয়েছে শহরের? কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে এমন কোনো প্রাণী নেই আশপাশে। সহসা তার মনে হয় শুধু শহর নয়, গোটা দেশেই কোনো মানুষ নেই।

রাস্তায় নেমে আসে রেহানা। ঠিক মাঝখানে। দিনের এই সময়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে লাট সাহেবের মতো দাঁড়িয়ে থাকা এক অকল্পনীয় ব্যাপার হলেও রেহানা তা তাই দাঁড়িয়ে আছে, কোনো হর্ন প্যাকপুঁক নেই, ট্রাক কিংবা বাসের ড্রাইভার অথবা বেবি বা রিকশাচালকরা চলতে চলতেই সবচেয়ে বেশি বাজারদর সুন্দরী সিনেমা নায়িকা বা ওই পল্লীর মাগি বলে গালাগাল করছে না, এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! মনে করতে চেষ্টা করে রেহানা শহরে কারফিউ কিংবা হরতালের কোনো ঘোষণা আছে কিনা। না, মনে পড়ে না। সে খবরের কাগজের বর্ষ-সংখ্যা-বার-তারিখ-সাল ও সম্পাদক-প্রকাশক ঠিকানা বাদে সবই পড়ে, মনেও রাখে অনেক খবর। বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাড়াও সে পটাপট আজকের বাজারদর ও সোনার ভরি কতো এবং কোথায় কোথায় ভালো অনুষ্ঠান হচ্ছে বলে দিতে পারে। সে তো গতরাতে আটটা দশটা সাড়ে এগারোটায় টেলিভিশন খবর নিউজ সংবাদ সব শুনেছে, এগুলো সে শোনেই। বাংলাদেশ টেলিভিশন নিউজ শোনা ও দেখার একটা বিষয় হলো এমন একটি তাত্ত্বিক্য করেছিলো তার রাসু নামের এক আপনজন। রাসুর একটাই কথা, ওই রাঙা মূলো, দামড়া ও ভাঁড়দের চেহারা দেখার জন্যে পয়সা দিয়ে টেলিভিশন কিনি নি। অস্বীকার করেনা রেহানা, কিন্তু বলে, মাঝে মাঝে দেশী-বিদেশী অনেক ইনপার্টেন্ট খবর তো আগে জানা যায়। রাসু মানে সেটা। বিশেষ করে জাহানারা ইমামের মৃত্যু সংবাদ সে জানতে পারে পরদিন সকালে কাগজ পড়ে। রেহানা এই যে রাসুর অনেক আগে ওই জরুরি খবরটি জেনেছে, সেই গৌরব, গৌরব থেকে কটাক্ষ, সব হজম করতে হয়েছে রাসুকে। না রাতের টিভি খবরে, না সকালের রেডিও খবরে কারফিউ হরতালের কোনো কথা নেই। খবরের কাগজে নেই, মানুষের মুখে মুখেও নেই, তাহলে সুস্থ মানুষের হঠাৎ হার্টফেল করে মরার মতো শহর সহসা এমন দম বন্ধ করে ফেললো কেন। রেহানা চারপাশের গরম রাস্তা পিচে ভাপের মধ্যে বারো কেজি জিনিস হাতে দাঁড়িয়ে নিজেকে মরুভূমির মধ্যে দেখতে পায়।

ঠিক সেই সময় দক্ষিণ থেকে একটা হৈ হৈ শব্দ রাস্তা ভাসিয়ে উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। রেহানা চমকে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখে সংখ্যায় অনেক একদল তরুণ কপালে লাল কাপড়ের কোটি বেঁধে দ্রুত ছুটে আসছে। তাদের বয়স চৌদ্দ থেকে তেইশের মধ্যে। কোনো হিংস্রতা নেই, চোখেমুখে প্রতিরোধ নেবার স্পৃহা নেই, তাদের হাতে কোনো লাঠি বা মারপাশ কিছুই নেই। তবে তাদের উপস্থিতিই যে প্রবল এই সত্যই

উত্তপ্ত রাস্তাকে আরো উত্তপ্ত করে তুলছে। দ্রুত সরে গিয়ে মার্কেটের বারান্দায় ওঠার আগেই হৈ হৈ তরুণরা রেহানাকে অতিক্রম করে যায়। এই দলের বেশ পেছনে ষোল সতেরো বছরের একটি তরুণ। তার কোনো ক্লাস্তি বা ব্যস্ততা নেই। সেই ছেলেটিকেই ধরে ফেলে রেহানা।

এই যে ভাই।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, কী? কি হয়েছে?

তাতে আপনার কি?

ছেলেটির জবাবে কোনো ঝাঁজ বা উত্তেজনা নেই। সন্তোষে রেহানার মনে হয় ছেলেটি ভদ্রভাবে প্রশ্নটি করতে পারতো। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

একটা রিকশা বেবি কুলি কিছুই নেই, আমি যে এখন কি করি! আমাকে একটা রিকশা-টিকশা ধরে দাওনা।

এখনও ছেলেটি উগ্র জবাব দেয় না। বলে,

ওরা অনেক দূর চলে গেছে। আমি আসি।

রেহানা আবার অনুরোধ করতে গিয়ে বুঝলো, বৃথা। আগে তার কোনো ব্যস্ততা ছিলো না। কিন্তু এবার সে দ্বিগুণ ব্যস্ততায় ছুটতে থাকে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সে শুধু তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবে, কী? কি হয়েছে? তার চোখ ছুটন্ত ছেলেগুলোর দিকে। যতো দূর চোখ যায়, দেখলো রেহানা, ছেলেগুলো কালো রাস্তা ও বিরাট বিশাল ইট পাথরের বাড়িগুলোর মধ্যে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষ ছেলেটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার যে কোনো একটি বাহনের জন্যে মুখ ফেরাতেই রেহানা চিৎকার করে ওঠে।

এ কী?

চিৎকারের সঙ্গে রেহানার সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলে খাটেও একটা আন্দোলন হয়। আর তাতেই হাবিবের ঘুম ভেঙে যায়। রেহানা তখন গলার ঘড় ঘড় শব্দ নিয়ে শরীর ভাঙার চেষ্টা করছে।

রেহানা, রেহানা!

অ্যাঁ।

অমন করছা কেন?

কী?

কোনো স্বপ্ন দেখেছো?

হ্যাঁ।

কী স্বপ্ন?

রেহানা এতোক্ষণ হাঁপানোর মধ্যেই ছোটছোট জবাব দিয়ে যাচ্ছিলো। এবারে কি স্বপ্ন বলার জন্যে যতো সংক্ষেপেই হোক, অনেকগুলো বাক্য যে ব্যয় করতে হবে,

এই শক্তিটুকু তখনও সে আয়ত্তে আনতে পারে নি। চুপ করে থাকে সে। ঢোক চিপে চিপে দম নেয়। আবার জিগ্যোস করে হাবিব,

কি স্বপ্ন দেখলে? ভয়ের কিছু?

পরে।

পরে বলবে? তাহলে আমি ঘুমোই।

পাশ ফিরে শোয় হাবিব। তার চোখে তখনও কিছু ঘুম লেগে আছে, আবার পাকা ঘুম আনতে বেশি চেষ্টা করতে হবে না। পাশ ফিরতে ফিরতেই মনে মনে হাসে হাবিব, রেহানার ভয়ের স্বপ্ন? ওই মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, হয়তো দেখেছে আমি আরেকটা বিয়ে করতে যাচ্ছি। এই স্বপ্নটা মনে হয় ও দেখতে খুব ভালোবাসে। আবার একটু হেসে নেয়। আর তখনই পিঠে হাত রাখে রেহানা।

ঘুমুলে?

না, কেন?

আমাকে একটু পানি খাওয়াও না!

পানি!

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হাবিবের ইচ্ছে হয় বলে তার উঠতে ইচ্ছে করছে না, বলে উঠে বাতি জ্বেলে পানি ভরে আনতে গেলে চোখের পাতার ঘুমেরা আলোর ধাক্কায় পালিয়ে যাবে, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, আর সবচেয়ে বড় কথা আরামের ঘুমের সময় যন্তো ঝামেলা। হাবিবের প্রথম চেষ্টায় শরীর ওঠে না, দ্বিতীয়বারে উঠে খাবার ঘরে বাতি জ্বালাতেই চোখের ঘুম নেই হয়ে গেল, সে আধাগ্রাস পানি নিয়ে আসে। এসে দেখে রেহানা ষেভাবে মুয়ে ছিলো ঠিক সেভাবেই রয়ে গেছে।

রেহানা! পানি।

এনেছো?

উঠতে চেষ্টা করে রেহানা, কিন্তু মুহূর্তে সে বোধ করে কে যেন আবার, রাস্তার ওই হৈ হৈ ছেলেগুলো ও ওই দৃশ্য তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নিয়ে গেছে।

কি হলো, ওঠো!

আমাকে ধরবে একটু?

হাবিব এবারে বোঝে রেহানার স্বপ্নটা আসলেই ভয়ংকর একটা কিছু। তার আবার বিয়ের স্বপ্নে রেহানার শরীর কখনোই এরকম নিস্তেজ হয় না, স্বপ্নে খানিকক্ষণ কুঁই কুঁই করে কাঁদে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে খানিক হাঁপায়, তার পরে স্বাভাবিক। টেবিলে পানির গ্লাস রেখে দুই হাতে রেহানার দুই হাত ধরে টেনে তুলে বসিয়ে গ্লাস এনে মুখের কাছে ধরে। রেহানা গ্লাসটা নিজের হাতে নিয়ে এক চুমুকে সবটুকু পানি খেয়ে গ্লাসটা হাবিবের হাতে দিয়ে বলে,

এরকম স্বপ্ন দেখলাম কেন?

কি স্বপ্ন?

খাবার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে এসো।

খাবার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে হাবিব প্রথমে বিছানায় না গিয়ে টয়লেটে যায়।
এতোক্ষণ ঘুমের ঘোর ও বৌয়ের সেবার মধ্যে বুঝতে পারে নি পেশাবটা জোর চেপে
আছে। টয়লেটে বেশ সময় নেয় হাবিব। সময় নিতে নিতেই সহসা মনে আসে
রেহানার স্বপ্নটা খারাপ বা ভয়ংকর যা-ই হোক, তার মাত্রা কি? তাড়াতাড়িই বেরিয়ে
আসে টয়লেট থেকে। মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে দেখে রেহানা তার দিকেই চোখ
খুলে ত্যে আছে। পাশে পেয়ে রেহানা প্রবল শক্তিতে হাবিবকে জড়িয়ে ধরে বলে,
এরকম স্বপ্ন দেখলাম কেন?

কি স্বপ্ন?

রেহানা স্পষ্ট বুঝতে পারছে স্বপ্নে মার্কেটে যাওয়া, কেনাকাটা, কেনাকাটা শেষে
রাস্তায় নেমে অসহায় অবস্থায় পড়া, হৈ হৈ ছেলেদের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে বাতাসে
মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার কোনো ভয় কিংবা ক্লান্তি আসে নি, এলো অবিস্থাস্য সেই
দৃশ্য দেখে। প্রথম থেকে শেষের আগে পর্যন্ত বলে কাতর গলায় বললো,
দেখলাম, আমি দেখলাম সারা রাস্তায় ভাত ছিটানো।

ভাত!

হ্যাঁ, ধবধবে সাদা ভাত, রাস্তার এমাথা ওমাথা যতো দূর চোখ যায়, শুধু ভাত
আর ভাত, মনে হচ্ছে যেন ভাত দিয়েই রাস্তা বানানো।

ভাত শুনে প্রথমে অবাক হলেও এখন স্বাভাবিক হয় হাবিব। বলে, ভালোই
দেখেছো।

কিন্তু এরকম স্বপ্ন দেখবো কেন?

লে বাবা, এরকম স্বপ্ন দেখবে কেন তার আমি কি জানি? স্বপ্ন কি আমি চালান
করেছি?

না তা নয়। কিন্তু এ কিসের আলামত?

রেহানার এই জিজ্ঞাসায় রাগও ধরে আবার হাসিও পায় হাবিবের। আলামত বুঝতে
গেলে তাকে খাবনামার সহায়তা নিতে হয়। এক সময় খাবনামা দেখে দেখে স্বপ্নের অর্থ
দেখা দুজনের প্রিয় বিষয় ছিলো। গোটা খাবনামার মধ্যে একটা জায়গা ছিলো তার প্রিয়।
ডান চউক্ষের উপরের পাতা ফড়কাইলে সুন্দরী বিবি পাইবার আলামত। ডান চোখে
উপরের পাতা স্বপ্নের চাইতে বাস্তবেই বেশি কাঁপে বলে হাবিব কাঁপলেই বলে,

রেহানা, আমার ডান চউক্ষের উপরের পাতা ফড়কাইতেছে।

ঠিক আছে, সুন্দরী বিবির খোঁজে বাহির হইরা যাও।

রেহানার এখনকার কিসের আলামত গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত রাগ না করে হেসেই
ফেলে।

হাসছো কেন? এতে হাসির কি আছে?

হাসছি, কারণ এতে হাসির খোরাক আছে।

ঝাঁকুনি দিয়ে হাবিবের শরীর সরিয়ে দেয় রেহানা। নিজেও সরে গিয়ে বিপরীত দিকে কাত হতে হতে বলে,

তোমার সবটাতেই ফাজলামো।

রেহানা, এখন ঘুমের সময় ফাজলামো করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। সকালে অফিস ছুটতে হবে। আর কিছুক্ষণ না ঘুমুলে শরীর চলবে না।

ঠিক আছে, যতো পারো ঘুমোও।

আমিও বলছি, ঠিক আছে বাবা, তুমিও ঘুমোও, সকালে উঠে খাবনামা দেখে নিও। হলো?

কোনো জবাব দেয় না রেহানা।

অন্যপাশে মুখ ঘোরানোর চেষ্টা নেয় হাবিব। কাল অফিসে বেশ কিছু জরুরি ফাইল সারতে হবে, মিটিং করতে হবে একটা, মিটিংয়ের কাগজপত্রও পুরোপুরি রেডি হয় নি। সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে যাওয়ার আগে কাজ কোনটার আগে কোনটা মনে মনে সাজিয়ে নেয় একবার। এভাবেই সে অফিসে কাজ সাজায়। ভালো ঘুমে মাথাটা সফ ধাকলে কাজেও কোনো ঝামেলা হয় না। সে এখন আরেকবার কাজগুলো সাজাতে গিয়ে সহসা দেখে প্রথমবারের মতো বিষয়গুলো পর পর আসছে না। দুই একটা পয়েন্ট পরেই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ধুস্তোরি!

নিজের ব্যর্থতায় নিঃশব্দে বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে সেটা যে কিভাবে সশব্দে বেরিয়ে আসে নিজেই বুঝতে পারে না। নিজের কানকেই অবিশ্বাস্য মনে হয় হাবিবের কাছে।

কি হলো?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে রেহানা।

কোথায়?

এই যে ধুস্তোরি বলে উঠলে?

হঠাৎ বেরিয়ে গেল।

উঠে বসে রেহানা হাবিবের শরীরটা নিজের দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করে। হাবিব রেহানার দিকে ঘুরে না শুয়ে নিজেও উঠে পড়ে বলে,

আমাকে কি ঘুমুতে দেবে না?

তুমি কি আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছো?

না।

না হলে ধুস্তোরি বললে কেন?

রেহানা, কাল অফিসে আমার বহু কাজ। কাজের পয়েন্টগুলো চিন্তা করছিলাম। মিলছিলো না।

বিশ্বাস করিনে।

বিশ্বাস করোনা, মানে?

তোমার ঘুম নষ্ট হওয়ার জন্যে রাগটা কিভাবে প্রকাশ করবে, সরাসরি না বলে নিজের ওপরই রাগ ঝাড়ছো।

রেহানা, প্রিজ, বিশ্বাস করো।

গলা ভেঙে আসে রেহানার। শরীর ছেড়ে দিয়ে বালিশে মাথা রেখেই ফুঁপিয়ে ওঠে। হাবিব রেহানার গায়ে হাত দিয়ে টের পায় শরীর ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করছে। কি বলবে ভেবে পায় না হাবিব। একবার ভাবে উঠে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে আলোয় চেহারাটা দেখিয়ে বলে, দ্যাখো, আমার চোখেমুখে কোনো রাগ নেই। বিশ্বাস করো, নিজের ওপরই রাগ হচ্ছিলো বলে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আচ্ছা রেহানা, তুমিই বা এতো সিরিয়াস হলে কেন?

হাবিব!

বলো।

আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখলাম কেন?

হাবিব আবার শোয়। এবার সে রেহানার দিকে বা বিপরীতে কোনোদিকেই মুখ না ঘুরিয়ে মশারি ভেদ করে চলন্ত ক্যানের দিকে চোখ রেখে বলে,

আমিও মেলাতে পারছিলাম না। ওনি মানুষের অবচেতন মনে নাকি অনেক কথা খেলা করে, অনেক ছবি আঁকা হয়, সেগুলোই মাঝে মাঝে স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। তুমিও হয়তা কোনোদিন এরকম কিছু ভেবেছিলে। আসলে আমার মাথায়ও স্বপ্নটা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছিলো। মন থেকে যতোই তাড়াতে যাই, দেখি আবার ফিরে এসেছে।

রাত কটা বাজে?

বলতে পারবো না। বাতি জ্বলে ঘড়ি দেখবো?

না না করে মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে রেহানা। অন্ধকারেই জড়িয়ে ধরে হাবিবকে।
রেহানা! রেহানা!

ভীত গলায় বলে রেহানা,

শেষ রাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়।

এখন শেষ রাত না মাঝ রাত কি করে বুঝবো! আর এটা কি সত্যি হওয়ার মতো স্বপ্ন? সারা রাত্তার ছড়ানো ছিটানো ভাত, বাস্তবে কি তাই ঘটবে? তুমিই বলো।

রেহানা আরো শক্তিতে জড়িয়ে ধরে হাবিবকে। বলে,

আমার মনে হয় খুব খারাপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

কি সেটা?

বলতে পারবো না। মনে হয় সাংঘাতিক একটা কিছু হবে।

আশ্চর্য! এ স্বপ্নের সঙ্গে সাংঘাতিকের কি সম্পর্ক?

কোনো জবাব দেয় না রেহানা। হাবিব জানে সঠিক কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব। সারা রাত্তায় ছড়ানো ছিটানো ভাত শুভ না অন্তরের লক্ষণ, না এর আদপেই কোনো অর্থ নেই এই নিয়ে মাথা ঘামানোই আসলে পাগলামো। কিন্তু রেহানাকে বোঝাবে কে? বোঝাই যাচ্ছে স্বপ্নটা পেয়ে বসেছে রেহানাকে।

মাঝে মাঝেই কোনো কোনো স্বপ্ন পেয়ে বসে রেহানাকে। একবার দেখলো তার সামনের একটা দাঁত পড়ে গেছে। ব্যস, আপনজন কে মরবে না মরবে এই নিয়ে শতোকদিন দুঃসংবাদ শোনার জন্যে কান খাড়া রাখতো। একটা দুঃসংবাদ এসেছিলো একবছর আড়াই মাসের মাথায়। রেহানার মা মারা গেলে রেহানার অনেক শ্রুতিচারণের কান্নার মধ্যে সেই স্বপ্নের দাঁত পড়ে যাওয়ার উদাহরণটিও এসে গেলে হাবিব রেহানাকে লুকিয়ে খানিক হেসে নেয়। এক বছরের বেশি আগে দেখা স্বপ্নের জোর এখনও কতোটা থাকে তা মেলানোর সাধ্য বা ইচ্ছে হাবিবের নেই, কিন্তু মজাটা সে উপভোগ করে অনেকক্ষণ ধরে। আরেকবার দেখলো হাবিব নিজেই ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নটি দেখার পর সকাল থেকে রেহানা খুব উচ্ছসিত। ঘোড়ায় চড়া খুব সম্মানের ব্যাপার। রেহানা গভীর আশায় দিন গোনে কখন তার স্বামীর বড় একটা সম্মানের খবর আসে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনকি কয়েকটা বছরও চলে গেছে, হাবিব সম্মান ও অসম্মানের মাঝামাঝি যেখানে অবস্থান করছিলো সেখানেই রয়ে গেছে।

আর ঘুম হয় না হাবিবের। ঘুম আনার চেষ্টায় কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে বখন বুঝতে পারে আজ রাতের মতো ঘুম শেষ, তখন সে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে অন্ধ ও অন্ধকারের মাথার বহু ওপর অস্পষ্ট কিছু তারা জ্বলছে দেখে হাবিব বুঝতে পারে আকাশে পাতলা মেঘ আছে। ওই মেঘ, তারা ও এই অন্ধকার তার এই মুহূর্তের একমাত্র সঙ্গী। চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহসা সে চমকে উঠে নিজেকেই প্রশ্ন করে, স্বপ্নটা আমাকেও কেন পেয়ে বসলো। এরকম স্বপ্ন কেন দেখলো রেহানা? আকাশ অন্ধকার তারা হাতড়ে ফিরে ফিরে হাবিব বোঝে রেহানার সেই ছোটবেলার তেজস্বিনীর দুর্ভিক্ষের একদিনে তাদের বাড়িতে দুই ক্ষুধার্ত ভাত নিয়ে মারামারি করেছিলো, উঠোনে খালার সাদা ভাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলো, আহত ক্লান্ত দুই অনাহারি মরার মতো পড়ে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো উঠোনময় ভাতে কাকদের কেমন উৎসব লেগেছে। কোন অতীতের ছড়ানো ভাতের দৃশ্য স্মৃতি হিঁড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসে কিনা সেই স্বপ্নরহস্য জানে না হাবিব, জানে স্বপ্নে ভাতের দৃশ্যটি রেহানাকে বড় বেশি বিচলিত করেছে।

বারান্দা থেকেই ডাক দেয় হাবিব,

রেহানা, রেহানা।

জবাব পায় না হাবিব। না পেয়ে তাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্বস্ত হয়। এখন ঘুমটা জরুরি। স্বপ্ন ওকে যেভাবে অধিকার করেছিলো তাতে অসুস্থ হয়ে পড়াও অসম্ভব

নয়। একটা ভালো ঘুম হলে মনটা হালকা হবে, হয়তো ভুলেও যাবে রাতের স্বপ্নের দৃশ্য। হালকা মনে আবার আকাশ অন্ধকার তারা দেখে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই দেখে দরজায় ছায়ামূর্তি। গলা দিয়ে ভীত অস্পষ্ট শব্দ বেরোয় শুধু,

কে?

ডাকছিলে কেন?

ও! রেহানা!

এমনভাবে এসে দাঁড়িয়েছো যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ডাকছিলে কেন?

সমস্ত কথায় একটাই প্রশ্নে আর কি কথা বলবে হাবিব ভেবে পায় না।

অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটি অশরীরীর মতোই দাঁড়িয়ে থেকে হয়তো আবার একই প্রশ্ন করবে ডাকছিলে কেন? এবং রেহানা করেও তাই।

স্থিত হয় হাবিব। বলে,

ডাকছিলাম, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে হয়তো ভালো লাগেবে।

ও!

হাবিব রেহানার হাত ধরে পাশে দাঁড় করায়। দাঁড় করানোর পর হাবিব সহসা অনুভব করে রেহানার হাতটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। শিরশির করে সারা শরীর কেঁপে যায় হাবিবের, যে হাত সে ধরেছিলো সে হাত সত্যিই মানুষের হাত কি না। শুকনো গলায় ডাক দেয় হাবিব।

রেহানা!

বলো।

তুমি অমন করছো কেন?

বলো শুনিছি।

কি হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নি।

তাহলে?

জানি নে।

হাবিবের অনুমান হয় যোজন যোজন দূর থেকে একটা অচেনা কণ্ঠ জানি নে জবাব দিয়ে শুধু অস্তিত্ব জানিয়ে গেল, নিজেকে স্পষ্ট করে গেল না। অতি কাছের মানুষ শরীর সংলগ্ন থেকেও দূর বহুদূরের মানুষ থেকে গেলে কিভাবে তার কাছে পৌঁছাতে হয় সেই রহস্যও তার অজানা, সে এই মুহূর্তে শুধু বাতাসই আঁকড়ে ধরতে পারে।

হাবিব।

বলো।

আমি ওরকম একটি স্বপ্ন দেখলাম কেন?

আবার সেই প্রশ্নে ফিরে গেছে দেখে হাবিব রেহানাকে বুকের গভীরে টেনে এনে বলে,

হয়তো ছোটবেলার সেই দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ফিরে এসেছিলো। তুমিই তো বলেছিলে স্মৃতিটি তুমি ভোলো নি।

হ্যাঁ বলেছিলাম।

ইঠাৎ মনে পড়ে হাবিবের। যুদ্ধের সময় গ্রাম গ্রামান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর সময় জীবনের চাইতে কিধে যখন বড়ো হয়ে উঠতো তখন শুধু এক মুঠো ভাতের জন্যে মনে হতো পৃথিবীর সবকিছু খেয়ে ফেলি। সেই কথাটাই বলে হাবিব।

হয়তো একান্তরের সেই স্মৃতি স্বপ্নে এভাবে এসেছে।

হবে হয়তো।

তাহলে? তাহলে এভাবে অস্থির হয়ে পড়েছো কেন?

জানি নে।

জানাজানি করে কোনো লাভ নেই, স্বপ্ন স্বপ্নই। ওইসব খাবনামা ফালনামা স্বপ্নের সব হাতবানানো ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে তোমাকে অসুস্থ করে ফেলেছে। চলো, শোবে। এখনও একটু ঘুম যদি হয়।

নিস্তেজ গলায় বলে রেহানা,

চলো।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় হাবিব। ধরেই নেয় রেহানা তার পিছু পিছু আসছে, কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে পেছনে পায়ের কোনো শব্দ না শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো রেহানা সেখানেই দাঁড়িয়ে। বিরক্ত গলায় ডাকে হাবিব,

কি হলো?

হাবিব শোনো। এদিকে এসো।

কেন?

এসে দেখোই না।

অবাক হয়ে রেহানার কাছে এগিয়ে যায় হাবিব। জিজ্ঞেস করে, কি দেখবো?

দেখো, সামনের মাঠে সাদা সাদা কি যেন সব দেখা যাচ্ছে না?

তোমার কি মাথা কারাপ?

না না, মাথা কারাপ নয়। আমার মনে হচ্ছে, ওই শাদা শাদা জিনিসগুলি যদি কাকনের কাপড় হয়! বলো হতে পারে না? বলো না!

সেই ছবি

মামুন আসে না, মামুন আসছে না। এই গ্রামের রফিক, সানাউল্লাহ, নুরু, কাদের, সুকুমার, বজলু দুই সপ্তাহ, একমাসের মধ্যেই গ্রামে ফিরে এসেছে, আসে না কেবল মামুন। যারা এসেছে তারা এসে একে একে ঢাকা শহরের যে বর্ণনা দেয় তাতে মামুনের মার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, নেই, তার মামুন নেই।

নুরু পর্যন্ত আসায় আশায় বুক বেঁধে ছিলো মামুনের মা, কিন্তু কাদের যখন বলে, চাচি, লড়াই শুরু হওয়া রাতে, রাত তা প্রায় নয়টার মামুন আমার মেসে এসেছিলো, কিন্তু তার পরে ওর কোনো খোঁজ পাই নি।

আমার মামুনের হস্টেলে নিয়ে খোঁজ নিস নি?

কি করে যাবো চাচি! এই গ্রামে বসে তোমরা ভাবতেই পারবে না ঢাকা শহরে কি হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় শয়ে শয়ে লাশ, অগুণতি পোড়া ঘরবাড়ি, চাচি, সে দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। কিভাবে যে পালিয়ে এসেছি, আত্মাই মালুম।

শয়ে শয়ে লাশ শুনে মামুনের মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তাহলে ওর মধ্যে আমার মামুনও আছে।

বোঝাতে চেষ্টা করে কাদের,

চাচি, ঢাকা শহরে সব লোক তো মারা যায় নি। ঢাকা কি এই নিমচর গ্রামের মতো ছোট্ট একটা জায়গা? ওখানে লাখ লাখ লোক বাস করে।

তাহলে তোরা বেঁচে থেকে ফিরে আসতে পারলি, কিন্তু আমার মামুন এলো না কেন?

শোকে ও হতাশায় মামুনের মা যতোই ভেঙে পড়ুক, তার কথায় যে যুক্তি আছে তা সে কেলে কি করে? ঢাকা থেকে তাদের এই গ্রামে আসতে পুরো ঢাকা জেলা, তারপরে বিশাল পদ্মা ও যমুনা নদী, তারপরে সম্পূর্ণ পাবনা জেলা হয়ে তবে রাজশাহী, সেই রাজশাহী শহর থেকেও আরো আটত্রিশ চল্লিশ মাইল উত্তরে নিমচর গ্রাম। সে কি এখানে? মামুনরা প্রথম প্রথম বলতো আমাদের গ্রাম দুনিয়ার বাইরে। সত্যিই মনে হয় দুনিয়ার বাইরে। এখানে বিদ্যুৎ আসতে আরো কতো দশ বছর লাগবে কে জানে। সারা গ্রামে দুটোমাত্র রেডিও। ব্যাটারিতে চলে। তারই একটি

রেডিওতেই প্রথম ধরা পড়ে ঢাকা শহরে নাকি খুব গোলাগুলি হয়েছে। অনেক, অনেক মানুষ মরে গেছে। কত যে ঘরবাড়ি গুঁড়ো হয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

এই নিমচর গ্রাম দুনিয়ার যতো বাইরেই হোক, গ্রামের লোক জানে দেশে গুণগোল লাগতে পারে, গ্রামের লোক লোকমুখে ও ঢাকা রেডিও, কলকাতা রেডিওতে শুনেছে শ্যাখ মজিবরের ছকুমে দ্যাশ চলে, মিলিটারির কোনো পাত্তাই নেই। বাপের ব্যাটা শ্যাখ মজিবর। এহিয়ার নাকে দড়ি দিয়ে কেমন ঘোরানো ঘোরাচ্ছে। শহর থেকে আগত লোকজন ও রেডিওর খবরটবর শুনে গ্রামের মোজাহার চেয়ারম্যান একদিন গ্রামবাসীদের ডেকে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়ে দেয়—দ্যাশ স্বাধীন হলো বলে। তোমরা জোরে বলো জয়বাংলা।

উপস্থিত শ্রোতারা গলার সমস্ত জোর দিয়ে বললেও চেয়ারম্যান মুখ ভেঙে বলে, অই ইঁদুরের বাচ্চারা, ইঁদুরের গলাও তো তোমাদের চাইতে উপরে ওঠে। এমন জোরে বলো যে এহিয়ার বাচ্চা এহিয়ার কানে তালা লেগে যায়, সে যেন হেগে মুতে প্যান্টট্যান্ট নষ্ট করে ফেলে।

গ্রামের লোকজন দ্বিগুণ উৎসাহ ও শক্তিতে জয়বাংলা ও তোমার নেতা আমার নেতা শ্যাখ মুজিব শ্যাখ মুজিব বললে মোজাহার চেয়ারম্যান মাথা নেড়ে নেড়ে মনে মনে দেখে নেয় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্যান্টের পিছনে হলুদ দাগ ও সামনে ভেজা। সবাই তখন স্বাধীন বাংলাদেশে নিঃশ্বাস নেয়। কিন্তু এর মধ্যে কি এমন হলো যে দ্যাশের রাজা মজিবরকে পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েদ করে নিয়ে গেছে, ঢাকা রেডিও, কলকাতা রেডিও তো সেইরকম খবরই দেয়, তাহলে সাধের স্বাধীন বাংলাদেশ হলো না? নিমচরের লোকেরা চেয়ারম্যান, প্রাইমারি স্কুলের হেডমাষ্টার, মসজিদের ইমামের কাছে বারবার ছুটে যায়, বলেন না আপনারা, বলেন, দ্যাশে এ কিসের আলামত? আসলেই কি ঘটছে দেশে? এর মধ্যেই একজন দুজন করে প্রথমে আসতে থাকে রাজশাহী শহর থেকে, তারা যেসব খবর দেয় তার সাথে ঢাকা রেডিওর খবরের চাইতে কলকাতা রেডিওতেই শোনা কথার মিল বেশি, আর একে একে যখন রক্ষিক সানাউল্লা নুরুন্না আসতে থাকে, এসে বলতে থাকে কলকাতা রেডিওর খবরে কোনো ভুলতো নেই-ই, আসল খবর তার চাইতেও খারাপ, তখন মামুনের মা হায় হায় করে একবার ঘর একবার বার একবার চেয়ারম্যানের বাড়ি একবার গ্রামের কাঁচা রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে চোখের ওপর হাত তুলে দেখে মামুনের মতো কেউ আসছে কিনা, খোঁজ দিলেও দিতে পারে এমন কারো সঙ্গে দেখা হলেই ফালাফালা হয়ে জিজ্ঞেস করে, আমার মামুন, আমার মামুনের কোনো খোঁজ জানো?

দেড় মাসের মাথায় ঢাকা থেকে আসে গ্রামের মাদ্রাসার বড় মওলানা। খবর শুনেই ছুটেতে ছুটেতে যায় মামুনের মা।

ও মওলানা সাহেব, আমার মামুনের কোনো খোঁজ জানেন?

বেগানা আওরতের মুখের দিকে তাকানো কবীরা শুনাই বলে মওলানা অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। গুণগোলের আগের দিনই মামুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।

ঢাকায় নিউমার্কেট বলে একটা জায়গা আছে, আমি সেখানে মাদ্রাসার জন্যে কিছু বই কিনতে গিয়েছিলাম, সেখানেই মামুনের সঙ্গে দেখা।

কী? কী বললো আমার মামুন?

আপনার কথা জিজ্ঞেস করলো, বললো ওর হস্টেল খুব কাছেই, আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলো, আমি পরে যাবো বলে আর যেতে পারলাম কৈ? ঢাকা কি আর সেই ঢাকা আছে? আর আপনার ছেলে যেখানে থাকে সেখানে তো ছবি আঁকার মতো বেদীন কুফুরি কাজকর্ম হয়। আমি এইটুকু শুনেছি ছবি আঁকার কলেজের ছাত্রদের হস্টেল মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানি মিলিটারিরা যেখানেই বেদীন কাজকর্ম হয়, সেখানেই কিছু রাখে নি। ওই খবর শুনে আমি আর আপনার ছেলের বোঁজে যাই নি। এখন আত্মাই মালুম। এতোদিনও যখন ফেরে নি, তখন পাক পরওয়ারদেগারই জানেন তার নসিবে কি ঘটেছে।

মাদ্রাসার বড় মওলানা একটানা এতোগুলো কথা বলে গেলে মামুনের মার চোখে তখন একটা ছবিই ভাসে, তার ছেলের থাকার জায়গা যখন মাটিতে মিশে গেছে, তখন অতো কথা কে শোনে, সে বারান্দার ঝুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মওলানা সামনের দিকে দশ পা বাড়িয়ে আবার ঘাড় ঘোরায়। আপনাকে এবারে একটা কথা বলি।

মামুনের মা শুধু চোখ তুলে তাকায়, কিন্তু সে চোখে কোনো প্রশ্ন নেই।

কথাটা হচ্ছে, যেখানে আমার কোনো কথা না শুনে, আমার সঙ্গে কোনো আলাপসাদাপ না করে ছেলেকে পাঠালেন নাফরমানি পড়া পড়াতে, সেখানে আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবেন না। জন্মের পর থেকে দেখছি, তাই দরদ আছে, কিন্তু আব্রাহাম রসুলের ইচ্ছার বাইরে তো কিছু করতে পারি নে।

মামুনের মার এসব কথাও কানে যায় না। সহসা তার বুকের তোলপাড় চিৎকার হয়ে প্রকাশ পেলে আশেপাশের সব মানুষ বুঝে নেয়, পাগল হয়ে গেছে, মামুনের মা পাগল হয়ে গেছে।

ছবি আঁকা শেখা আবার কেমন পড়া তা গ্রামের মা বোঝে না বলে মামুন তাকে বোঝায়,

মা, আমাদের দেশে জয়নুল আবেদিন নামে এক মস্ত ছবি আঁকার লোক আছে। সে ছিলো খুব গরিব মানুষের ছেলে। কিন্তু এখন দুনিয়ায় তার কতো নাম, তার কতো টাকা। আচ্ছা মা, তুমি বলো, আমার আঁকা ছবি দেখে দশগ্রামের লোক খুব ভালো বলে না? বলো, বলে কি না?

মাথা নাড়ে মা। তার ছেলের হাতে কি আছে, খাগের কলম দিয়ে এ-রং সে-রং লাগিয়ে কি সুন্দর তাজা তাজা মানুষ নদী গাছপাছালি গরুবাছুর পক্ষী একে ফেলে, অনেক সময় তার নিজেরই মনে হয়েছে মানুষের যদি জ্ঞান দেবার ক্ষমতা থাকতো তাহলে এই সব ছবির মানুষ পশু পাখিরাই তাজা হয়ে চলাফেরা করতো। সে চোখ

কেলে ছেলের শিল্পকর্ম দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যায়। কিন্তু হায় আত্মা, মওলানা যা বলে গেল তার মানে তো এই ওই ছবি আঁকাই তার কাল হয়ে গেল। ও আত্মা, আমার মামুন কোনো ওপাহর কাজ করে থাকলে আমি যা তোমার কাছে আমার ছেলের জ্ঞান ডিঙা চাই। তুমি পাক পরওয়ারদেগার, মাফ করে দাও, মাফ করে দাও।

মামুন আসে না, কতো লোক আসে, মামুন আসে না। পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মামুনের মার একসময় মনে হয় পথের সব কিছুই ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে, ধূলিময় হয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামে এখনও মিলিটারির নামগন্ধ নাই। কিন্তু মিলিটারিদের নানান খবর রেডিওতে লোকমুখে ভেসে বেড়াতে থাকলে গ্রামময় সবার চোখেমুখে তো বটেই, গাছের পাতাদের গারেও আভঙ্ক আঁকা হয়ে যেতে থাকে, মামুনের মারের মুখে এখন কোনো না আশঙ্কা, না আশা, ভাবলেশহীন একটা মানুষ বাড়ির সদর দরজায় শুধু বসে থাকে। দুই মাসের বেশি পার হয়ে গেছে। গোটা নিমচর গ্রাম জানে মামুন নামে এই গ্রামের একটি ছেলে পঁচিশে মার্চ রাতেই মারা গেছে। সেই সময় আসে মামুন।

বজলু আর নূর তখন হাটে যাচ্ছে। গ্রামের পশ্চিম মাথায় হাট, হাটের পরে নদী, নদীটা কোমর বাঁকিয়ে নিমচরকে বেড় দিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে, বেড়ের কাছাকাছি বজলুই প্রথম দেখে।

দ্যাখতো, দ্যাখতো, মামুন না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মামুন, মামুনই তো মনে হয়! হাঁরে, মামুন, মামুন। চিৎকার করে ডাকে বজলু, মামুন।

অদূরের মামুন ওখান থেকেই জবাব দেয়, কে? বজলু ভাই?

বজলু সোজা মামুনের দিকে দৌড় দিয়ে কিছুক্ষণ পর পেছন ফিরে দেখে নূর উলটোদিকে দৌড়াচ্ছে। নূর যে গ্রামে চুকে আপে খবরটা জানাবে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না বজলুর।

মামুন তুমি বেঁচে আছো?

হুঁ হুঁ হুঁ জবাব দেয় মামুন, কি মনে হচ্ছে?

আমরা ধরেই নিয়েছি তুমি মরে গেছো।

কথা তো সেইরকমই ছিলো।

গ্রাম ভেঙে এসে মামুনকে ঘিরে ধরলে মামুন সবার অবিশ্বাসের মধ্যে ওই কথাটাই বলে, কথা তো সেইরকমই ছিলো। আমার ক্রমমেট ছিলো নজরুল, খুব ভালো কার্টুন আঁকে। সবাই শুকে বলে কার্টুনিষ্ট নজরুল, ওর পেটে ওলি লেগে পিঠে এতো বড় একটা গর্ত বানিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার দিকেও ওলি করেছিলো। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে কিভাবে যে বেঁচে গেছি জানি নে।

জিজ্ঞাস করে মোজাহার চেয়ারম্যান, সে কি মরে গেছে?

না। দেখে এসেছি বেঁচে আছে। মনে হয় বেঁচে যাবে। এখন হাসপাতালে।

আল্লাম কুদরৎ। হারাত মউত যে আল্লাম হাতে দেখলে তো?

মামুন ঘাড় ঘুরিয়ে মওলানাকে দেখে নিয়ে বলে, আমার বেঁচে যাওয়াও আল্লাম কুদরৎ। আপনি আমার হস্টেলে গেলেন না কেন?

সময় পাইনি বাবা!

মিটমিট করে হাসে মামুন।

আপনি ছবি আঁকার জারগা নিয়ে কুকরী টুকরী কি সব বলছিলেন বলে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যাবেন না।

সবাই হুড়মুড় করে জানতে চায় মামুনের আসতে এতো দেরি হলো কেন? জানতে চায় ঢাকায় সে কি দেখেছে, যা শোনা যাচ্ছে তার সবই কি সত্যি? মামুনের এখন আর কোনো কথার জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। দীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতে তার শরীরে যতো ব্যথা তার চেয়েও মনে বেশি কষ্ট সারাদেশে পাকিস্তানি মিলিটারি কি করেছে আর কি করে নি। প্রতিটি জনপদে তারা কী ভয়াবহ চিত্র এঁকে গেছে তা কি তার মতো সামান্য শিল্পী এঁকে দেখাতে পারে? ঢাকা থেকে রাজশাহীর এই অজপাড়াগাঁ নিমচর পর্যন্ত পথ হাঁটতে হাঁটতে তার ওখুই মনে হতে থাকে কেন বেশি করে রং তুলি কাগজ আনলাম না। আনলে সারা বাংলাদেশ আঁকতে আঁকতে আসা যেতো।

মামুন একটা ছোট ব্রাশ ও একটা কালো রঙের টিউব ছাড়া আর কিছুই আনতে পারে নি। সাতাশে মার্চ কারফিউ দুই ঘণ্টার জন্যে শিথিল করলে সে ছুটতে ছুটতে হস্টেলে গিয়ে জামাকাপড় যা পেয়েছে সবই পোড়া, ট্রাংকে একশো সাতাশটা টাকা ছিলো নেই, মেঝেতে ওই টিউব এবং দরজার নিচে ব্রাশটি ছাড়া আর যা যা আছে সবই যেন হাহাকার করে বলেছে পালাও মামুন, পালাও, ইপিআরদের নাকের ডগায় আর একটা মুহূর্ত নয়, পালাও।

পালানোর মুহূর্তে চোখে পড়ে মামুনের। নজরুলের বিছানার ওপর বঙ্গবন্ধুর সেই ছবি। তার চোখে চশমা নেই, দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন তিনিই জানেন। ছবিটি দেখে প্রথমেই ঝটকা লাগে। অচেনা-অচেনা মনে হয়। বলতো নজরুল,

মামুন জানো, এই ডাকানোর মধ্যে মনে হয় বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যতের বাংলাদেশ দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর এরকম নিমগ্ন চোখমুখের ছবি কি আগে কখনও দেখেছো?

মনে করতে পারে না মামুন। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না, দেখি নি। এ তো দুর্লভ ছবি! কোথায় পেলো?

ফটোগ্রাফার রশীদ ডালুকদারের কাছে। দিতে কি চায়? গ্রার পারে ধরে তবে নিরেছি।

সেই ছবি পড়ে আছে নজরুলের বিছানায়, ক্রম ভাঙা, কাঁচের গুঁড়ো সারা বিছানা ও মেঝের রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পরম যমতার ছবিটি ব্যাগে তুলে নেয়

মামুন। তার মনে হয় এই ঘরে আবার মিলিটারি এলে এই অশ্রুত ছবিটিকে আর অশ্রুত রাখবে না। হয়তো পা দিয়ে মাড়াবে, হয়তো মুখে পেশাব করবে, হয়তো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দিতে দিতে বলবে গান্ধার, গান্ধার! না, এটা হতে দেয়া যায় না। নিজের জীবনের চাইতে বঙ্গবন্ধুর ছবিকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে হয় মামুনের কাছে।

ভাগ্যবান মামুন। দীর্ঘপথে তাকে মিলিটারির তল্লাশিতে পড়তে হয় নি। ঢাকা-আরিচা মূল রাস্তা ছেড়ে, নগরবাড়ি নাটোর হয়ে রাজশাহী শহর এড়িয়ে পার হয়েছে শুধু গ্রাম আর গ্রাম। বহু গ্রামে ধ্বংস দেখেছে, বিধ্বস্ত মানুষ দেখেছে, বিধ্বংস ঘরবাড়ি দেখেছে, ভাগ্যবান মামুন, মিলিটারিরা তাকে দেখে নি।

বাড়ি ফেরার দুইদিন পর মামুন ব্যাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবিটি বের করে বাথারির ফ্রেম বানিয়ে ঘরের বাঁশের ঝুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে।

জিজ্ঞেস করে মামুনের মা, এ কে বাবা?

এই তো শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু।

এই লোক? এতো সুন্দর? আহ্‌হা, মার বুক খালি করে চলে গেছে?

না মা, মার বুক খালি করে যায় নি। পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে আছে। এখনও মরে নাই। মরলে জানতাম।

কিন্তু বাবা, তার ছবি ঘরে থাকলে কোনো বিপদ হবে নাতো?

না। বঙ্গবন্ধু যখন বেঁচে আছে, তখন আমরাও বাঁচবো।

মামুনের মা ছেলের এই কথার কি অর্থ বোঝার চেষ্টা করে না, দুই চোখ মেলে বারবার ছবিটি দেখে আর বলে, এতো সুন্দর, এতো সুন্দর!

মা, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি আল্লা রসুলের নামে কিরা দিয়ে বলো, আমার ঘরে যে শেখ মুজিবের ছবি আছে কাউকে বলবে না।

কি বলছিস তুই? এইরকম মানুষের ছবি আমার ঘরে আছে তা লোকে দেখবে না?

এখন না। যখন দেখানোর সময় হবে তখন দেখবে। এখন দেখাতে গেলে আমি বাঁচবো না। এ বাড়ির কিছুই বাঁচবে না। আর হ্যাঁ, আমার ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না।

কিন্তু মামুনের ঘরে ঢোকে তিনজন। দুই পাঞ্জাবি সিপাই। এক প্যারা মিলিশিয়া। গ্রামে মিলিটারি নেমেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে গ্রামময় আতঙ্ক ও ছুটোছুটি পড়ে যায়, মামুনের মাও ছুটে আসে।

ও মামুন, পালা, পালা শিগগির।

কোথায় পালাবো মা? ওরা ধরলেই মেরে ফেলবে। মা, ঢাকায় তো মারার জন্যেই গুলি করেছিলো। মরি নি। আজও দেখো, মরবো না।

ছেলের বিশ্বাসে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ চেষ্টা করে ওঠে মা,

কিন্তু ঘরে যে মজিবরের ছবি?

থাক। ও ছবি কোথায় লুকাবো মা?

বাড়িতে ঢুকে পড়ে তিনজন। হুংকার দিয়ে বলে, কে আছে, বাইরে এসো।

মা ও ছেলে বাইরে আসে। এই সেপাই জিজ্ঞেস করে, মুক্তি করো?

না।

ঠিক?

ঠিক।

মুক্তি কোথায়?

জানিনে।

সত্যি বলছো?

সত্যি বলছি।

ঘর তল্লাশি করবো।

করো।

রাইফেলের নলের আগায় মা ও ছেলেকে ঘরে নিয়ে বাস, ধানের গোলা, হাঁড়িপাতিল সব ওলটপালট করে দেবার পর তিনজনের একজনের সহসা চোখ পড়ে বঙ্গবন্ধুর ছবির ওপর। থমকে যায় সে-জন। চোখ কুঁচকে যায় তার।

এ ছবি কার?

শান্ত গলায় জবাব দেয় মামুন, আমাদের পিতার।

চলে যায় তিনজন। মামুনের মা ছেলের উর্দুতে এটুকু বুঝতে পারে সে তাকে জন্মদাতা বলে পরিচয় দিলো।

ও মামুন, তুই এটা কি বললি?

ঠিকই বলেছি। সে-ই আমাদের বাঁচিয়েছে।

অসত্যের সত্য

মধ্যরাতে এতো জোরে ফোন বেজে ওঠে যে কানে তালা লেগে যায়। মনে হয় ঘরের ষাট চেয়ার টেবিল আলমারি সব, সবকিছু আন্দোলিত হয়ে গেল, সহসা গাঢ় ঘুম ভেঙে যাওয়াতে আমার স্ত্রী আমাকে আতঙ্কে জড়িয়ে ধরে জড়ানো গলায় বলে,

ফোন, ফোন বাজে।

ফোন যে বাজে তা আমিও শুনছি, মনে হচ্ছে জেলখানায় পাগলা ঘন্টি বাজছে, কিন্তু ফোন ধরার সাহসের পরিবর্তে আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, এ ফোন তো বাজার কথা নয়!

কুমা, এ ফোন তো বাজার কথা নয়।

কিন্তু বাজছে তো!

বাজছে সে তো শুনছিই। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? কুমা আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে ঘরের ঘোলাটে আলোয় ফোনের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কি ভয় পেলো কুমা? ভয় পাওয়ার মতোই আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁপা গলায় বলে,

আমার ভয় করছে।

না না, ভয় পাওয়ার কি আছে? কেউ কথা বলতে চাইছে বলেই তো ফোন করেছে। দাঁড়াও, ফোনটা রিসিভ করি আগে।

কুমা এটাও করতে দিতে রাজি নয়। বুকের গভীরে তার মুখের শিরা-উপশিরার কাঁপন আমাকে বুঝিয়ে দেয় তাকে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেলে সে নির্ঘাৎ অথৈ সাগরে পড়ে যাবে, না হয় গভীর অরণ্যে বেরোনোর পথ খুঁজে পাবে না, কিংবা হা হা শূন্যতার ভরা ধু ধু মরুভূমিতে সে নিজেকে দেখতে পাবে একা, শুধু একা।

কী পাগলামো শুরু করলে?

জামিল, পাগলামো আমি করছি নে, করছো তুমি। তুমিই বলো আজ এই ফোন কি বাজার কথা? কি বলে গেল লাইনম্যান?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় এই ফোন আজ কেন, আগামী দু দিনেও বাজার কথা নয়। লাইনম্যান সে কথাই তো বলে গেল। হ্যাঁ, আমি তাকে চা-পানি খাইয়ে পকেটে একটা খাম দিয়ে শুধু হাত কচলাই নি, অনুরোধ করে বললাম,

আজ ডায়ালটোনটা দিয়ে দেওয়া যায় না?

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করে না লাইনম্যান। না না, আজ কেন, আগামী রবিবারের আগে সম্ভব না। সোমও হতে পারে।

ডায়ালটোন দিতে তিনদিন লাগবে?

স্যার, টেকনিক্যাল ব্যাপার। অনেক কিছু টেস্ট করে তবে ডায়ালটোন দিতে হয়। মনে করেন আপনার ফোন চালু হয়ে গেছে।

হাসলাম। বলি,

মনে করলেও তো এই এখন কথা বলতে পারবো না।

লাইনম্যান আমাকে শিক্কের ভণ্ডিতে বোঝায়। স্যার, আসল বাধাগুলো তো পার হয়ে গেছে।

কিভাবে?

চিন্তা করে দেখুন, সেই দরখাস্তের পর ডিমাস্ত নোট, অ্যাডভাইস, তার লাগানো, সেটে কানেকশন, এগুলোই তো আসল। এতোই যখন দেরি হলো, তখন আর দুই-তিনটা দিন।

আর দুই-তিনটা দিন বলে লাইনম্যান কথা শেষ করে না। হেসে বলে, স্যার, পয়লা ফোনটা আমাকে করবেন আর মিষ্টি খাওয়াবেন।

রাগ হয় আমার, কিন্তু প্রকাশ করার উপায় নেই। মনে মনে বলি একটু আগে পকেটে যে খামটা দিয়েছি তাতে তোর পরিবারের দুইদিন পেট পুরে মিষ্টি খাওয়া হয়ে যাবে।

না, এবারও আমি হাত কচলাই নি। হাসিমুখেই বলি,

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মনে হলো খুশি হলো লাইনম্যান এবং হাসিমুখে চলে গেল।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা। কাল সাপ্তাহিক ছুটি। পরও শনিবারেও হবে না, রবিবারে হলেও হতে পারে। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতেই ফোন বাজে, কে বাজায়, আজ তো কোনোক্রমেই বাজার কথা নয়!

বুক থেকে মুখ বের করে রুমা আমার বাহু চেপে ধরে।

জামিল, তুমি যাবে না।

কানের কাছে এতো জোরে ফোন বাজছে, আর যাবো না?

জামিল, এটাকে কি তুমি স্বাভাবিক ফোন মনে করো?

মুহূর্তে আমার খটকা লাগে। স্বাভাবিক সময়ে স্বাভাবিক বিষয়ও যে কখনও কখনও অস্বাভাবিক হয় সেই সত্যের কথা তুললেও কখনও তার মুখোমুখি হই নি, রুমা আমাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে দেয়।

কিন্তু কোনটা যে বেজেই চলেছে।

এক সময় থেমে যাবে।

লাইনম্যান আজ ডায়ালটোন হবে না বলে যাওয়ার পরও হঠাৎ যদি কাজটা করে দেয়?

হাসে রুমা।

তুমি কোন দেশে বাস করছো জামিল?

আমার বুঝতে অসুবিধা হয় না। রুমা বোঝাতে চাইছে অতি জরুরি অতীব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজকর্মই যেখানে সময়মতো হতে চায় না সেখানে আমার মতো যদুমধু এক লোকের কোন রাত জেগে লাগিয়ে দেবে এটা কে বিশ্বাস করবে। বলি, কখনও কখনও অবিশ্বাস্য ঘটনা তো ঘটেই।

কোন তখনও বাজছে।

জামিল, জানি, তুমি সেভেনটি ওয়ানের কথা বলতে চাইবে। বলবে নেংটি পরা রোগা দুবলা ভেতো বাঙালি কি অসাধ্য সাধন করলো, তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু তখন সমস্ত অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠার জন্যে ছটফট করছিলো। সময়, শুধু সময়ই সম্ভব-অসম্ভবকে ওলট পালট করে দেয়।

আমি কোনো জবাব খুঁজে পাইনে। যুদ্ধ বলি, জীবন বলি, বেঁচে থাকা মরে যাওয়া যা কিছু বলি, সময়ই সময়ের খেলা খেলে জানা সত্ত্বেও আমার শুধু মনে হতে থাকে, রুমা, এ কোন রুমা কথা বলছে।

খেমে গেছে কোন।

রুমা, কোন খেমে গেছে।

হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

কিন্তু আমি ভাবছি টেলিফোনের নম্বরই যেখানে পাই নি, সেখানে এখানে কে কোন করবে। অবিশ্বাস্য না?

অবিশ্বাস্য বলেই না আমার ভয়।

রুমা, আমার মনে হয় এক্সচেঞ্জের লোকটা এই কাণ্ডটি করছে।

কিন্তু নম্বর?

ওরা জানে নিশ্চয়ই। ডায়ালটোন দেবার সময় জানাবে।

রুমার বুদ্ধিটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শুনেছি এক্সচেঞ্জের অনেকে রাতে এ-বাড়ি সে-বাড়ি কোন করে এক ধরনের আনন্দ পায়। নির্মল আনন্দ যেমন, বিকৃত আনন্দও তেমনি। রাতে কোন করে ওরা আশা করে কোনটি যেন কোনো মেয়ে ধরে। এরপরে বাজলে রুমা যেন ধরে মনে হতেই বলি, রুমা, এরপর বাজলে তুমি ধরবে।

কেন?

আমার মনে হয় এক্সচেঞ্জের কারো বদমাইশি।

রেপে কাঁকুনি দিয়ে ওঠে রুমা।

আমি ধরি আর একটা খারাপ কথা শুনি। আমি ধরবো না।

কুমা যে ধরবে না আমি নিশ্চিত । একবার বেঁকে বসলে ওকে সোজা করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব । নিজের জিদ ও ঠিকই বজায় রাখে । শুধু গৃহশান্তি নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমিই আত্মসমর্পণ করি ।

আসলে আমি হেরে যাই । যেমন এখন গেলাম । এই অজানা ফোন ধরার মধ্যে জয়-পরাজয় কিছু নেই, কিন্তু কুমা যে আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলো এতেই কিছু অপমান, কিছু কষ্ট, কিছু উপেক্ষা এবং কিছু অবহেলা আমাকে কুমার কাছ থেকে বেশ দূরে সরিয়ে দেয় । আমার আর বিছানায় যেতে ইচ্ছে করে না ।

প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাতে যেতেই অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে কুমা,
এখন সিগারেট ধরাচ্ছে যে?

ধরলাম!

তাও তুমি ধরালে?

গাল ভরে ধোঁয়া ছাড়লে কুমা তেমনি অবাক মেনেই বলে,

আমি বারণ করার পরও শুনলে না?

বারান্দার দিকে পা বাড়াই আমি ।

কোথায় যাচ্ছে?

দরজার ছিটকিনিতে হাত লাগালে কুমা ছুটে আমার মুখোমুখি চলে আসে ।

চোখে চোখ রেখে বলে,

মাঝরাতে এ কী নাটক শুরু করলে?

ছিটকিনিটা খুলে ফেলি, দরজার একটা পাল্লাও খোলা হয়ে যায় । এবারে থমকে যায় কুমা । কুমা আমার চরিত্রের অন্তত এটুকু জানে, নীরবে নিঃশব্দে কোনো কাজ করে গেলে তা আমি করে ছাড়ি । সেজন্যেই হয়তো আর বাধা দেয় না, হয়তো এটুকু বুঝতে পেরেছে মাঝরাতে লুপ্তি আর গেল্লিতে আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে যাবো না । ওই বারান্দা পর্যন্তই ।

ওই বারান্দা পর্যন্তই । বারান্দায় দুটি বেতের চেয়ার, কুমা আর আমি বিকেলে ওখানে বসে চা খাই, অনেকদিন রাতের অর্ধেকটা পর্যন্ত আমরা ওখানে বসে কাটিয়ে দিয়েছি । আজ বসছি আমি একাই । জানি কুমা বসবে না । ওকে উপেক্ষা করে চলে এলাম এই অপমানের পর বসা আরও বেশি অপমান তা ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও আমি বুঝতে পারি ।

বারান্দায় বসে সিগারেটে আরো কয়েকটা টান দেবার পর বৃষ্টি, কুমার ওপর এখন আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই, ক্ষোভের জায়গার কোনের প্রশ্নটা লাফিয়ে সামনে চলে এসেছে । কে করবে কোন? এতো রাতে নব্বয়হীন ডায়ালটোনহীন কোনে কে কথা বলতে চায়? ফোন যে বেজেছে তা কি সত্যিই বেজেছে?

সত্যিই বেজেছে এটা সত্যি । ঘরে দুই দেয়ালে দুটো একশো-একশো দুশো ওয়াটের বাতি জ্বলছে, আমি ঘাড় না ঘুরিয়েও দেখতে পাচ্ছি শুধু পেটিকোট আর

রাউজে ক্রমা পাখরের মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। যা ঘটলো তা মিথ্যে নয়, ফোনের সব কিছু অবাস্তব সত্ত্বেও বাস্তবতাকে কোনোক্রমেই উড়িয়ে দিতে পারি নে বলে জানি, আমি ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ক্রমা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠিক খাটের কোণায় চূপ করে বসে থাকবে।

ক্রমা তাই থাকে। রাগ হলে, অভিমান হলে ঘরে আরো অনেক জায়গা থাকতে ক্রমা খাটের কোণাতেই আশ্রয় নেয়। নিচ্ছে নিক। আমার যতোক্ষণ খুশি বসে থাকবো। সহসা মনে আসে রাত মধ্যরাত হলেও আসলে রাত কতো?

ক্রমা, রাত কতো?

দুটো ছত্রিশ।

ফোনটা কতোক্ষণ আগে বেজেছিলো?

জবাব দেয় না ক্রমা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, জবাব আসে না। বুঝি ক্রমা রাগ-অভিমান ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত জবাব দেবে না। না দিক। আমার নিজেরই একটা অনুমান থাকা উচিত। ফোন বাজার সময়টা তা প্রায় পনেরো মিনিট আগে হবে। একটা মানুষের জীবনে দিবারাত্রির কোন প্রহরে কোন সংক্ষিপ্ত সময়টা দীর্ঘ বা কোন দীর্ঘতম সময়টি হৃদয়তম মনে হয় উদাহরণ দিয়ে বলতে পারবো না, আমার এখন শুধু মনে হয় আমি যেন এই রকম একটি মুহূর্তের জন্যে জন্মাবধি অপেক্ষা করছিলাম। সহসা আমার চোখ ফেটে কান্না আসে। কেন আসে জানি নে, সত্যি আমি জানি নে, কিন্তু আসে, আমি সামনে না তাকিয়ে তুই হাতে চোখ ঢেকে ফেললে দেখতে পাই দিগন্তে রক্তাক্ত আলো রেখা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময় আবার ফোন।

ভীত গলায় ডাকে ক্রমা,

জামিল, জামিল! আবার, আবার!

হ্যাঁ ওনছি। আসছি।

ঘরে ঢুকে দেখলাম ক্রমা ঠিক খাটের কোণাতেই বসে, তবে এখন বসে খাটের ঠ্যাঙ ধরে, এতো জোরে চেপে ধরে আছে যেন কোনোর শব্দ তাকে সেই মায়াবী স্বীপের কুহকিনী দেবী আয় আয় আয় বলে ডাকছে।

ক্রমা, ক্রমা!

ক্রমা ফোনের দিকে আঙুল তুলে বিড়বিড় করে বলে,

আবার, আবার!

এবার আমি ধরবোই।

না জামিল, না। ধরো না।

আচ্ছা তুমি এমন করছো কেন বলো তো?

মনে হয় এটা কোনো স্বাভাবিক ফোন নয়। ক্রমার এ কথা বলার কারণ যা-ই থাক, আমি ধরবো। যদি কোনো দুর্বৃত্ত অথবা খুনি করেই থাকে তাহলে সে টেলিফোনে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাকে সামনে আসতে হবে।

আর কোনো হুমকি দিলে আমার তো সাবধান হওয়ার সুযোগ আছে। সবচেয়ে বড় কথা আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করি নি। আমার কোনো শত্রু আছে বলে মনে পড়ে না আমার। ঋজু পায়ে ফোনের কাছে যেতে যেতেই মনে হয় কে যেন আমার পায়ে কয়েক মণ ওজনের পাথর বেঁধে দিয়েছে, যে হাত দিয়ে রিসিভার তুলবো সেই হাতেও ভারি লোহার শেকল। আমি থেমে যাই।

থামলে কেন?

বুঝতে পারছি না ধরবো কিনা।

না, ধরো না। না, ধরো। না ধরলে হয়তো আবার করবে।

বারতিনেক পর হয়তো আর করবে না। ভাববে বাসায় কেউ নেই।

কুমার কথাটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও বলি,

এটাও হয়তো ভাববে কোন নষ্ট।

ঠিক তক্ষুনি কোন থেমে যায়।

থেকে গেছে, জামিল, থেমে গেছে।

বাঁচা গেলো।

আমার এই দুই শব্দের উচ্চারণটি পুরো মুখ থেকে বেরোয় নি, আবার তীক্ষ্ণ শব্দে কোন। আগের দুটোর শব্দের চাইতে এটাকে আমার ত্রুষ্কতর মনে হয়। এবং সেই শব্দ আমাকে চুষকের মতো রিসিভারে টেনে নিয়ে যায়। আমি 'হ্যালো' বলার আগেই ফোনের অপর দিক বলে,

মেজো ভাই, আমি, আমি জাকর।

কোন জাকর?

আমি আপনার ছোট ভাই জাকর।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জাকর নামে আমার একটি ছোট ভাই আছে বটে, কিন্তু সে কোথায়, পৃথিবীর কোন প্রান্তে তার অবস্থান আমরা কিছুই জানিনে, জাকর নামে আমার পরেই যে ভাই সে বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি নে, তার খোঁজ আর কোনোদিন পাবো কিনা তাও জানি নে। সে যদি বেঁচেই থাকবে তাহলে প্রায় আঠারো বছর সে কোথায় ছিলো, আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে নি কেন?

তুমি জাকর?

মনে হলো থমকে গেল জাকর।

মেজো ভাই, আপনি আমাকে তুমি বললেন?

বললাম। যে জাকরের সঙ্গে কথা বলছি সে যে আমাদের জাকর তা বুঝবো বি করে?

বড় একটা শ্বাস পড়ে জাকরের। শ্বাস শেষে বিষণ্ণ গলায় বলে,

খুব স্বাভাবিক মেজো ভাই। একটি-দুটি দিন নয়, দেড় দেড়টি যুগ পার হয়ে গেছে, বোল বছর বয়সে চলে এসেছিলাম, এখন আমি চৌত্রিশ।

সন্দেহ হওয়ারই কথা ।

মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় আমার, ষোল বছর বয়সে জাফর একদিন নেই হয়ে গেল । প্রথম প্রথম মনে হতো আশপাশের কোনো জেলায় আমাদের আত্মীয় বাড়ি গেছে, খোঁজ নেয়া হলো নেই, মনে হতো দেশের ভেতরেই দর্শনীয় স্থান দেখে বেড়াচ্ছে, মনে হতো বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়াচ্ছে । কিন্তু আমাদের কোনো মনে হওয়াই আর সত্যি হতো না, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুরা, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন সব বৃথা প্রমাণ করে আমাদের জানিয়ে জানিয়ে গেল, জাফর আর ফিরবে না । মৃত্যু মানতে পারি, কিন্তু ফিরবে যে না এই সত্য স্থায়ী হতে পাঁচ-ছয় বছরের বেশি লাগে না । আর এতো আঠারোটি বছর ।

জাফর, তুমি কিছু মনে করো না । আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ যাচ্ছে না ।

খুব স্বাভাবিক মেজো ভাই, খুব স্বাভাবিক । আমি হলেও তাই ভাবতাম ।

কুমার গলা শুনি,

জামিল, জামিল ।

মেজো ভাই, ভাবি ডাকছেন ।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে কুমার দিকে তাকালে কুমা হতভম্ব গলায় বলে, তোমার, তোমার ছোটভাই জাফরই তো?

মেজো ভাই, ফোনটা ভাবিকে দেন ।

কুমা, জাফর তোমার সঙ্গে কথা বলবে ।

আমার মনে হয় বিছানা থেকে ফোন পর্যন্ত আসতে কুমার যুগের পর যুগ কেটে গেল, মনে হয় কুমা একটি মৃত শরীর টেনে নিয়ে আসছে । কাঁপা হাতে ফোন ধরে কুমা,

হ্যালো ।

আমি জাফরের গলা শুনেছি, শুধু কুমার শুনি ভালো, তুমি কেমন, দেশে ফেরো না কেন, কবে আসবে সংলাপে বুঝতে পারি খুবই সাধারণ মামুলি কথা, বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না কুমার তখনো ভয় বা বিষয় কোনোটাই কাটে নি । এক সময় শুনি, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো ।

কুমা আমার হাতে ফোন দিয়ে আবার আগের মতো ফিরে যায় দেখে আমার ওই কথাই মনে হয়, এই জাফর যে সেই জাফর কুমা তা বিশ্বাস করতে পারছে না । আমারই যেখানে খটকা কাটেনি সেখানে কুমা তো পরের বাড়ির মেয়ে, আমাদের বিয়ের পর কুমা শুধু জাফরের ওই পনরো-ষোল বছরের ছবি দেখেছে আর গল্পই শুনেছে । আমি ফোন ধরতেই বলে জাফর,

আমি এই দিয়ে তিনবার ফোন করলাম ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে দু বার বেজেছে ।

ধরেন নি কেন?

বুঝতে পারছিলাম না, এতো রাতে কে ফোন করবে?
জানি, রাতে ফোন ধরতেও আপনাদের এখন ভয় লাগে।

তুই জানিস, জানিস কিভাবে?
আনন্দে চিৎকার করে ওঠে জাফর,
আমার কী যে খুশি লাগছে!

কেন?

এই যে তুই বললেন, তাই।

তুই যখন তোর ভাবির সঙ্গে কথা বলছিলি তখন আমি অনেক কিছু মিলিয়ে দেখছিলাম। তোর কণ্ঠস্বর একটু মোটা হলেও বোঝা যায় এটা তোরই গলা, তুই যে সময়ের হিসেব দিলি তাও ঠিক, আমি যে মেজো ভাই তাতেও কোনো ভুল নেই, জাফররে, জাফর, তুই কোথায় চলে গেলি, কেন গেলি?

আমার আকুল প্রশ্নে বিচলিত হয় না জাফর। জবাব দেয়,

মেজো ভাই, আমি যেখানেই যাই দুনিয়ার বাইরে তো যাই নি, আর চলে গেলাম কোথায়, আপনাদের মধ্যেই তো আছি!

কান্না পায় আমার জাফরের কথা শুনে। ও কি করে বলে চলে যায় নি, কি করে জানায় ও আমাদের মধ্যেই আছে, তাই যদি হবে তাহলে বাবা-মা ওর শোকে হৃবির হয়ে গেল, মরেই গেল, শেষ দেখাও দেখতে পেলো না। আমি কোনোর রিসিটারকেই ওর হাত মেনে জড়িয়ে ধরে বলি,

ফিরে আয়, ভাই আমার ফিরে আয়।

হাসলো জাফর।

আসবো।

কবে?

দেখি।

দেখার কি আছে? এতোদিন পর যখন জানালি যে বেঁচে আছিস তখন চলে আয়।

বললাম তো আসবো।

তোর ভাইবোন আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে ইচ্ছে হয় না?

হবে না কেন? হলে মনে মনে দেখে নিই।

হঠাৎ মনে হয় জাফর কথা বলছে কোথেকে?

তুই কোথেকে কথা বলছিস?

পৃথিবীরই একটা দেশ থেকে।

নাম কি সে দেশের?

নাম শুনে আর কি করবেন? আজ যদি থাকি নিউজিল্যান্ডের মাওরীদের মধ্যে, কাল থাকবো আইসল্যান্ডের এফিমোদের মধ্যে। পরও ভারতের নাগাল্যান্ডের সল্লাসীদের সঙ্গে, তরত হরতো রেড ইন্ডিয়ানদের ওখানে।

সহসা আমার খুব রাগ হয়। রাগটা প্রকাশ না করলেও প্রকাশ পেয়ে যায়। তাহলে আর এতোদিন পর ঢং করে জানানোর কি দরকার ছিলো? জানতাম তুই হারিয়ে গেছিস, একবারেই হারিয়ে গেছিস।

মেজো ভাই!

মেজো ভাই বলে খেমে যায় জাফর। বুঝতে পারি কান্নার একটা দলা ওর গলায় আটকে গেছে। কান্না আমারও পায়।

বল।

মেজো ভাই, গতকালই আমাজনের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার সেই ছেলেবেলার পদ্মার কথা মনে হয়, পদ্মার সাথে সাথে আমার চোখের সামনে যা কিছু দেখা যায় সবই বাংলাদেশ মনে হয়, মনে হতেই মনটা হু হু করে উঠলো, তখনই ভাবি, আপনার সঙ্গে কথা বলবো।

সহসা মনে আসে আমার টেলিফোনের নম্বর নেই, ডায়ালটোন নেই, ফোন থেকেও নেই, কিন্তু সেই ফোনে জাফর কথা বলছে কি করে?

জাফর, জাফররে, তুই কি ফোন নম্বর জানিস?

না। তার দরকার পড়ে না।

না জানলে করলি কি করে?

আমার এ-কথার জবাব দেয় না জাফর, বরং হাসে। ওর হাসি শুনে বিস্ময় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে জাফর বলে,

নিশ্চয়ই বলবেন ডায়ালটোনও ছিলো না?

ঠিক, ঠিক তাই।

তারপরেও করলি কিভাবে?

মেজো ভাই, অস্বাভাবিক বলেই করলাম।

কী অস্বাভাবিক কথা বলছিস?

ভাই, এবারকার মতো এমন অস্বাভাবিক আর কখনও বোধ করি নি। থাকতে পারলাম না, তাই করলাম।

ওধু একবার

এই যে তনুন! ডাকটি আসে অন্ধকার থেকে। রাত্তায় যথেষ্ট আলো, কিন্তু ফুটপাথের গা ঘেঁষে যে ঘন দেবদারু গাছ, সেই গাছেরই ছায়ার ছোট্ট পান সিলারেট চায়ের দোকান, অন্ধকার সেখানে জমাট। দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চ দুটি, সেখানে দিনের বেলায় রাজ্যের রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, দিনমজুর এবং অতি সাধারণ লোকে চা-টা খায়, গল্পসল্প করে। বসার কারণটিও ওই গাছের ছায়া। অল্প বৃষ্টিতেও লোকে সেখানে আশ্রয় নেয়। গাছের পাতা বেয়ে দুই চার কোঁটা কাপড়ে পড়লে এমন কিইবা ভেজে।

রাতে ওই দুই বেঞ্চ দুজনকে ঘুমোতেও দেখা যায়। বোকাই যার, এরা ককির-টকির, বিনি পয়সায় পা টান করার মতো একটা জায়গা পেয়ে সেটার সম্ভবহার করতে ছাড়ে না। চায়ের দোকানদারের সঙ্গে এদের কোনো রকম আছে কিনা লোকটি জানে না। জানার প্রয়োজনই বা কি। ফুটপাথে, বাস স্ট্যাণ্ডে, পার্কে এরকম বহু মানুষই রাতে আশ্রয় নেয়, ঘুমায়। লোকটি মাঝে মাঝে ভেবেছে এদের নিয়ে একটি লেখা লিখবে। ভাবা পর্যন্তই।

অনেকদিন ধরেই রাতে লোকটি এই দোকানের সামনে দিবে যাতায়াত করছে, বেঞ্চের লোক দুটোর ঘুমের নিঃশ্বাস বা চড়চাপড় ঘেঁরে মশা মাকার শব্দ ছড়া কারো কোনো কথা শোনে নি। এই প্রথম। এই প্রথম দোকানের ঠিক সামনের বেঞ্চ থেকে ধপ করে একটি লোক উঠে বসে ডাকে,

এই যে, তনুন!

লোকটি থমকে যাওয়ার আগেই রাত্তায় তার পা আটকে যার। তার মনে হয় ডাকের শব্দই তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। এভাবে তাকে কেউ কোনোদিন ডাকে নি। ভূত ঘেঁড়ের ভয় তার কোনোদিনই নেই। রাত-বিরেতে বিশেষ করে গভীর রাতে চলাচল করতে গেলে চোর-ডাকাত যাতনাদের মুখোমুখি হওয়াটা অসম্ভব নয় জেনেও সে নির্ভরেই চলে, কারণ সে জানে তার কাছে টাকা পরসা সামান্যই। থাকার মধ্যে বুক পকেটে গোটা দুয়েক কলম। তাও বলপেন। তিন টাকা তিন টাকা ছয় টাকা দার। সে বুকে পেছে। তার পকেটের বোজ রাতের শিকারির জানা হয়ে

গেছে বলে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কাজ তারা করবে না। এই বিশ্বাসটা খুবই পাকা বলে সে প্রায়ই গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে যায়। গান গাওয়ার কারণ হিসেবে সে আবিষ্কার করেছে গায়কটি ভিন্ন মানুষ, অতএব তারা দুজন।

এই যে মজিদ সাহেব।

বেঙ্কের লোকটি তার নাম জানে? কোনো ফকির-ফাকরার তার নাম তো জানার কথা নয়। মজিদ রাস্তার সঙ্গে আরো আটকে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে সে যে লোকটির ডাকের জবাব দিয়ে কিছু একটা বলবে সে শক্তিও গলায় অবশিষ্ট নেই। ঘাড় না ঘুরিয়েই সে বুঝতে পারে লোকটি বেঙ্ক থেকে নামলো, বেঙ্ক শুয়ে থাকার জন্য শরীর যে দুমড়েমুচড়ে ছিলো তা আড়মোড়া ভেঙে ছাড়ালো এবং স্যাঙেলে চটাশ চটাশ শব্দ তুলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে গায়ের কাছে এসে সে চাপা গলায় বলে,

ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না।

এতো আপনজনের মতো সে কথাটি বলে যে মজিদের মনে হয় লোকটি খারাপ ধরনের নয়। একটু সাহস জাগে তার মনে। মনে হয় রাস্তা তার পায়ের বেড়ি একটু আলগা করে দিয়েছে, গলার যে শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল তা একটু ফিরে এসেছে। সেই গলা নিয়েই ঘাড় সামান্য ঘুড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,

কে আপনি?

আমি বাদল।

বাদল! কোন্ বাদল?

বাদল এ প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে মজিদের হাতটা ধরে স্পষ্ট আলোয় নিয়ে এসে মুখটা মজিদের সামনে তুলে ধরে বলে,

এবার দেখুন তো কোন্ বাদল?

ও! তুমি?

চমৎকার! চিনেছেন তাহলে?

এতো রাতে এই ইয়ার্কির মানে কি?

জিবে কামড় খায় বাদল।

হি, হি। আপনার সঙ্গে আমি ইয়ার্কি মারবো এতো বড়ো বেয়াদব আমি এখনও হই নি।

মজিদের বোধ হয় তার পায়ে আর কোনো বেড়িই নেই, গলার শক্তিটাও সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে।

ইয়ার্কি নয় তো কি?

জ্ঞী না, ইয়ার্কিও নয়, বেয়াদবিও নয়। আমার চাহিদা খুব সামান্য। আপনার পকেট সেটা দেয়া মোটেই কঠিন নয়। শুধু পকেটে হাত ঢোকাবেন ও বের করবেন।

মজিদের অনুমান হয় বাদল সন্ধ্যাসীর খাতায় নাম লিখিয়েছে, গভীর রাতে শিকারের আশায় এইখানে গুঁৎ পেতে ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার আরো অনুমান হয়

সঙ্গাসী হলে তার কাছে অস্ত্র থাকাও বিচিত্র নয়। এবারে তার ভয় ধরে। সে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে,

কি চাও তুমি?

জবাব পাবার আগেই সে দেখে বাদল তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। এতোক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়েই কথা হচ্ছিলো বলে মজিদ বাদলের প্যান্ট-শার্টের কোনো জায়গা উঁচু আছে কিনা দেখে নি। বাদল এতো দ্রুত প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকায় সে মজিদ নিশ্চিত হয়ে যায় বাদল আসলে অস্ত্রটিকে আড়াল করার জন্যই হাতটা অতো দ্রুত ঢোকালো। তখন তার গলায় আর কোনো জলীয় পদার্থই অবশিষ্ট নেই, গলা দিয়ে কেবল অম্পট আঁ আঁ ধ্বনি বেরোতে থাকে। মজিদের হঠাৎ অমন অবস্থা দেখে বাদল প্রথমে হতভম্ব হয়, পরে নিজেকে সামলে নিয়ে খানিক বিটখিট করে হাসে। হাসি থামিয়ে বলে,

আপনাকে পকেটে হাত ঢোকাতে বলেছি, না, না আপনার মানিব্যাগ চাচ্ছিলে।
আমাকে অতোটা ছাঁচোর ভাববেন না।

মজিদ বোঝে এবারে তার গলাটা একটু ভিজেছে। জিজ্ঞেস করে,

তাহলে কি চাও?

নির্বিকার জবাব দেয় বাদল,

চাবি।

চাবি?

বেশ শব্দ করেই হেসে ওঠে বাদল। সে হাসিতে কোনো ভার নেই, ক্রোধ শ্বেষ কিছুই নেই, রাতের গভীরতা বৈদ্যুতিক আলো ও আকাশের তারাদের জ্বলা-নেভা হাসিকে কোন্ মহিমা দান করে তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। তবে তার বেশ হাসি লাগে। এতো হাসি যে, পাখির পালকের মতো উপমাটা মনে আসে।

রাস্তার জোরালো আলোয় বাদল মজিদের মুখের প্রতিটি শিরা-উপশিরা দেখতে পায়। মানুষটি এখন মরারও অধম, একেবারে কেঁচো। এটাই সে দেখতে চেয়েছিলো। অনেকদিন থেকেই সে চিন্তা করেছিলো কোন্ উপায়ে তাকে ধরলে তার চূড়ান্ত অসহায় অবস্থাটা দেখা যাবে। দিনের বেলায় তো রাস্তায় এভাবে ধরার প্রশ্নই আসে না। চেঁচিয়ে লোক ছড়ো করবে, না করলেও কিছু কৌতূহলী লোক থাকেই যারা অকারণে নাক গলিয়ে বললে, কি ভাই, কি হয়েছে? এই লোকগুলিকে সত্যি কথা বলে কোনোদিনই বোঝানো যাবে না, তারা সত্যের আড়ালে আসলে কোন্ মিথ্যেটা আছে সেটা খুঁজতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাদল জানে, ব্যস্ত থাকলেও মূল লক্ষ্যকে তারা চোখের আড়াল করবে না আর সে চেঁচা মানেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়া। আরেকটা উপায় বাদলের মাথায় এসেছিলো। সে সরাসরি মজিদের বাসায় চলে যাবে। বাসায় ঢুকে পড়লে মজিদ তার বৌ আফিয়া, মেজো মেয়ে রুমা এবং মাঝারি পিচি মিলে সবমোট ছয়টি মানুষ চিন্তাচিন্তি করতে পারে, নাও করতে

পারে। তবে মজিদ ও আফিয়া রাগে গনগনে হয়ে যাবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর বড় মেয়ে সোমা? সে আগুন হবে না ঠান্ডা বরফ হয়ে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মেয়েদের এই এক চরিত্র। বোঝা বড় দায়। অনেকবার সোমা রাগ দেখিয়ে, ফেপিয়ে বাদলকে ক্রিঙ করে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে মানুষ হয় মাথার চুল ছেঁড়ে না হয় দেয়ালে মাথা ঠোকে, এবং অবস্থা সমস্ত যুক্তিতর্কের বাইরে চলে গেলে আত্মহত্যাও করে বসতে পারে। না বাদল আত্মহত্যার অবস্থা পর্যন্ত যায় নি, তবে আর দুটো ঘটেছে কখনও-কখনও। আর বিষয়কর ব্যাপার হলো, সোমা তখন অনাবিল হাসি দিয়ে বলে,

রাগলে তোমাকে কেমন দেখা যায়, সেটাই দেখছিলাম।

এই কথা শুনে বাদল তখন আরো রাগে, সোমা তখন আরো সহজ হয়ে যে স্নিগ্ধ হাসিটি উপহার দেয় তাতেই বাদলের মনে হয় এতো আনন্দ, এতো সুখ, এতো প্রেম, সোমা তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে? মজিদের বাড়িতে ঢুকে বাদল সোমাকে শুধু এই কথাটাই জিজ্ঞেস করবে আমাকে কষ্ট দেবার যে সমস্ত উপকরণ তুমি প্রতিদিন সাজিয়ে সাজিয়ে আকাশের সমান উঁচু করে মহামহিম সম্রাট বানিয়েছিলে, তার কি কিছুই অবশিষ্ট নেই? কোথাকার কে একজন কোথা থেকে উড়ে এসে কেবল বললো চলো, আর তাই তুমি মেনে নিলে, একটাবারও কি মনে হয় নি একটা মানুষ দিনের পর দিন এক অনুপম প্রতিমা গড়ে গেছে? বেশি নয়। শুধু এইরকম দুই-একটি প্রশ্নই। দেখি সোমা কি জবাব দেয়। দিনের বেলায় বাসায় ঢুকে সাফসফ জবাব পাওয়া যাবে না বুঝেই বাদল রাতের একটি মুহূর্তের অপেক্ষায় এই খোলা আকাশের নিচে বাঁশের বেঞ্চে শুয়ে মশার কামড় খেয়েছে। বেঞ্চেও শোয়ার কষ্টে বারবার এপাশ ওপাশ করেছে। তবে চিং হয়ে যতোকণ থাকা যায়, ততোকণ একটু আরাম লাগে। এইরকম চিং অবস্থায়ই ঘন্টা আড়াই আগে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিলো। তখন রাত একটা, হ্যাঁ একটাই হবে। পাড়া সুমসাম, রাস্তা দিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ একটা গাড়ি যায়। রিকশাও গিয়েছে দুই একটা, মানুষ চলাচলও তেমন করে নি। এই অবস্থায় ঝপ করে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেলে বাদল হতবাক হয়ে দেখে রাতের আকাশ তার নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, দেখতে পায় গাঢ় অন্ধকারে আকাশের তারারা কতো হাসিখুশি হয়ে উঠে তাকে বলছে বাদল কেমন আছো, বাদল এই রাতের আনন্দের অংশী তুমি কেবল একাই, যার কথা ভাবছো সে এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। গিয়ে দেখো সে স্বপ্নে পরম সুখে আকাশপথে ভ্রমণ করছে। দুই তালুতে মাথা স্থাপন করে বাদল অন্ধকারের ঝকঝকে তারাদের দেখতে দেখতে সহসা সব তারা আবার আলোয় ঢেকে যায়, আকাশ উঁচু বহু উঁচুতে উঠে যায়, রাস্তা, আশেপাশের ঘরবাড়ি আবার সব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ঘড়ি দেখে বাদল রাত দুটো বেজে তিন মিনিট। তাহলে একঘণ্টারও বেশি সে তারাদের সঙ্গে সহবাস করেছে। তখন তার মনে হয়েছিলো ভেসে যাক সোমার আকাশ ভ্রমণ, বিদেশে সংসার, হয় আসুক না হয় না আসুক

সোমার বাবা মজিদ, গোদ্রায় যাক, শুধু থাক এই অন্ধকার ঐশ্বর্যময় রাত । সে তখন চোখ বুঁজে মড়ার মতো পড়ে থাকে খানিকক্ষণ ।

ঠিক এই সময় শোনে কে যেন পরিষ্কার গলায় নিচু স্বরে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে । চমকে চোখ খুলে ঘড়িটা চোখের সামনে ধরতেই দেখলো সাড়ে তিনটে, এই সময়েই সোমার বাবা রাতের ডিউটিশেষে বাসায় ফেরে । হ্যাঁ সোমার বাবাই । অধিকাংশ রাত সে হেঁটেই ফেরে । তার সংবাদপত্র অফিস বাসা থেকে আধ মাইলেরও কম । দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে সে চাপা গলায় ডাকে,

এই যে শুনুন ।

বাদল এবারে তার প্রার্থনা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে ।

হ্যাঁ, চাবি । যে চাবি দিয়ে আপনি আপনার বাসার সদর দরজা খোলেন ।

তোতলাতে থাকে মজিদ ।

তুমি এখন আমার বাসার চাবি নিয়ে কি করবে?

উদ্দেশ্য পরিষ্কার । আপনার বাসায় ঢুকবো, আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলবো ।

কি আবোল-তাবোল বকছো?

অবশ্যই আবোল-তাবোল শোনাচ্ছে । কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনাকে খালুজান বলে ডেকেছি । ডাকতে হয় বলেই ডেকেছি । চাচা বা মামাও বলা যেতো । কথা একই । সম্পর্কটা যখন সোমার সঙ্গে তখন বিয়ের আগে একমাত্র বাপ ছাড়া যুরুবিদের ডাকার জন্য একটা কিছু বলে ডাকলেই হলো । তা সম্পর্ক যখন চুকেবুকেই গেছে, তখন আত্মীয়ের ডাকে আর ডেকে কি লাভ? সে জন্যই মজিদ সাহেব বলেছিলাম । এবার আবারও বলছি, মজিদ সাহেব, চাবিটা দিন ।

শক্ত হয়ে দাঁড়ায় মজিদ । ইচ্ছে হয় বাদলের গালে টেনে একটা চড় মারে । কিন্তু সংযত করে নিজেকে, কারণ আগের সম্পর্ক নেই বলে সেও চড়ের পরিবর্তে ঘৃষিও চালাতে পারে । বয়সে ছোট হলেও বাদলের যুবককালের শক্তি যে বেশি তা মজিদের উপলব্ধিতে আসতে দেরি হয় না । সে তখন ভিন্ন পথ ধরে । নরম গলায় বলে,

দেখো বাবা, আমি তোমার বাবার বয়সী একজন মানুষ । খবরের কাগজে রাতের ডিউটিতে শরীরের কিছু থাকে না । এভাবে পথে আমাকে আটকে রাখা কি তোমার উচিত হচ্ছে?

নির্বিকার জবাব দেয় বাদল,

হ্যাঁ উচিত হচ্ছে ।

বাদল, তুমি যা বলছো, তা কি উচিত বলছো?

হ্যাঁ উচিত বলছি ।

আমার মান সম্মানের দিকে একবারও তাকাবে না?

ওটা আপনার বিষয়, আমার নয় ।

মজিদ হাত জড়িয়ে ধরতে যায় বাদলের ।

বাদল, বিয়ে, হ্যাঁ, সব আদ্যার ইচ্ছে। আমার সোমার বিয়ে যেখানে কপালে
লেখা আছে সেখানেই তো হবে।

হ্যাঁ সেখানেই হবে। আপনি শুধু চাষিটা দিন।

অসহায়ের মতো চারপাশ দেখতে থাকে মজিদ। কাতর গলায় বলে, এতো রাতে
তুমি আমার বাড়িতে ঢুকলে আমি পাড়ায় মুখ দেখাবো কি করে?

যেভাবে এখন দেখাচ্ছেন সেভাবেই দেখাবেন।

বাদল, আমার মেয়ের বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে।

ভাঙবে না। আপনি চাষিটা দিন।

মজিদ শশিই দেখছে বাদলের দৃঢ়তার কোনো চিহ্ন ধরে নি। সে যতোই তাকে
ভিন্ন খাতে নিয়ে যেতে চাইছে, ততোই সে শক্ত হয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। আবার
সে চেষ্টা করে,

পাড়ার মধ্যে, দশজনের সামনে আমি বেইজ্যতি হই, তুমি কি তাই চাও বাদল?

ওটা ভেবে দেখি নি। আপনি চাষিটা দিন।

সহসা রাতের গভীরতা খান খান করে চাঁচিয়ে ওঠে মজিদ, না।

শান্ত গলায় বলে বাদল,

বৃথা চিন্তার।

আমি চাঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করবো।

মজিদ সাহেব, কেউ আসবে না।

তুমি দেখতে চাও?

দেখলে আপনার লজ্জাই মানুষ দেখবে। আর আসল কথা কি জানেন? ও হ্যাঁ,
আপনি তো সাংবাদিক মানুষ। আমার চাইতে আপনিই ভালো জানেন। এখন এমনই
সবর, কেউ কারো সাহায্যে আসে না। সে যাকগে, চাষিটা দিন।

দৃঢ় গলায় জবাব দেয় মজিদ,

দেবো না।

চাষি যে আপনি আপনাপনি সেবেন না সে আমি জানি। আর সেজন্য ব্যবস্থা
আমার হাতেই আছে।

বাদলের তখনো প্যাণ্টের পকেটে হাত। এতোক্ষণ সেদিকে খেয়াল ছিলো না
মজিদের। খেয়াল হতেই দেখলো বাদল পকেটে হাত নিয়ে খেলা করছে।

তুমি কি আমাকে মারবে?

না, সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই।

তোমার পকেটে কি?

সহজভাবে চাষি না দিলে চাষি সেলার শুধু।

খরখরে গলায় জানতে চায় মজিদ,

তুমি কি গিল্ডস বের করবে?

হো হো করে হেসে ওঠে বাদল। বলে, মাথা খারাপ? একে সন্তাস দমন আইন, তারওপর বেআইনি অস্ত্র। ম্যাডাম দুই দফা ফাঁসি দেবে। দিন, চাবিটা দিন।

তুমি আমাকে মেরেই ফেলো আর যাই করো, চাবি তোমাকে দেবো না।

দেখুন মজিদ সাহেব, আপনি কিন্তু একটা ভালো ঠোঁড়ি মিস করছেন। আমাদের এই ঘটনাটা আপনি খুব ভালো করে লিখতে পারতেন। ধুস্তোরি ছাই, বকবক করে সময় নষ্ট করছি। চাবিটা বার করুন।

বাদলের গলায় দৃঢ়তা এমনই যে মজিদ পাথর হয়ে যায়। সে কেবল বুঝতে পারে বাদল তার নাকের কাছে একটা চমৎকার সুগন্ধি ধরলো। সকাল হলে সে আরো বুঝতে পারে, সে এতোকণ বাদলের জায়গায় ওই বাঁশের বেঞ্চে শুয়ে ছিলো। সাংবাদিক হিসেবে টেবিলে শুয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা থাকলেও বাঁশের বেঞ্চে শোয়ার অভিজ্ঞতা নেই। তার সারা শরীরে ব্যথা। মাঝে সময় তিন ঘণ্টা পার।

বাদল এতো নিশ্চিন্ত ও সহজভাবে মজিদের বাড়ির সদর দরজা খোলে যেন নিজের বাড়িতেই ঢুকছে। সব ঘর তার চেনা। এ বাড়ির কোন জায়গায় বাজারের খলে, চালের ড্রাম, কাপড় রাখার আলনা, এমনকি আধুলি ও সিকি রাখার মাটির ব্যাংকটি সব সে বলে দিতে পারে। চোখ বন্ধ করে সব জায়গায় চলে যেতে পারে। এ বাড়ির প্রতিটি কাজের সঙ্গে সে পরিচিত। রুমা কলেজে যাবার আগে কতোকণ ধরে আয়নার সামনে ক্রীম পাউডার মাখে, নোমা ইউনিভার্সিটি যাবার সময় চুল বাঁধতে কতো সময় নেয়, সোমার মা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ব্যথার বেশি কষ্ট পায় বলে বেলা কয়টায় বিছানা ছাড়ে, সব সে বাড়ির ছেলের মতোই জানে। সেভাবেই সে জানে মজিদের রাতে ডিউটি থাকলে সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে বেরোয়, শেষ রাতে বাসায় ফিরে চৌচিয়ে ঘরের লোকজনকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নিঃশব্দেই বিছানায় চলে যায়। এ তার অভ্যস্ত জীবন, বাড়িতেও সবাই এতে অভ্যস্ত। রাতে ডিউটি থাকলে খাবার টেবিলে কিছু না কিছু খাবার রেখে দেয় সোমার মা। মজিদের ক্ষিদে থাকলে নিজেই নিয়ে খেয়ে নেয়। সব ব্যবস্থা তারই নির্দেশ মতো তৈরি। বড় বিবেচনা মানুষটির। তার কারণে শেষ রাতে বাড়ির আর সব লোকের ঘুম ও বিশ্রাম নষ্ট হোক তা সে চায় না। প্রথম প্রথম জেগে থাকতো সোমার মা, কান সজাগ রাখতো সোমা, পরে আর তা রাখে না। সাংবাদিকের জীবন যে সময়-অসময়ের জীবন তা বাড়ির লোকের কাছে গা সওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার। মজিদের জীবন বাদলের কাছেও তাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক জীবনের সুযোগটাই নিয়ে সে প্রথমে ঢোকে খাবার ঘরে। তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। প্রেটে ঢাকা খাবার আছে। তিনটি রুটি, পিরিচে ঢাকা বাটিতে তিনটুকরো আলুসহ মুরগির মাংসের একটি রান ও একটি সেকটিপিন। পরম নিশ্চিন্তে খেতে বসল বাদল। সে জানে, ঘণ্টা তিনেকের আগে মজিদের ঘুম ভাঙবে না। দুটো রুটি খাওয়া হয়ে গেছে বাদলের। তৃতীয়টির এক কোণা সবে ছিঁড়েছে, ঠিক সে সময় খাবার ঘরের লাগোয়া সোমার ঘর থেকে ডাক দেয় সোমা,

বাবা এলে?

বাদল চাপা গলায় বলে,

হঁ।

খান্ধো?

হঁ।

মার বাতের ব্যথাটা বেড়েছে।

এবারে আর হঁ হঁ জবাবে চলবে না ভেবে কুটি ছেঁড়া বাদ দিয়ে বাদল সোমার ঘরে পা বাড়ায়। বাদল জানে সোমা রাতে শুধু ব্লাউজ ও পেটিকোট পরে ঘুমায়। শাড়ি পরে ঘুমাতেই পারে না। মনে হয় গলায় ফাঁস লেগে যাবে।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ডাকে বাদল, সোমা।

কে?

চেঁচাবে না। আমি বাদল।

তুমি! তুমি এখন এখানে? বাবা, বাবা কোথায়?

উনি জ্বরগামতো ঘুমাচ্ছেন।

তুমি এতো রাতে!

বলছি চেঁচাবে না।

বাতি জ্বালবে না।

সে আমি জানি। তবে অন্ধকারে চেয়ারে একটু বসি?

বাতাস কালাকাল করে না না করে উঠতে চায় সোমা। কিন্তু বাদল অন্তর্যামী মতোই যেন টের পায়। বিষয় ও আতঙ্কে পৃথিবীর সমস্ত চিৎকার সোমার গলায় দানা বেঁধে আছে। যেকোনো সময় অগ্নিগিরির মতো শত সহস্র পাথর ও ক্রেদও লাভা ছিটিয়ে তা বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়। সে শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলে,

সোমা, চেষ্টা করে লাভ নেই। না, ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে অসম্মান করবো না। আমি তোমার কাছ থেকে শুধু একটা কথাই জানতে এসেছি।

হিমশিম খেয়ে বলে সোমা,

কি?

তুমি কি ওই লোকটিকেই বিয়ে করবে?

এই কথা জানার জন্য এটাই কি উপযুক্ত সময়?

হাসে বাদল।

আমার বিবেচনার তাই। দিনের বেলায় তো আমার আর কোনো প্রবেশাধিকার নেই। তাই, এরকম একটা সময়ই বেছে নিতে হলো। সময়টা অসময় হলেও আমার কিছু করার নেই।

আমি কিন্তু চেষ্টা করে বাড়ি মাথায় করবো।

আবার হাসে বাদল।

ক্ষতি তোমারই। এতো রাতে তোমার ঘরে অন্য লোক। ব্যাখ্যাটি লোকে লুফে নেবে।
ইউ বাস্টার্ড।

যতোই গাল দাও, আমি শুধু তোমার মুখ থেকে জানতে চাই তুমি কি ওই
লোকটিকেই বিয়ে করবে?

গেট আউট।

দেখো সোমা, তোমার বাবাকেও বলেছি, তোমাকেও বলছি, এখন এমনই একটা
সময় যখন কেউ মাথা কুটে মরে গেলেও এগোয় না।

স্পট ইয়োর সারমন!

আশ্চর্য, আমি বাংলা বলছি, আর তুমি কিনা সমানে ইংরেজিতে রাগ করছো।
ইস, আলোয় যদি তোমার রাগের মুখখানা দেখতে পারতাম।

ইউ সান অব এ বীচ।

বলে যাও, বলে যাও। তুমি এখন আকাশপথে ভ্রমণ করছো। বিমানের জানালার
ধারে আসনে বসে নিচে পাহাড়পর্বত সব একাকার দেখতে পাচ্ছে। আমাকেও জন্তু
জানোয়ারের বাচ্চার মতোই মনে হবে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। সোমা, তুমি দয়া করে
বলো, তুমি কি ওই লোকটিকে বিয়ে করবে?

দ্যাটস নান অব ইয়োর বিজনেস।

আচ্ছা সোমা, তুমি কি বাংলায় একটাবারও রাগ করতে পারো না? সব ইংরেজি
রাগ মনে হয় বিদেশী। এদেশী কতো ভালো ভালো রাগ রয়েছে!

বাদল বুঝতে পারে সোমার ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে। এই নিঃশ্বাসে মানুষ
পুড়ে যায়। শরীর ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। হাত বারবার মুঠো হয়। গোটা
অস্তিত্বে এমন একটি প্রকৃতি এসে যায় যেন একুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যতোই
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হোক, সোমা শুধু রাউজ ও পেটিকোট পরা অবস্থায় তার ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়বে না। এর আগে সে বাদলের ওপর যতোবার শারীরিক আক্রমণ
চালিয়েছে সব দিনের বেলায়। তার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য চুল ও পিঠ। বাদল আগে
যতোবার আক্রান্ত হয়েছে, প্রত্যেকবারই পিঠ ও মাথায় মৃদু ব্যথা নিয়ে বাড়ি
ফিরেছে। এবং প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে শারীরিক ব্যথা এতো মিষ্টি কেন?

চাপা গলায় নির্দেশ দেয় সোমা।

বাদল, প্লিজ গেট লস্ট।

হ্যাঁ যাবো, অবশ্যই যাবো। থাকার জন্য আসি নি। আমি শুধু জানতে এসেছি
তুমি ওই লোকটিকে সত্যি সত্যি বিয়ে করবে?

ওহ গড, হোয়াট এ হেল!

এখনও সোমা বাংলা বললো না শুনে ঠা ঠা করে হেসে ওঠে বাদল। সে বুঝতে
পারে রাগ একেবারে মরে না যাওয়া পর্যন্ত সোমা বাংলায় ফিরবে না। হাসতে
হাসতেই বলে,

ভালো! বেশ ভালো। বিদেশে ইংরেজি ছাড়া যখন গতি নেই তখন তোমার ইংরেজিতে উন্নতি হয়েছে দেখে ভালো লাগলো। তো বলো, তুমি কি ওই লোকটিকেই বিয়ে করবে?

ইয়েস।

তুমি লোকটিকে কতোটুকু জানো সোমা?

দ্যাটস নট মাই হেডেক।

সহসা আকুলতায় খান খান হয়ে যায় বাদল। চেয়ারে বসেই সে বিছানায় জড়োসড়ো হয়ে বসা সোমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে,

সোমা, তুমি যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে করো।

হোয়াট?

যুদ্ধের সময় তার ভূমিকা শুধু খারাপ নয়, খুব খারাপ, আমি সব খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ভয়ংকর ভূমিকা ছিলো তার। সোমা, তুমি দুই আপন চাচা হারিয়েছো, আপন মামাতো ভাই হারিয়েছো, তোমার তিন শিক্ষক হারিয়েছো, পাড়ার যে দাদার কোলেপিঠে তুমি মানুষ তাকে হারিয়েছো। এতোগুলো মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে কারা? এরাই। সোমা, আমার সোমা, সব জেনে শুনে তাদের রক্তের ওপর দিয়ে হেঁটে তুমি বিশ্বের গাড়িতে বসতে পারবে, বিমানে চড়তে পারবে?

কোনো জবাব আসে না সোমার কাছ থেকে। অপেক্ষা করতে থাকে বাদল। জবাব, শুধু একটি জবাব শোনার অপেক্ষায় সে ঘরের সমস্ত অন্ধকারে কান পেতে রাখে, কোনো জবাব আসে না। সে বুঝতে পারে না সেই লোকের ভূমিকার কথা জেনে সোমার কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা, সে সমগ্র অনুভব ও অস্তিত্ব দিয়ে কামনা করে যায় অন্তত একটা মানুষও যেন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে অই গুয়োরের বাচ্চা হারামির বাচ্চা রাজাকারের বাচ্চা তুই যতো মালদার আদমীই হোস না কেন, বিদেশে থাকিস না কেন, তুই যে গুয়ের পোকা সেই পোকাই রয়ে গেলি। একবার, শুধু একবার যেন সোমা বলে, না, আমি তাকে বিয়ে করবো না, জীবন চলে গেলেও না। একবার। একবার!

কাক

এটা পাখির দোকান।

লোকটি দোকানে ঢুকল। দোরগোড়ায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে, আশেপাশে তীব্র দৃষ্টি মেলে সব কিছু খুঁটেখুঁটে কি যেন দেখল। হয়ত পেল না। তার আগমনকালের মুখের স্বাভাবিক অবস্থাটা অস্বাভাবিক হয়ে গেল মুহূর্তে। মনে হচ্ছিল এই একুনি সম্ভবত মুখের রগগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে দোকানের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়বে।

লোকটি কি খুনি? খুনিরা নাকি ঐরকম অস্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে, তাকায় ও আচরণ করে। লোকটি সম্ভবত পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল। এত সুন্দর পাখির দোকানে ঢুকে, এক মিনিট যেতে না যেতেই যে বীভৎস মুখশ্রী সে দেখালো তাতে একটা স্বাভাবিক সহজ ও সরল মানুষের হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ কোথায় লাল পাখিগুলো কেমন সুন্দর করে একটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাকিয়ে পড়ছে; ওই কোথায় হলুদ পাখিটা অকারণেই পাখা ঝাপটে ঝাপটে ব্যর্থ হয়ে খাঁচাতেই মুখ ঝুঁজছে; কুলন্ত তারের খাঁচাটার সেই সুদূর মেক্সিকো দেশের তিনরঙ্গা টিয়া আপন মনে কী সব ভেবে চলেছে। সে সব দিকে লোকটির কোন খেয়ালই নেই। কেবার দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিরে, জীবন ও জগৎটাকে ভুজ্জ্বল মনে করে, একটা ব্যঙ্গ দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করল নীরব অথচ বিশ্রী মুখভঙ্গিতে।

দোকানি লোকটিকে লক্ষ করেছে প্রথমেই। খরিস্কারের আশায় দোকানদার নিজের আসন ছেড়ে গা তুলেছে কি তোলেনি, ঠোট খুলে কিছু বলতে যাওয়া প্রতীতি নিতে না নিতেই লোকটি ফিরে যাবার উপক্রম দেখে সে বলল,

কি চাই আপনার?

লোকটি ফিরে তাকাল, কোন জবাব দিল না। দোকানি আবার জিজ্ঞেস করল, পাখি নেবেন?

লোকটির জবাব নেই, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে গেছে। দোকানি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, তবে একটি ঘুরিয়ে,

বলুন কি পাখি চাই আপনার?

আলো কয়েকটা মুহূর্ত চুপ থেকে গভীর কণ্ঠে বলল,
কাক আছে?

কাক!

যুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

না, বাংলাদেশে থাকি আর কাক চিনিনে?

কিন্তু কাক রেখে কি করবো, ওটা কে কিনবে?

কেন, এই যে আমিই তো কিনতে এসেছি।

এই আপনিই প্রথম এলেন কাক কিনতে। এর আগে কেউ আসে নি এবং আসবেও না।

নেই ভাই বলেন। অতকথা আমি শুনে আসি নি।

দোকানির মুখে জবাব নেই। লোকটিও এ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ বকবক করবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিল না।

লোকটি বেশ জোরে এগিয়ে গেছে পাঁচ-ছ পা। এমন সময় দোকানি পেছন থেকে ডাক দিল,

এই যে শুনুন।

লোকটি ফিরে তাকাল। দোকানি বলল,

আরো তো কত সুন্দর সুন্দর পাখি রয়েছে।

কী বাজে বকছেন।

বলেছি তো আমার কাক দরকার। দিতে পারবেন?

তা দেয়া যায়।

লোকটির চোখে মুখে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দোকানি তার মুখের দিকে তাকিয়ে, কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল,

তবে আজ নয়।

কবে?

দিন দুয়েক সময় দিতে হবে।

না, এত দেরি কেন?

ধরতে হবে না? তা কতগুলো চাই আপনার?

একটা, দশটা, একশো, হাজারটা—কতগুলো দিতে পারবেন আপনি?

লোকটি চিন্তার করে উঠেই থেমে গেল। দোকানি হাত ধরে তাকে ঘরে এনে চেয়ারে বসায়।

লোকটি আর একবারও সুন্দর সুন্দর পাখিগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না। দোকানি একবার আপাদমস্তক লক্ষ করল তার। না, একেবারে ভাল মানুষ, পাগলের কোন লক্ষণই নেই তার মধ্যে। দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে বিবণ্ন হয়, আবার কখনো ধাক করে জুড়ে উঠে পারিপার্শ্বিক জগতটাকে মুহূর্তে ঘেন হাই করে দেয়। তার পোশাকে কোন

বৈষম্য নেই, চুলগুলো সুন্দর করে আচড়ানো, সিঁথিটা একেবারে সোজা। দোকানি জিজ্ঞেস করল,

কাক কি আপনার খুব দরকার?

আপনার সঙ্গে কি আমি রসিকতা করছি?

না, না। বলছি, মানে এত সুন্দর সুন্দর পাখি...

ওরা মড়া খেতে পারে?

মড়া! কিসের মড়া?

মানুষের।

মানুষের মড়া আপনি কাক দিয়ে খাওয়াবেন?

হ্যাঁ, আমি এবং আমিই।

মৃতদেহ কবর দেন নি?

না।

বেশতো শেয়াল কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেন গে।

না, কাক দিয়ে খাওয়াবো। মৌ করে উড়ে এসে শবটার উপর বসে ঠোট চালাতে থাকবে, আমি উপভোগ করতে থাকবো প্রতিটি ঠোকর।

শকুন চিলেরা কি দোষ করল?

ওদের চেহারা কাকের চেয়ে সুন্দর, তাই ওদের আসতে দিতে চাই নে। কাক দেখতে কুৎসিত, তার ডাক কুৎসিত, তার সমস্ত আচরণ কুৎসিত। আমি তাই কাককে মনোনীত করেছি।

দোকানদার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বলল,

পরন্তু এসে একশো কাক নিয়ে যাবেন।

খুশির চোটে লোকটি হাততালি দিয়ে বলল,

আচ্ছা।

গাছে গাছে যখন সুন্দর পাখিরা সমন্বরে শিস দেয়, ওদের বুলিতে ওরা গান গায়, তখন লোকটি শক্ত করে দুই কান চেপে ধরে—ওই ডাক যাতে কানে না আসে। সে ভুলেও সুন্দর পাখিগুলোর দিকে তাকায় না। সুন্দর পাখিগুলো নয়ন ভোলায়, তাদের ডাক শুনে মন ভোলে, ইচ্ছে করে পাই, হাত বাড়াই, হাতে পাখার ঝাপট লাগল, কিম্বা পাখার বাতাসের ঝাপটা শরীরটাকে সাময়িকভাবে করল সুশীতল, অথবা হাতে একটু দিলই বা আঁচড় বসিয়ে—স্পর্শের আনন্দে মন হয় চাঙ্গা। তথাপি কাক দেখলে লোকটি পরম বন্ধুর মত তাদের দিকে তাকায়, পায় পায় এগিয়ে যায় ধরতে। সে খুব ভাল করে জানে কাকের ওই ধারালো ঠোঁটের ঠোকরে হাতের মাংস খানিকটা ঠিক উড়ে যাবে। বেশতো উড়ুক না, নিজেকে নিঃশেষ করে কাকের মত তৃতীয় শ্রেণীর প্রাণীর উপভোগে আনতে পারলে আমন্দই তো! সুন্দর পাখিগুলো মড়া খায়

না, চোখের উপর দিয়ে যাদুর রং বুলিয়ে যায় উড়ে, মনে দিয়ে যায় একরাশ জ্বালা। ঘৃণা, চরমতম ঘৃণা সুন্দর পাখিগুলো। লোকটির মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে রং ধরে থাকা সুন্দর পাখিগুলোকে পায়ের তলায় পিছে মারুক, একটা পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করে উঠুক সে।

লোকটি চার হাত পা দিয়ে দিন ঠেলছে, কবে পরশুদিন আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে, নির্ধারিত সময়ে লোকটি পাখির দোকানে গিয়ে দেখল অনেক লোক গোলাকার হয়ে একশো কাকের বিরাট খাঁচাটা অভ্যস্ত কৌতূহলী হয়ে দেখছে। লোকটিকে দেখে দোকানি বলল,

এই সেই লোক, যিনি কাকের অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলেন।

অগণিত চোখের দৃষ্টি লোকটিকে ভালো করে খুঁটে খুঁটে দেখল, কেউ মন্তব্য করল—নানা রসিকজনের নানা মত। লোকটির অতসবে আদৌ ক্রম্প নেই। দোকানি কঁাকি দিয়ে তার কাছ হতে চড়া দাম নিল, তা সে একবারও ভেবে দেখল না, প্রতিবাদও করল না। পরিবর্তে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে কোলাহলময় কাকগুলোর দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে চাইল।

ছোট ছেলের মত হাততালি দিয়ে উঠল লোকটি। একটা অপ্রত্যাশিত বস্তু প্রাপ্তির পর যে আনন্দ চোখে মুখে ফুটে ওঠা দরকার তা তার ফুটে উঠল ঠিকই, সাথে আরো একটু হল তার মুখের বীভৎসতা। একি! লোকটির চোখ দিয়ে আগুন ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে কেন? এই তক্ষুনি বুঝি তারের জাল দেওয়া খাঁচাটা ও কাকগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লোকটি ক্রমশ পতীর দৃষ্টি মেলে কাকগুলোর দিকে তাকান্ধে, যেন সে কালো বিদ্রী পাখিগুলোর অন্তর দর্শন করতে পারছে। কাকগুলোর সেদিকে ক্রম্প নেই। একত্রিত হওয়ার আনন্দের চেয়ে এই আকস্মিক পরাধীনতার প্রতিবাদে তারা তখন মুখর। অথচ লোকটি যে তাতে কি বীভৎস আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে তা কেউ জানে না। হঠাৎ সে একটা হাত জালের ভেতর ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করল। হাত গেল না, তবে জালে লেপটে থাকা হাতে একটা কাক তীব্রবেগে একটা ঠোকর বসিয়ে দিল। কোন আপত্তি করল না সে, বরঞ্চ খুশিই হল যেন।

আকাশটা আজ এত পরিষ্কার কেন—এটা লোকটি বুঝে উঠতে চেষ্টা করে এই বুঝল; আজ তার মৃত্যু দিন, তাই পৃথিবী খুশির রং ছড়িয়েছে আকাশে, আকাশটাকে গাঢ় নীল শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। হাসলো সে, সে হাসিতে ক্রুরতা নেই, বিষণ্ণতা নেই, অভিমান নেই, কোন বাড়াবাড়ি নেই। পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসার উপাদানে গড়া সে হাসি শান্তরূপ নিয়ে যখন বাতাসের নিস্তক্কার পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন নিকূপ নিকলঙ্ক নীলাকাশ তার প্রগতি গ্রহণ করল কিনা তা সে নিজেও জানে না। তবুও সে খুশি হল। ভালবাসতে পেরে খুশি হওয়ার তৃপ্তি সে এবারে এই মৃত্যুর মুহূর্তখুশি হয়ে লাভ করতে পারল ভেবে আরো পতীরভাবে সে খুশি হল।

বেশ বড় একটা ঘর। এ ঘরে একশো কেন, কয়েকশো কাক ধরতে পারে। ঠেলাগাড়ির কুলিরা খাঁচাটাকে ধরাধরি করে ঘরের মাঝখানে রেখে গাড়ির ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

লোকটি ঘরের দরোজা জানালা ভাল করে আটকে দিল। ঘুলঘুলি যে আলো প্রবেশ করছে তাতে সে দেখতে পেল কাকগুলো আরো ব্যগ্র হয়ে উঠেছে খাঁচা থেকে বেরুনোর জন্য। তাদের সমবেত কণ্ঠের কা কা ধ্বনি কান ফাটিয়ে দিচ্ছে। একটুও বিচলিত হল না সে। মানুষ চরম ও পরম তৃপ্তির সময়ে যেমন সব কিছু ভুলে গিয়ে অতিবড় প্রিয়জনের অস্তিত্বে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে, তেমনি লোকটি নিজের দুই কান চেপে ধরে অস্ফুট শব্দে একটা নাম উচ্চারণ করল। বিদ্যুৎবেগে সে ছুটে গেল অবরুদ্ধ হিংস্র প্রাণীগুলোর দিকে। এক ঝটকায় খুলে ফেলল খাঁচার মুখ। উহ্! কান ফাটানো কা কা শব্দে লোকটি নিজেই নিজের মৃত্যু পূর্বকালীন প্রিয় কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না— তোমার অনুভূতি আমার হৃদয়কে প্রতিটি মুহূর্তে বিন্দু বিন্দুভাবে দুঃসহ যন্ত্রণায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে, আমি পরিজ্ঞান পেতে চেয়ে প্রতিক্ষণে আরো বেশি করে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি, যা বুঝে ও অনুভব করে তুমি, তুমি বিচিত্ররূপিনী অপার আনন্দ উপভোগ করছ। আমি মুক্তি পেতে চাইছি সেই সমস্ত প্রাণীর শিকার হয়ে, যারা তোমার মত সুন্দর নয়, যারা আমাকে ভক্ষণ করবে অতুলনীয় তৃপ্তি সহকারে, কোন প্রকার ছলনার আশ্রয় নেবে না, তাদের প্রতিটি ঠোকর আমি ভাববো আলিঙ্গন, চুমু। আমার প্রতি মাংসকণা তাদের ঠোঁটের আগায় যখন উঠে আসবে তখন আমি অনুভব করবো, তোমার হাত থেকে সত্যি আমি মুক্তি পেয়েছে।’

ঘরের মধ্যে কাকগুলোর তখন উন্মত্ত উল্লাস চলছে।

তেল

আবুল হোসেন যখন নিচে থেকে ডাক দিলো, 'মেজো ভাই আসুন, নিয়ে যান,' তখন সবারই মনে হলো আবুল হোসেন বুঝি কোনো দুর্গম গুহা থেকে যক্ষ-লালিত মহামূল্যবান মণি-মুক্তা উদ্ধার করে এনেছে। মেজোভাই হাবিবুর রহমান দোতলায় থাকেন, তাঁর ওঠানামার সিঁড়িটা চালু বলে পা পিছলে যাবার একটা সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে, ডবুও পা-পিছলে পড়ার ভয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি প্রায় ভিনলাকে গিরে হাজির হলেন রাস্তায়, একেবারে রিকশার গা ঘেঁষে। রিকশাওয়ালা তখন একে একে তেলের টিনগুলো নামাচ্ছে।

'পেয়েছো?' হাঁপাতে হাঁপাতে হাবির জিজ্ঞেস করেন ছোট ভগ্নিপতি আবুল হোসেনকে।

'জি। তিন টিন।'

'তিন টিন?'

তিন এবং টিন—এই সম্মিল দুটি অক্ষরের শব্দ দুটি তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, যেন শব্দ দুটোর সঙ্গে তিনি কোনোকালেই পরিচিত নন। ব্যর্থ হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তাবে পেলে?'

'চলুন উপরে গিয়ে বলবো।'

হাবিব সাহেবের বিশ্বরের ঘোর তখনও কাটে না। তিনি তেলের টিনগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে নাকের কাছে নিয়ে আসেন—সত্যি কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যায় কি না। হ্যাঁ, সত্যি কেরোসিনের গন্ধ। যেন আতরের গন্ধের মতো। ছোটবেলা থেকে বাবাকে দেখে এসেছেন, আতর কিংবা ঘি অথবা সর্ষের তেল কিনবার সময় হাতের উপরিভাগে খানিকটা ঘষে, গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা করতেন খাঁটি কি না, তিনি নিজেও সেটা করেছেন বহুদিন, কিন্তু কেরোসিন তেলের গন্ধ নিতে হবে তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। তিনি নিজে এক টিন, আবুল হোসেন এক টিন ও রিকশাওয়ালা একটি টিন নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। হঠাৎ মাঝপথে আবুল হোসেনের পা প্রায় ফসকে যায়, চট করে রেলিং ধরে না ফেললে ছিটকে পড়ে হাত পা দুটোই ভাঙতো, তেলও যেতো পড়ে। কিন্তু টিনের সঙ্গে তার ওতো লেগে

প্রচণ্ডভাবে উ হু হু করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল হোসেন বাড়িওয়ালাকে গাল দিয়ে ওঠে, 'শালা, সিঁড়ি কেমনভাবে বানাতে হয় তাও জানে না।'

রিকশাওয়ালা ততক্ষণে খেমে গেছে। সে হাসলো একটু। বললো, 'সাহেব, তিন টিন ত্যাল পাইয়াও দুকু পাইছেন বইলা আহা উহু করতাহেন, সেদিন লাইনে দাঁড়াইয়া, মারপিট কইরা এক গ্যালন পাইছি। মার খাইয়া দুইদিন রিকশা চালাইতে পারি নাই।'

উপরে উঠে ক্লান্তি দূর করার পর হাবিবুর রহমান জিজ্ঞেস করেন, 'এবারে বলো কেমন করে তিন টিন পেলেন।'

'আমরা অফিস থেকে তেল কোম্পানির কাছে দরখাস্ত করেছিলাম, আমাদের পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্যে তেল দিতে। কোম্পানি সাত ড্রাম দিয়েছিলো, আমাদের সকলের ভাগে পড়েছিলো দুই টিন করে।'

কথার মাঝখানে হাবিব সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম বাধা দ্যান, 'কিন্তু আপনি তিন টিন পেলেন কি করে?'

ধমকে ওঠেন হাবিবুর রহমান। 'চুপ করে শোনোই না। বলতে দাও ওকে।'

অন্য সময় হয়তো ছোট ননদাইয়ের সামনে ধমক দেবার জন্যে মরিয়ম দুঃখিত হতেন, কিন্তু ওরা এখন সবাই যেন এক ঐশ্বরিক ও অলৌকিক কাহিনী তুলছেন, যেখানে বাদ সাধা যেমন পাপ, তেমনি দুঃখিত হওয়াও মহা অন্যায়। আবুল হোসেনের প্রতিটি কথার পরতে পরতে যেন যাদু, প্রতিটি কাজে যেন যিত্তর অলৌকিক কাজের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

'হ্যাঁ, ভূমি বলো।'

'যা বলছিলাম। আমাদের এক ঠাকুর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে যে ওর মার অবস্থা বেশি ভালো না। খবর পেয়ে ওরা ক্যামিলীসুজ রাতের ট্রেনে বাড়ি চলে যাচ্ছে। ওর ক্যামিলি হয়তো বাড়িতে থাকবে অনেকদিন। তাই দুই টিন তেল অতিরিক্ত বলে আমাকে এক টিন দিয়ে গেল।'

'দাম দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে। এই সুযোগ কি ছাড়ি?'

'তোমার কলিগের মার কি অসুখ?'

'জিজ্ঞেস করিনি।'

আবুল হোসেনের জবাব শুনে হাবিব কিছুদিন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'ভাগ্যিস জন্মলোকের এক টিন ছাড়লেন।' পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন মরিয়ম। কিন্তু হাবিব সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন 'দ্যাখো, জন্মলোকের অসহায় সুযোগে আমাদের এরকম উল্লাস প্রকাশ করা উচিত নয়।'

'রাখো তোমার ওই সব নীতিকথা। তোমার ওই অসহায় ভালোমানুষির জন্যেই আজ আমার কটের এক শেষ।'

হাবিবুর রহমান এ অভিযোগের কোনো জবাব দ্যান না। তিনি জানেন, অমীমাংসিত এ সমস্যার আগুন তিনি বাড়াতে পারবেন বই কমাতে পারবেন না। মরিয়ম দিনের পর দিন বলেছেন, 'দ্যাখোনা একটু তেলের জোগাড় করতে পারো কি না।'

'কোথায় পাবো?'

'কোথায় পাবে তা কি আমাকে বলে দিতে হবে? লোকজন তেল পাচ্ছে না? তারা পায় কিভাবে?'

'তারা পায় কারণ তাদের সোর্স আছে।'

'কেন, নীচ ডলায় হাশেম সাহেব পেলেন কি করে? জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না তিনি কিভাবে পেলেন?'

'আমি ওসব পারবো না। খড়ি কিনে দেবো, রান্না করবে।'

এবার ক্রোধে কেটে পড়েন মরিয়ম, 'তা পারবে কেন, খালি পারো বাঁদির মতো খাটাতে। ডেজা খড়িতে রান্না করতে যে কি কষ্ট তা তুমি বুঝবে কি করে? চুলো ধরে না, হুঁ দিতে দিতে ধোঁয়ায় আমার চোখ দুটো গেল—তুমি তো চাও, আমি অন্ধ হয়ে যাই।'

হাবিবুর রহমান অপরাধীর মতো বসে থাকেন। কিই বা জবাব দেবার আছে। সত্যি তো তিনি জোরালোভাবে চেষ্টা করেন নি। পরিচিত উচ্চপদস্থ দু'চারজন অকিসার বন্ধুকে স্নেহ টেলিফোন করাই, তাদের কাছে যাওয়া পর্যন্ত নয়। অথচ রাস্তায় তিনি মাঝে মাঝেই দ্যাখেন, লোক টিন ভর্তি তেল নিয়ে যায়, যেন কোহিনুর মণির অধিকারী সেই লোক পরম অবজ্ঞাভরে পথচারীদের দিকে তাকায়, তৃপ্তির হাসি সর্বান্তে মেখে সকলকে উপহাস করে। হাবিব সাহেব ভাবতে থাকেন, নিশ্চয়ই ওর কোনো জোরালো সোর্স আছে, মামার জোর আছে, ভাইয়ের প্রভাব আছে, চাচার ভক্তির আছে। তার তেমন কেউ নেই যে সেখানে গিয়ে ধর্না দেবেন। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের চিন্তারই প্রতিবাদ করেন—পেলে স্বাভাবিকভাবেই পাবো; দশজনের সাথে হ্যাংলার মতো ছুটোছুটি করতে পারবো না।

ইতিমধ্যে এলো সেই সুযোগ। আবুল হোসেনের অকিস স্টাফ তেলের চেষ্টা করছে অকিসের মাধ্যমে।

আবুল হোসেনের কৃতিত্বের কথা শুনে গা-ঝাড়া দেওয়া হাঁসের মতো মরিয়ম ঋনিকঙ্কণ পারচারি করে বেড়ান ঘরের মধ্যে। পারচারির মধ্যেই তিনি আড়চোখে দেখতে লাগলেন টিনগুলোকে, যেন বিয়ের দীর্ঘদিন পর স্বামী এলো স্বস্তর বাড়িতে। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না ওই সাদা টিন তিনটির মধ্যে উৎকট গন্ধ মিশ্রিত অথচ পরম সুবাসিত মহাবৃত্ত্যবান তরল পদার্থ রয়েছে। সংশয়টা মাঝে মাঝে দোলা খাচ্ছে তাঁর মনে—পানি মেশানো নেই তো! এক সময় বলেই ফেলেন, 'হ্যাঁ আবুল তাই, পানি মেশানো-টেশানো নয় তো?'

'না, না। ফ্রেশ ডিপো থেকে নিয়ে আসা।'

‘এর আগে দশ টাকা গ্যালন যখন কিনেছিলাম, তখন পানি মেশানো ছিলো।’

‘অসম্ভব। আপনার কোনো ভয় নেই। নিশ্চিন্তে রান্না করতে পারেন।’

‘উহ! আমি এখন তেল খরচ করছি না। খড়ি ব্যবহার করবো। বর্ষার জন্য তুলে রাখবো।’

হাবিবুর রহমান শান্তকণ্ঠে বললেন, ‘দ্যাখো, আমি কিন্তু খুব একটা বিচলিত হই নি।’

‘তোমার হওয়ার দরকার পড়ে না, কারণ রান্না করতে হয় আমাকে।’

‘তা ঠিক। তবে কষ্টটা সমস্ত দেশবাসীর।’

মরিয়ম আবার ফুঁসে ওঠেন, ‘তাহলে শেখ সাহেব সাত দিনের মধ্যে ডিলার, এজেন্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না কেন?’

হাবিব সাহেব রাজনীতি কোনোদিন করেন না, তাই স্ত্রীর এ-কথারও কোনো জবাব না দিয়ে শুধু বললেন, ‘রেডিওতে বলেছে, কাগজেও লিখেছে যে খুব অল্পদিনের মধ্যে এলাকায়-এলাকায় রেশন কার্ড দেখিয়ে তেল নিতে হবে।’

‘ওমা! তাই নাকি? তাহলে আমাদের বাড়িওয়ালাও তো তেলের ডিলার। সেও পাবে?’

‘হ্যাঁ, জেনুইন ডিলার হলে অবশ্যই পাবে।’

দু দিন পরই কাগজে খবর বেরুলো টাকা ও নারায়ণগঞ্জে নির্দিষ্ট ডিলারদের মাধ্যমে তেল দেয়া হবে। হাবিব সাহেব কাগজ পড়ছিলেন, বাড়িওয়ালার নাম দেখেই নিচে গলা বাড়িয়ে দিলেন, ‘ও আখন্দ সাহেব, আপনার নাম বেরিয়েছে কাগজে।’

আখন্দে উচ্চকণ্ঠ হয়ে আখন্দ সাড়া দিলেন, ‘কেন, কেন?’

‘তেল দিবেন, তাই।’

‘ও। হ্যাঁ, আজ বিকেলে তেল আসবে, কাল সকাল থেকে দেবো।’

আখন্দ সাহেব সরে গেলে মরিয়ম বললেন, ‘আরো দু এক টিন নিয়ে রাখা যায় না?’

‘দ্যাখো, মানুষের প্রয়োজন আমাদের চেয়ে এতো বেশি যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়ে নিজেকে অপরাধী সাজাতে চাইনে। তোমার তো তাও তিন টিন আছে, অনেকের যে এক গ্যালনও নেই।’

প্রবল নীতিবান ও সং স্বামীটিকে ঘাঁটাতে সাহস পান না মরিয়ম। তিনি বহুব্যার লক্ষ্য করেছেন, বহু দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তাঁর আদর্শ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যায় নি, সাময়িকভাবে অভিমান ও রাগে ফুলে উঠেছেন মরিয়ম, কিন্তু তার স্বামীর ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য যেন বেড়েছে আরো বেশি।

রাত এগারোটায় দিক থেকেই টিনের শব্দ। হাবিব সাহেব মরিয়ম তখন ঘুমুতে যাবেন, কিন্তু শব্দ আসছে নিচে থেকে তাদেরই বাড়ির নিচে, বাড়িওয়ালার ঘরের

সামনে। মরিয়ম কিছুটা বিরক্ত হন, কিন্তু হাবিবুর রহমান তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলেন, 'কেবল বোঝার চেষ্টা করো, মানুষের অভাবটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।'

কোলাহল শুরু হলো রাত তিনটের ওদিক থেকে। হাবিবুর রহমান শুয়ে শুয়েই শুনেছেন, জায়গা দখল নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে বলে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দিচ্ছে, কোনো ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জায়গা বিক্রি করার জন্যে হাঁকছে—ড্রামের কাছে জাগার দাম একটাকা, একটাকা; আবার কেউবা অলস গল্পে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে।

সকালে অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির। এ কতো বড়ো লাইন! মুহূর্তে মুহূর্তে লাইন বেড়ে চলেছে, মানুষ যেন দলে দলে সার্কাস দেখতে আসছে চারদিক থেকে। চূড়ান্ত খেলাটা যেন লাইনের শেষ মাথায়, বুড়ি যেন ওখানেই বসে, সবাই ছুঁতে ব্যস্ত। রহমান সাহেবের কথাটি মনে পড়ে হাসি পায়—বন্ধুকে চিঠি লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন, রেলওয়ে বুকিং অফিসে লাইন দেখেছি, সিনেমা হলে লাইন দেখেছি, খেলার মাঠে লাইন দেখেছি, এমনকি প্রেমেরও লাইন দেখেছি, কিন্তু তেলের এমন লাইন কোনোদিন দেখি নি।

তেল দেওয়া তখনো শুরু হয় নি। আবুল হোসেন হাবিব সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'ভাই, কাল বিকেলে কিন্তু আমি বিশ ড্রাম তেল দেখেছি। এখন দেখছি আঠারো ড্রাম।'

'তোমার হয়তো মনে নেই।'

'আমি আর ভাবি দুজনেই ওনেছি।'

কথাটি বিশ্বাস করতে চাইলেন না হাবিব সাহেব। মানুষের প্রতি তাঁর অসম্ভব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, যা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া তিনি বিসর্জন দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। আর, আব্দুল সাহেব সম্পর্কে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, তিনি ধর্মভীরু লোক, সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আবুল হোসেনকে আমল দিলেন না। সারা সকাল ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তিনি তেলের লাইন দেখলেন। একটি টিন যেন দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান জায়গাটি দখল করে রেখেছে। একটা থেকে আরেকটায় আধা ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই। সামনে থেকে একটা টিন খালি হচ্ছে, অমনি শুরু হচ্ছে ঠনঠন শব্দে পেছনের টিনগুলোর অনুগমন। ভারি মজা লাগে হাবিবুর রহমানের। একবার মরিয়মকে ডেকে দ্যাখান, একবার আবুল হোসেনকে।

বেলা সাড়ে দশটার দিকে তেল ফুরিয়ে গেল। আব্দুল সাহেবের বড় ছেলে আমিন খিগ লিখে সই করে দিচ্ছিল, আর নিজে তদারক করে তেল সরবরাহ করেছিলেন আব্দুল সাহেব। তেল নিগ্গেশ, কিন্তু তখনো বিশাল জনতা পিতা-পুত্রকে ঘিরে।

'আমাদের তেল দিতে হবে।'—জনতার মধ্যে থেকে একজন বললো।

'কোথেকে দেবো?' আমিনের সোচ্চার উত্তর।

‘আমরা তেল পেলামই না, এখনই ফুরিয়ে গেল?’

‘তোমাদের জন্যে আমি তেল পয়দা করবো?’ একটা বিদ্রোহী মুখভঙ্গি করে আব্দ সাহেব জবাব দিলেন।

ভিড় বাড়ছে, কোলাহল বাড়ছে, উত্তেজনা বাড়ছে। হাবিব সাহেব দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনলেন মরিয়মকে। ‘দ্যাখো, দ্যাখো, আব্দ সাহেব বুঝি মারই খাবেন আজকে। আহ! ভদ্রলোকের এই অবস্থা?’

‘তুমি আবার কিছু বলতে যেও না।’

এমন সময় জনতার মধ্যে থেকে শোনা গেল—‘শালা নিচ্চই তেল লুকিয়ে রেখেছে। ষোঁজ শালার বাড়িঘর।’

মুহূর্তে পিল পিল করে সব লোক ঢুকে পড়লো আব্দ সাহেবের বাড়িতে। এ-ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্না ঘর, এমন কি গোছলখানা পর্যন্ত বাদ দিল না কেউ।

‘নারে! শালা ঘুঘু জোড়োর। আগেই সরিয়ে ফেলেছে।’

হঠাৎ হাবিবুর রহমানের কানে এলো—‘চলতো, দোতলার দেখিগে।’

চোখের সামনে রান্নাঘরের মেঝেতে তিনটে টিন চকচক করছে, একটা থেকে কিছুটা তেল চুইয়ে মেঝে ভিজিয়েও ফেলেছে, গছও বেরিয়েছে খানিকটা।

‘এই যে রে, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। ওরেশ শালা ভদ্র লোক, একাই তিন টিন বাগিয়ে বসে আছে। মার শালা কোর টুয়েন্টিকে।’

হাবিবুর রহমান কেবল অনুভব করতে পারলেন প্রচণ্ড বৃষ্টির শব্দের মতো চারদিক থেকে ধিক্কার ধ্বনি আসছে, তাঁর স্ত্রী মরিয়ম কি যেন চিৎকার করে বোঝাতে চাইছেন। কিছু এলোমেলো কথা তাঁর কানে গেল, তাতে তার স্বামীর সন্ততার কথা আছে, নিও না, দোহাই আদ্যার, নিও না, তোমাদের গার খরি, নিও না।

জয়

আজ মাহবুব ভাল মুডে আছে। অফিসে একগাদা কাজ জমে ছিল, ঘাড়ের ওপরে সেগুলো চেপে ছিলো সিন্দবাদের বুড়োর মতো, কিন্তু সেগুলোকে নামিয়েছে; অফিসে গিয়ে কারো সাথে বেশি কথা বলে নি, চেয়ার ছেড়ে উঠে বারদুয়েক পেছাপ করা বাদে একবারও ওঠে নি, মাঝে মাঝে চেয়ারে গা এলিয়ে সিগ্রেট টেনেছে।

চারটের মধ্যে যখন সব কাজ শেষ, তখন হাঁসের মতো গা ঝেড়ে উঠে সমস্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে আড়মোড়া ভাঙে, একসময় পিওনকে হাঁক ছেড়ে বলে, একটা ফার্স্ট ক্লাস চা নিয়ে আসবি। চা খাওয়া যখন শেষ, ঠিক তখনই শাহাদতের টেলিফোন এলো,

অফিস থেকে সোজা চলে আয় বাসায়।

কেন?

সান্তার, কামাল, খোকারা আসবে, একটা ধূম আড্ডা দেয়া যাবে। তোকে থাকতেই হবে।

নাইস। যাবো।

শাহাদতের বৌয়ের চা, ঘরে তৈরি মিষ্টি আর মুড়ি চানাচুর খেয়ে মাহবুব যখন বাসায় ফেরে, তখন রাত সোয়া নয়টা। মেঘ নেই আকাশে, চাঁদটা চকচক করছে, ম্লান হয়ে গেছে আকাশের তারাগুলো, ঝির ঝির বাতাস গায়ে মেখে রিকসায় আসতে ভারি ভালো লাগছিলো ওর, ভাবছিলো আজ লেখাটা শেষ করতেই হবে।

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে, শোবার ঘরটা অন্ধকার, সে বুঝতে পারে লায়লা একটা পাঙলা ঘুম দিয়ে নিচ্ছে। রোজই সে দেয়, কিন্তু আজ ব্যাপারটিকে যেন সে চট করে যেনে নিতে পারে না, বুঝতে পারে না হৃদয়ের কোন জায়গাটা ক্ষুধা হয়ে উঠল, তবে গভীর মনোযোগ দিয়ে কারণ অনুসন্ধান করতে করতে একবার সে বুঝি ধরে ফেলে আসল ব্যাপারটি—সে অফিস থেকে বাসায় ফেরে নি, সাধারণত সে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে কিন্তু আজ দেরি করে ফেরা, হতে কি পারে না কোনো দুর্ঘটনা, যার জন্যে মাহবুব আজ দেরি করে ফিরছে এবং সেই জন্যেই লায়লার জেগে থাকা প্রয়োজন?

বাইরের ঘরে নুরু পড়ছে, ডিকশনারিটা দেখছে, খাতায় টুকছে; মাহবুব ভাবে ওর পরীক্ষাটা যেন কবে!

তোমার পরীক্ষা যেন কবে?

মে মাসের তিন তারিখ থেকে শুরু।

মাহবুব মনে মনে হিসাব করে, আর দেড় মাস আছে। সত্যিই ওর এখন সিরিয়াস হওয়া দরকার। শুধু সিরিয়াস নয়, ভালভাবে পাস করা দরকার, যাতে নিজেকে বি. এ. বলে পরিচয় দিতে পারে, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাটা আছে বলে মোটামুটি একটা ভালো চাকুরির জন্যে আবেদন করতে সক্ষম হয়। কেমন যেন করুণা হয় মাহবুবের। কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকে সে নুরুর দিকে, নুরু যেন ইহজগতে নেই, তারই সামনে দণ্ডায়মান একজন মানুষের অস্তিত্ব বেমানম ভুলে গেছে। মাহবুব ডাক দেয়,

নুরু!

জী।

ভালোভাবে পড়াশুনা করছো তো?

জী।

বিনয়ে মাথা নীচু করে নুরু জবাব দেয়। মাহবুব লক্ষ করে নুরু হাত দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল খুঁটছে। সে স্পষ্ট দেখতে পায়, তার আঙুলে যথেষ্ট ময়লা, হাতের আঙুলের নখগুলো বেশ বড় বড়। মাহবুব কাছে বসে।

তুমি মাঝে মাঝে মনমরা থাকো কেন?

সপ্রতিভভাবে হেসে নুরু জবাব দেয়,

কৈ, না তো!

তুমি না বললেও আমি দেখেছি, তোমার ভাবিও খেয়াল করেছে।

মুহূর্তে কে যেন বিরাট একটি পাথর চাপিয়ে দেয় নুরুর মাথায়, মাথাটা নিচু হয়ে যায়। পিঠের কুঁজ বেরিয়ে পড়ে, একটা বাজে কাগজ কুচি কুচি করে ছিঁড়তে থাকে। মায়া হয় মাহবুবের, বেচারা প্রায় মাসচারেক হলো এসেছে, সে নিজেই তাকে বলে এসেছিল, এসো, চেষ্টা করে দেখবো।

মাহবুবের আশ্বাসে নুরুর মা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। এতোটা তারা আশাই করে নি, দূর সম্পর্কের ভাই নুরু, মাহবুবের চেনবার অথবা পরিচয়ই না দেওয়ার কথা, সেখানে সে নিজে থেকে যেতে বলছে তাকে; শুধু যেতে বলা নয়, চেষ্টা করে সে তাকে চাকরি দেবে; চাকরি, যার জন্যে নুরু মা শিনি পর্যন্ত মানত করেছে।

একটা রঙিন ফুলওয়ালা টিনের সুটকেস, দুটো নারকেল আর এক আটি কাটা আখ নিয়ে নুরু যেদিন হাজির হয়, লায়লা খুশি হতে পারে না, আড়ালে মাহবুবকে বলে, এ আবার কি আপদ ঘাড়ে তুললে?

সুখিয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পাঠশালা, ঢাকা।

ওদের দুরবস্থা দেখলে চোখ কেটে পানি আসে। বিশ্বাস করো, ওর মা যেভাবে আমার হাত চেপে ধরেছিল আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি নি।

কিন্তু এই মিনে একটা বাড়তি লোক।

অনেকটা অপরাধীর মতো মাহবুব জবাব দেয়,

তুমি কেবল ওদের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করো; মনে করো আমারও তো অমন অবস্থা হতে পারতো।

বিষয়টিকে আরো সহজ করে দেবার জন্যে মাহবুব বলে,

ডাছাড়া নুরু তিখিকে নিয়ে বিকেলে মাঠেও বেড়াতে পারে, চাকরের পরিবর্তে ও বাজার করলে জিনিসটাও ভালো আসবে, খারাপ কি?

মাহবুব বুঝতে পারে লায়লা বেন নুরুকে বুঝতে পেরেছে, অনুধাবন করতে পেরেছে ওর প্রয়োজনটা এবং সাথে সাথে নিজেরটাও।

ডাঙ্গাদাটা লায়লারই। সকালে খবরের কাগজে কর্মখালির ডালিকা দেখা, বাজার করা, অবসরে এখানে ওখানে যাওয়া আর বিকেলে তিখিকে নিয়ে মাঠে বেড়ানো ছাড়া নুরু আর কোন কাজ নেই দেখে লায়লা ডাঙ্গাদা দেয়,

তুমি গ্রাইডেট বি. এ. পরীক্ষাটা দিলেই পারো।

একটা প্রবল আনন্দ কলক দিয়ে যায় নুরুর মুখে, কিন্তু পর যুহুতেই একটা হতাশার কালো ছায়া ওকে মলিন করে ফেলে।

বুঝতে পারে লায়লা। বলে,

আমার কিছু কিছু বইপত্র আছে এখনো। আর দরকার পড়লে তোমার তাই আছে, আমি আছি, দেখিয়ে দেবো।

মাহবুব অকসি থেকে ফেরার পর লায়লা কথাটা পাড়ে, মাহবুব খুশি হয়ে নুরুকে ডেকে বলে,

বেশতো! আমার খেয়ালই হয় নি। তুমি গ্রাজুয়েট হতে পারলে আরেকটু ভালো চাকুরিতে ঢোকানো যায়।

সেইদিন থেকেই উঠে পড়ে সেসেহে নুরু। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে নুরু যেন কেমন হয়ে যায়, হুপচাপ বসে থাকে, তিখিকে মাঠে ছোঁড়ে দিয়ে বহুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল, লক্ষ করে মাহবুব লায়লা, বুঝতে পারে চাকুরির বিলম্ব তাকে বারবার টেনে নিয়ে যায় তার কাছে, সে হয়তো রোজ তাবে আজ নুরুর চিঠি আসবে মা, মা, আমার চাকুরি হয়েছে।

মাহবুব যখন নিজের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়, তখন নুরু বলে, ভাবি ডাকতে বাতুল করেছে।

কেন?

আজ অনেক সেলাই করেছে, মাথা ধরেছে খুব। ফলহিসো আমরা বেন খেয়ে মিই।

আমার খুব একটা খিদে নেই। তুমি খাবে তো খেয়ে নাওনা।

মা, মা, খিকলে পাউরুটি নিয়ে চা খেয়েছি। আমারও তেমন খিদে নেই। পরেই খাবো।

যেন ডাড়াডাড়া অসম্মতি জানিয়ে, আগে বাঙার অপর্যাপ্ত এড়াতে পেরে নিজেকে খুব ভুগ মনে করে নুরু।

জামা কাপড় ছেড়ে এসে মাহবুব নুরুর কাছে বসে।

তুমি কি অনেকক্ষণ পড়ানোনা করেছো?

মা, খুঁটাখানেক।

ওহ, গ্রহুর। এসো একহাত হয়ে যাক।

বলেই টেবিলের উপর থেকে তাসের প্যাকেটটা আনতে যায়। মুখ তুলে তাকায় নুরু, মাহবুবের পৃষ্ঠদেশে তখন তার গায়নে, পিঠের কালো পশমগুলো গেঞ্জির উপর দিয়ে মাথা বের করে আছে, নুরু মনে হয় ওটা যেন পিঠ নয়, পেয়ালের, কোন আবেদন অথবা আখাত তাকে ভেদ করে যেতে পারবে না, সে অসহায়ের মতো ভেয়ে থাকে। মাহবুব তাসের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খুঁতেই নুরু মুখটা নাখিয়ে নেয়। সেদিকে খেয়াল করে মা সে, প্যাকেট থেকে তাস বের করেছে, কিন্তু লক্ষ করলে দেখতে পেতো বেদমায় নুরুর মুখটা কালো হয়ে গেছে।

অথচ সেটা প্রকাশ করার কথটা নুরুর নেই। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে,

কি খেলবেন, ফিস মা কাকু?

কাকু। মা, তুমি কি খেলতে চাও?

আপনি যেটা বলবেন।

কাকুই হোক। ঠিক বিশ ডিল খেলবো, তারপর তোমার ডাবিবে তাক দেখো।

বই, খাতা ডিকশনারিটা একপাশে ভুটিয়ে, নুরু তৈরি হয়ে বসে। তাস শাকল সিতে থাকে মাহবুব। দুই হাতে অর্ধেক করে তাস নিয়ে ক হ হ হ হ করে শাকল দেয়াটা মাহবুবের একটা নেশা, এমনকি ব্রীজ খেলতে বসে তখন পাউরুটির নয়, বিপাক দলেরটাও সে দিয়ে দেয়। বলে,

বহু চেঁচা করে শিখেছি। ঠিক একটার পর একটা পড়বে।

নুরু বলল,

কয় ডিল খেলা হলো মনে থাকবে না। খাতার দাগ দিয়ে রাখি।

হ্যাঁ দাও। খেলা হলে কেটে দিও।

তরু হর খেলা। প্রথমে, খেলা শুরু করার সময় মাহবুব ভণ্ডণ করে গান গাইতে থাকে, দুটো জোকারই সে পায়, জর অসিয়ার্ভ, স্পেড-এর সাতটা এলেনই অলরান হয়, সে যেত বলতে পারে, কিন্তু তার আগেই নুরু নাখিয়ে দেয়, দুটো ব্রীজো করে সিঙ্গেল করেছে, হেরে গেল মাহবুব। শাকল দেয়, সিতে সিতে ভাবে, নুরুর চাকরির ব্যাপারে প্রগতি ব্যাকের প্রশাসকের সঙ্গে যে কথা হয়েছে, সে অনুসারে কাল ওকে যেতে বলবে, যদি চাকরিটা হয়, যেতারা যাচে, তরু মা একটু আলোর মুখ দেখে। চিন্তা

করে, এখনই বলবে নাকি সে কখাটা, কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত নেয়, কাল টেলিকোন করে নিশ্চিত হলে বাসায় পিওন পাঠিয়ে নুরুকে দেবে খবরটা। দ্বিতীয়বারেও মাহবুব হারে। এবারও একটা সম্ভাবনা ছিলো জেতবার, কিন্তু তার আগেই নুরু হারে যায়।

এবারে জিততেই হবে, সংকল্প নিয়ে মাহবুব বহু ডেবে হিসেব করে করে তাস ছাড়ে। তার সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু নুরু ছাড়লে লাগাতে পারে, এমন একটি আশংকার সে কৃপণের মতো কয়েকটি তাস আগলে রাখতেই নুরু বলে,

মেড।

বলে সে বিজয়ের হাসি হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই নামায় তাস, মাহবুব অবাক হয়ে দেখে, সে বেগলোকে যথের ধনের মতো ধরে রেখেছিল, তার একটাও নুরু লাগে না, যেন সে মাহবুবের দানের কোন তোয়াক্কাই করে না। গম্ভীর হয়ে যায় মাহবুব, ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাসগুলোর দিকে তাকাতে থাকে, আবার শাফল দিতে শুরু করে।

চতুর্থবারেও সে হেরে যায়। নুরু হাসে।

পঞ্চমবারে নুরু হার্টের বিবিটা ফেলতেই বাজ পাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নেয় মাহবুব, হয়ে গেছে তার, কিন্তু নুরু তার আগেই নামিয়ে দিয়েছে হাতের তাস। নুরু হাসে। এবার মাহবুব বুঝতে পারে, সে হেরে যাচ্ছে বলে নুরু আনন্দ পাচ্ছে।

কিন্তু ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশবারেও পর পর হেরে যাওয়া! মাহবুব চোখ দুটো আলগিনের মতো সরু করে নুরুকে খোঁচাতে থাকে। কিন্তু সে তা পায়ের মাঝে না, জয়ের বর্ম দিয়ে সে যেন ঘৃণার সাথে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে দেয়, আর তার সাথে রয়েছে মাহবুবকে পরাজিত করার গৌরবময় হাসি।

চতুর্দশবার খেলতে খেলতে মাহবুব লক্ষ করে, খেলার আগে নুরু বিশ্বাস খেলার জন্যে যে দাগ কেটে নিয়েছিলো তা কেটে দেয়া হয়েছে একে একে; এবং এবারেও হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নুরু খচ করে আরেকটা কেটে দিলে মাহবুবের মনে হয় নুরু যেন তার হেরে যাবার স্থিতিচিহ্নরূপ চিরকালের জন্যে দাগগুলো কেটে যাচ্ছে।

ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশবারে হেরে যাবার পরেও তার আর বুঝতে বাকি থাকে না নুরু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। সে এতোদিনেও একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারে নি, এই কথাটাই সে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে চায় যে মাহবুব একটা অপদার্থ, আস্ত ধড়িবাঁজ, এবং শুধুনি সে মনে মনে গাল দিয়ে ওঠে—চাকরি না বাল জোগাড় করে দেবো!

নুরু আরও জোরে হাসে, মতো জিতছে, হাসির পর্দা আরও চড়ছে, কক্কণায় কতবিস্কৃত করছে তাকে। মাহবুবের মুখের কাছে এসে যায়—জোচ্চোর, চুরি করে করে জিতছো, কিন্তু দমন করে নিজেকে—সেই তো বাঁটছে তাস।

অসম্ভব!

চিৎকার করে ওঠে মাহবুব। ঊনবিংশবারেও হেরে যাবার পর নুরুকে আর সহ্য করতে পারে না সে, তার হাত থেকে টান মেরে তাস ফেলে দেয়, হাঁপাতে থাকে, ঠিক সেই সময় যদি নিজেকে সে দেখতে পেতো আয়নায়, তাহলে নিজেই অবাক হয়ে যেতো—সে চেহারা মাহবুবের নয়।

হাসতে হাসতে নুরু বলে,

ভাই আপনি যেন ফেপে গেলেন!

চোপরাও বাস্টার্ড। আই নো, ইটস্-এ কনস্পিরেসি এগেনস্ট মী।

তবুও হাসে নুরু। বলে,

হাউ ফানি!

কী এতো বড়ো সাহস! আমার বাসায় থেকে আমাকে অপমান করা, ব্রাঙ্কেল!

বিনয়ের সঙ্গে নুরু বলে,

কৈ না তো?

হঁ, আজকাল আবার মুখে মুখে জবাব দিতে শিখেছো?

মলিন হয়ে যায় নুরুর মুখটা। আমতা আমতা করে বলে, আপনি বললেন বলেই,

কথাটা শেষ করতে পারে না নুরু, বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মাহবুব তার উপর, গলাটার দিকে সাড়াশির মতো হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়।

ফকিরনির বাচ্চা ঢাকায় এসে লাট হয়েছে। পা না ধুরে বিছানায় ওঠা হয়। হারামজাদা, আমারই ঘাড়ে বাস, আর আমাকে অপমান?

নুরুর গলা দিয়ে গৌ গৌ করে একটা শব্দ বেরুতে থাকে, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আসে; মনে হয় ঘরময় সে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর, মাহবুবের চোখে মুখে তখন ফুটে ওঠে জ্বরের হাসি, চিৎকার করে বলে ওঠে,

লাস্ট ডিল জেড, খানকির বাচ্চা, দেখি কেমন মুরোদ!

বাজিকর

রাজার পঞ্চাশমত জন্মদিনে রাজধানীতে সপ্তম ও শেষদিনের অনুষ্ঠান : বাজি পোড়ানো। সুবিশাল মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত একবয়েসী ঘাস; চারপাশে অস্থায়ী গ্যালারি মালা হয়ে আছে, তার বাইরে বড় বড় গাছেরা গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে মেঘ ও আকাশের গায় বাতাস দ্যায়। সারা মাঠের কেবল পশ্চিমে কপালের টিপের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় একটা মনোরম ফুলের বাগান; সেখানে একটা উঁচু আসন, তার ওপর রাজার সিংহাসন, সিংহাসনে দিনে রাতে মগিমুক্তা জ্বলে, সেপাইরা পাহারা দেয়।

গত ছয়দিনের অনুষ্ঠানের মাঠে লোক থৈ থৈ করলেও শহরে ও বাড়িঘরে লোকজনের কর্মব্যস্ততা ছিলো। প্রথম দিন উদ্বোধন; সেপাই-সাত্তীরা রঙিন সাজে কুচকাওয়াজ করে মাঠ ঘুরে ঘুরে রাজাকে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানিয়েছে; তাদের তালে তালে পা ফেলায় মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আর বুঝি কোনো ছন্দ নেই। দ্বিতীয় দিনে উচ্চাঙ্গ সংগীত। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে নামি-দামি গাইয়েরা এসেছেন; তাঁদের সঙ্গে পেটফোলা তানপুরা, সরোদ, এস্রাজ, বাঁয়া-তবলা, সানাই, বাঁশি, চোখেমুখে বাদশাহি আমেজ, কাপড়চোপড়ে আমির-ওমরাহের ভঙ্গি। সারারাত ধরে গান শোনান তাঁরা; তনতে তনতে রাজা মাঝে একবার ঘুমিয়েও নেন, শেষ রাতের দিকে জনসাধারণের অংশ অনেকটা ফাঁকা হয়ে যায়। তৃতীয় দিনে দেশজ সংগীত। রাজা যুগয়া করতে গিয়ে গভীর অরণ্যে হৃদয়ের মতো অবস্থিত এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে একজনের কণ্ঠে গান শুনেছিলেন, সেও আমন্ত্রিত; শহরে যারা গ্রামীণ সংগীতের চর্চায় নিয়োজিত তাঁরাও আদৃত; সেদিন দেশোয়ালি সংগীতের সুরে রাজধানীর এই কেন্দ্রবিন্দু একেবারে গ্রাম হয়ে গেল। চতুর্থ দিনে কবির লড়াই। বিষয়; পুরুষ ও রমণী। গত তিনদিনের তুলনায় রানি আজ বেশি আগ্রহ দ্যাখালেন—কে জেতে কে হারে; রমণী-কবি পায় আর ফিরে ফিরে চায় রানির দিকে; পুরুষ-কবি কিছুক্ষণ পরপরই মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানায় রাজাকে। খুব জমেছিল লড়াই। সেদিন শহরের রমণীরাও এসেছিল বেশি হারে; পুরুষ-কবির যখনই পরাজয় হয়-হয়, রমণীরা কিচির-মিচির করে কলরব করে, উল্লাস প্রকাশ করে; আবার উন্টোটা হলে পুরুষদের

মুখে হাসি আর ধরে না। এই বাকযুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয়, তখন আকাশে শুকতারা হাসতে শুরু করেছে; রাজার পক্ষ জিতে গেল বলে পুরুষদের হৈ হুয়ার বাতাস অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। রানি গম্ভীর মুখে স্থান ত্যাগ করলেও রাজা রমণী-কদিকে অধিক পারিতোষিক দিয়েছিলেন। সেই ক্ষোভে রানি পঞ্চম দিনে আসেন নি। এ-দিন ছিল নাটক। দেশের শ্রেষ্ঠ তিনটি নাটকের দল আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। প্রথমে বিরোগান্ত; তারপর-মিলনান্ত; শেষে প্রচণ্ড এক হাসির নাটক। হাসতে হাসতে রাজার হিঁকা উঠে যাওয়ার পর নাটক বন্ধ করে দেয়া হয়।

দিনের বেলায় মন্ত্রী পরিষদের সভায় দোদুল্যমান অবস্থা চললো অনেকক্ষণ ধরে। ষষ্ঠ দিনের অনুষ্ঠান হাস্যকৌতুক। রাজার হিকার ধাক্কা সকাল পর্যন্ত ছিলো; রাজবদ্যিরা গম্ভীর ও অস্থির মুখে পায়চারি করেছেন অনেকক্ষণ। তাঁদেরই পরামর্শ ছিলো, আজকের হাস্যকৌতুকে যদি রাজার আবার হিঁকা ওঠে তাহলে সেটা প্রাণঘাতী হতে পারে; জন্মদিনের আনন্দ-অনুষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে শোকের বিলাপ। কিন্তু রাজা যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বললেন, 'না, রাজ্যের জনগণকে আমি আনন্দ থেকে বঞ্চিত কতে পারিনে।'

বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাব করলেন প্রধানমন্ত্রী, 'রাজাধিরাজ, রাজবদ্যিদের মতো আপনি শুনেছেন, মন্ত্রীসভায়ও আমরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম। কেবল আপনার চূড়ান্ত মতামত শোনার অপেক্ষা করছি।'

'সে তো আমি জানিবে দিয়েছি।'

'কিন্তু বিপদের আশংকা তো অস্বীকার করা যায় না!'

গম্ভীর কণ্ঠে রাজা বললেন, 'তুমি জেনে রেখো এ আনন্দোৎসব আমার জন্মদিনে হলেও আসলে তাদেরই। তারা কর যোগায়, রাজনা দ্যায়, দেশের অর্থনীতি চালু রাখে তারাই। আমি কে? আমি কে বন্ধ করার?'

'কিন্তু আপনি হুকুম দিলেই বন্ধ হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি হুকুম দিছি, আজ হাস্যকৌতুক হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আর কথা বলেন নি।

দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠতম রসিকদের হাস্যকৌতুকে রাজা পেট ধরে হাসলেও আর হিঁকা ওঠে নি দেখে কৃষিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'গতকালের হাসির নাটকের চেয়েও বেশি, কিন্তু কিছুই হলো না কেন বলতে পারেন?'

'তোমার কথাটা আমিও ভেবেছি। সম্ভবত লক্ষ্য করেছো শেষের দিকে আমি আর হাসি নি। এই কথাটাই গভীরভাবে ভাবছিলাম।'

'কোনো কূল-কিনারা পেলেন?'

'মনে হয় পেয়েছি। প্রজাগণ-প্রাণ রাজা ভুলে যান নি যে এ-হাসির সমস্ত প্রাণ্য তাঁর একার নয়। একার হলে তিনি নিশ্চয়ই থকল সইতে পারতেন না। গ্রাম-গ্রামান্তর, দূর-দূরান্তরের চাষি মাষি মজুর গোরাল্লা ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী সকলের

বিশু বিশু ঘামের সংশ্লিষ্টে এ হাসির জন্ম। আনন্দ ও অশ্রুত্বিটি তিনি ভাগ করে নিয়েছেন ও দিয়েছেন। তাই কোনো কষ্ট হয় নি তাঁর।’

কথাগুলো বলে প্রধানমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর ঘুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কারো ঘুখে নতুন কোনো প্রস্নের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। সম্মাননী অনুষ্ঠানে বাজি পোড়ানো। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বহুরাষ্ট্র, ইরান তুরান শ্যামদেশ থেকে সব মালাকার এসেছেন নিজ নিজ দেশের সম্মান রক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়ে; তাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতিজ্ঞা হয়ে।

ভক্তজ্ঞার নিমন্ত্রণরূপ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মালাকার প্রথম বাজি উঠু করে ধরলেন, রাজা বীর পারে নেমে এসে অগ্নিশলাকা ছালাতেই আনন্দধ্বনি ও চিৎকারে বাতাস কেটে কেটে যেতে লাগলো। যুহুর্তে বাজি উঠে গেল আকাশে; লাল নীল সবুজ আলোর ফুলফুরি ফুটিয়ে সহসা মালা ফুটে উঠলো মাঝ-আকাশে, মাঠের অগণিত দর্শক দেখতে পার, মালার মাঝখানে থেকে আলো হয়ে লেখা বেকস্মে : রাজার পঞ্চাশতম জন্মদিনে অভিনন্দন।

তারপর একে একে আর-সব দেশ। কেউ দ্যাখালো তারাময় আকাশের নিচে আরেকটি আকাশ, কিন্তু সে আকাশের তারারা কেবল চিকমিক আলো ছড়ায় না; কুবনের সমস্ত রঙের আলো এই জ্বলে এই নেতে, দেখতে দেখতে সমস্ত রং একত্রিত হয়ে আবার সহস্র রঙে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাজি-শেষে বিজ্ঞাত দর্শকদের চোখে অনেককণ সে আলোময় জগৎ করে যেতে লাগলো।

কেউবা নুনো ময়ূরের নাচ। আকাশে মেঘ না জমলে ময়ূরের নাচ জমে না; কিন্তু কোথায় মেঘ; একমাত্র অধঃ ছাড়া আর নরটা দিকে মেঘের বিশুমাত্র চিহ্ন সেই। বাজিকর জ্বলে যায় না সে কথা। প্রথম বাজিতে সমস্ত খুলিময় তারা হারিয়ে গেল অনন্তে, রাতের অন্ধকারেও বোকা যায় আকাশ কালো পোশাক পরে নিয়ে তৈরি বৃষ্টি করাবে বলে, মেঘ তাকে ওড়ুওড়ু এবং তার পরপরই পঞ্চম মেলে নাচনা শুরু হয়ে যায়। দর্শক প্রথমে জ্বলে যায় উদ্ভাস প্রকাশ করতে, সঙ্কিত ফিরে পাওয়ার পর আনন্দময় বিশ্বর প্রকাশ ছাড়া আর কেউ কিছুই করণীয় পার না।

বাজিতে মেঘের নাচ, জোনাকি জ্বলার ফেলা শেষ হতে হতে আবার পূর্ব আকাশে তকজর হাঙ্গ। মানুষের আর আশ মেটে না। সেদিন রাজধানীতে আর একটা লোকও অবশিষ্ট নেই; যুহুর্ন্ত হতেম আলী ছেলের কাঁধে তর দিয়ে এসেছে; এসব বেদনা নিয়ে সুন্দা এসেছিলো, জ্বলে ছিলো এতোকণ; মরিয়মের সেড়-দিমের বাচ্চা বারকয়েক কেঁদে একসময় কোলের মধ্যেই জ্বিয়ে পড়েছে। শেষ খেলাটা যখন জাতীয় পতাকার পটভূমিতে, রাজা-রানি দাঁড়িয়ে হাসছেন শেষ হলো, তখন উঠলো গগনবিদারী চিৎকার, ‘আমরা রাজার নত সহস্র বৎসর আনু কামনা করি। প্রত্যেক বৎসর আমরা এমন উৎসব চাই।’

ঠিক সেই সময় রাজধানীর কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে সুবন্দ্য প্রাসাদ থেকে নলু কিছু হালমাত্রা ছুটি করে বেরিয়ে যায়। কোনো লোকই পছন্দে সেই, এক নলু ছাড়া।

অনেকজন এ-রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে ঘুরে ছাড়া হয়ে পড়ল। তার মনে ভয় নহে, সেখানে বাতাসও সেই বাধা সেনার, সেখানে নিশ্চয়ই একটা অলৌকিক তাত্ত্বিক আপন আপনে নিয়ে থাকে কোন বিপদের মুখে কে জানে। কণাটা মনে আসতেই নসু লনল জোরে একটা দৌড় দায় আর পেছন ফিরে চায়। তাতেও খুঁজি সেই যেন, নিজের কাছ থেকেই পরিজ্ঞান পাবার জন্যে সে চিৎকার করে ওঠে—বাঁচাও, বাঁচাও; কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ করে, চিৎকার-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে তার দিকে।

শেষ আশ্রয় হিসেবে সে গিয়ে ওঠে রাজধানীর কেন্দ্রবিন্দুর এই মসজিদ অটালিকায়। এখানেও কেউ সেই আশ্রয় সেনার, তথু পুনাতা আদর করে হাততানি দায়, আয় আয় করে তাকে। অনেকজন বিশ্রাম সেনার পর হাতাবিক হয় নসু। তখন একে একে মনে পড়তে থাকে, শহরের কেউ আর গরে নসে সেই, রাজার পক্ষপাতময় জল্পনিসে সত্য ও সর্বশেষ অনুষ্ঠান নাজি পোড়ানো সেবতে সেতে, কেউ আর তাকে বাধা দিতে বা ধরতে আসবে না। সে ঘুরে ঘুরে সেবতে তক করে।

বড় ঘরের কোণায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত আয়নায় নিজের চেহারা সেবে এখনে চমকে উঠে নসু। পরে অনেকজন দাঁড়িয়ে নিজেকে দ্যাখে খুঁটে খুঁটে; গানের কোন জায়গায় মায়ের চুমুর দাগটা আছে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; ভেসেবেলায় তাইবোন মারামারি করতে করতে বোন বাঁজি দিয়ে কপাল কেটে দিয়েছিলো সেই দাগটা গেল কোথায়? আরো ব্যস্ত হয়ে সে আয়নায় শরীরটা সেন্টে দিয়ে কিশোরকালের পাতলা পাটের মতো পোক বোজে, বুকের পশমের রাজ্যে কবে মসুণ বুকটা ছিলো? কিছুই, কিছুই খুঁজে পায় না নসু, তার চারপাশ ঘিরে একটা কালোময় অতীত সেতে সেতে খেলে যায়, সেখানে রাজার জল্পনিসের আতশবাজির সামান্য আলোও পৌঁছায় না। আজ শেষনিসের অনুষ্ঠানে হাতরার ইচ্ছে ছিলো তার। সন্ধ্যা পর্যন্ত ইচ্ছেটা উজ্জ্বল দিয়ে আগিরে রেখে রেখে শেষে সিদ্ধান্ত নেয়—আজ কোনো একটা বাড়িতে বড়মতো বাজি দ্যাখাবো। কিন্তু তখনো সে বোঝে নি বা জানে নি, বাজির শেষে একটা অস্বকার দিক আছে।

আলমারি ভেঙে, বাকস খুলে, আলনা থেকে কাপড়চোপড় নিয়ে, তাঁড়ার ঘর থেকে চাল এনে ঘরের মাঝখানে জড়ো করে নসু। সেনার আনন্দে নসু এখনে খেয়াল করে না জিনিসপত্রের পরিমাণ কতোটা হয়েছে।

‘সবেসামান্য এ শালার করিছি কি? এ-যে গোটা চারিক ঠ্যালাপাড়ি লাগবি।’ নিজের বিন্ময়ে পরাজিত হয়ে নসু নিজে বহন করতে পারে এমনভাবে একটা পুটলি বানায়। পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে একবার মার্মা হয় তার। একটা চিন্তা জাগে মনে, এতলোর সাথে তার কোথায় বেশ একটা আত্মীয়তা আছে। এতোকণ হাত দিয়ে নিয়ে বহন করে আনলো; ওখানে হাতের ছাপ, এখানে বুকের ছাপ, ওইটাতে খামের গন্ধ, এইটাতে ফুকের স্পর্শ। এটুকু, কেবল এইটুকুতেই যেন তার বহু যুগের পরিচয় ও অধিকারের দাবি টিকটিকির গায়ের মতো রক্তিম হয়ে জ্বলজ্বল করে।

তবুও নসু ফেলে এসে ধরা পড়ে, কিছুদূর আসার পর। সবাই আনন্দময়-ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরছে, কেবল নসু পিঠে বহন করে নিয়ে যায় উপার্জনের সামগ্রী, রাজপ্রহরী খপ করে হাত চেপে ধরে, 'তুমি কে?' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দ্যায়, 'আমার নাম নসু, বাপের নাম বিত্ত, তার বাপের নাম দান্ত, তার বাপের নাম...'

যেন থাবা মেরে থামিয়ে দ্যায় রাজপ্রহরী। 'তোমার চোদ্দপুরুষের ঠিকুজি শোনার সময় আমার নেই।'

'বারে! বংশের পরিচয় না পেলে বুঝবে কেমন করে আমি কে?'

'আমার অতোশতো বোঝার দরকার নেই। কেবল বলো, তোমার এ পুটলিতে কি আছে?'

রাজপ্রহরীর এই প্রশ্নে এতোকণে অসহায় বোধ করে নসু।

এতোকণ নিজের রক্তের মতো ভালবেসে যে জিনিসগুলো সন্তানের মতো বহন করে আনছিলো তার দিকে প্রহরীর শোনদৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন মৃত্যুদূত দাঁড়িয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'এই মানে, আমার কিছু জিনিস।'

'এই শেষ রাতে তোমার জিনিস নিয়ে যাচ্ছে! দেখি, পুটলি খোলো।'

'বিশ্বাস করুন, আমার জিনিস।'

প্রহরীর সন্দেহটা দৃঢ়তর হতেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'তুই শালা ঠিক চোর। এসব চুরির মালামাস্তা।'

দ্বিতীয় কোন কথা কানে তোলে না প্রহরী। একটা নিরেট দেয়ালের মতো পিঠ দিয়ে সে নসুকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায় রাজবাড়ির দিকে; প্রধান ফটকে তখন রক্ষী ঘণ্টা পিটিয়ে নতুন দিনের আগমন জানাচ্ছে।

প্রহরী প্রথমে নসুকে নিয়ে যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী তখনো কড়কড়ে চোখে আঙুল ঘষছেন, তাঁর কেবল, শুধু একটু ঘুম চাই। কিন্তু এই অসময়ে এমন আপদের আগমনে বিরক্ত হয়ে হুকুম দিলেন, 'ফটকে রেখে দে।'

'কিন্তু হজুর, বিচার?'

'বিচার রাজা করবেন। তিনি এখন ঘুম দিয়েছেন। তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। বিচার-আচার যা হয় রাতে হবে।'

ফটকে যাওয়ার পথেও নসু বারদুয়েক অনুরোধ জানায়, কিন্তু প্রহরী তখনো নিরেট দেয়াল।

সারাদিনের বিশ্রাম শেষে রাতের মধ্য-প্রহরে রাজা, প্রধানমন্ত্রী ও আর সব মন্ত্রী গা ঝরঝরে হয়ে হালকা হয়ে যায়, মনে দক্ষিণের বাতাসের আলোড়ন, চোখে গত সাত দিনের অনুষ্ঠানের তন্দ্রা। আত্মতৃপ্তিতে বিভোর রাজার সামনে বহু ভূমিকা সেবার পর প্রধানমন্ত্রী প্রহরীর চোর ধরার ঘটনাটা বলতেই দপ করে জ্বলে ওঠেন রাজা, 'কী! এতোবড়ো কথা? আমার জন্মদিনের শেষদিনে এমন সাংঘাতিক কলঙ্ক ধরে নিয়ে এসো চোরকে।'

নসু হাজির হয় রাজার সামনে।

রাজার জন্মদিনের উৎসবে সমস্ত বন্দির ভাগ্যে ভালো খাবার জুটেছিলো। নসুও তার ভাগ পেয়েছে। এমন খাবার সে জীবনেও খায় নি বলে সারাদিন তার চোখ থেকে ঘুম ছোটো নি, আর যখন ছুটলো তখন তার চোখেও তন্যতা চড়ুই পাখির মতো নাচানাচি করে। সে নির্ভয়ে সামনে দাঁড়ায়। হংকার ছাড়েন রাজা, 'তুই গত রাতে চুরি করেছিস?'

'না হজুর।'

'প্রহরী তোকে ধরলো কেন?'

'অকারণে হজুর।'

'অকারণে! কী, প্রহরী?'

রাজপ্রহরী নসুকে বন্দি করার পর থেকে এখানে আনা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে নীচু গলায় বলে 'ও যে চুরি করেছে, এটা প্রমাণ করতে পারছিনে।'

থমকে যান রাজা। এই সামান্য বিরতির সুযোগে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী, 'অবশ্যই চুরিটা প্রমাণিত হওয়া দরকার। গত রাতে ও যদি বাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে চুরি করে নি।'

'ঠিক বলেছো প্রধানমন্ত্রী! ও বলুক গতরাতে আতশবাজির অনুষ্ঠানে কি কি দ্যাখানো হয়। বলতে পারবি?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় নসু। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'আপনি যদি অনুমতি দ্যান, আমি একে একে সাতদিনের অনুষ্ঠানের কথা বলতে পারবো।'

'তাই বল।'

সহসা নসুর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে যায়। পুটলির জিনিসগুলো বুকের কাছে সন্তানের আদরে অনুভব করে খুব ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করে নসু, যেন পৃথিবীর প্রান্ততম প্রদেশ থেকে শব্দ সংগ্রহ করে এনে সে কথা বলছে। মাঠের চারপাশের বৃক্ষরাজি তখন আকাশকে চামর দুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে, তারারা নেমে আকাশের মাঝামাঝি আর রাত্রির দেবী প্রকৃতিতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতে থাকে।

'রাজাধিরাজ!' শুরু করে নসু, 'রাজাধিরাজ, প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে জলপরীরা এসেছিলো। জলের গভীর তলদেশে পরীদের যে প্রাসাদ সেখানে দিনে-রাতে লক্ষ পিদিম জ্বলে। সে পিদিমের কোনোটার রং লাল, কোনোটার হলুদ, কোনোটার বা সবুজ। সেখানে গাছে গাছে ঝুলে থাকে সোনার আপেল, হীরার আঙুর, মোতির নাশপাতি। সেখানে কোনো দুঃখ নেই, একবার রানির কনিষ্ঠ কন্যার চোখে অশ্রু দ্যাখা দিয়েছিলো বলে রাজ্যময় সে কী প্রলয়ংকরী কাণ্ড, কন্যা হাসতে হাসতে বলে, আমি দুষ্টমি করেছিলাম। সুখ সেখানে জমতে জমতে আকাশের মতো অবিচল থাকে, আনন্দ সেখানে বইতে বইতে কেবলই সাগর হয়ে যায়, গান সেখানে কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে ফেরে। তারা, হ্যাঁ তারাই

এসেছিলো প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে। হাত ধরে, ঘুরে নেচে গেয়েও যখন তাদের ক্লাস্তি আসে না, তখনই রানি তাদের নিয়ে গেল জলপরীর দেশে। আপনার চোখে তখন বিশ্বয় দামি পাখরের মতো চকচক করছে, আপনি বারবার তাদের কাছে ছুটে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু কিরে কিরে আসছিলেন মাটিতে আপনার পা মলিন হয়ে আসছিল বলে।’

একটু দম নিয়ে নসু আবার বলে, ‘জলপরী আসা আর কেউ দেখতে পায় নি, কেবল আমি ও আপনি ছাড়া।’

‘ঠিক, ঠিক বলেছো তুমি।’

আনন্দে হাততালি দিয়ে রাজা দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়ে সিংহাসনে গা এলিয়ে দিয়েই উঠে বসেন; তাঁর মনে হয় বসতে গিয়ে পিঠের কোথায় যেন সামান্য একটু ব্যথা লাগে।

‘রাজাধিরাজ, আপনি কি ভুলে গেছেন দ্বিতীয় দিনে মেঘপরীরা এসেছিলো? আসলে আপনার কোন দোষ নেই, একাদিক্রমে সাতদিনের অনুষ্ঠানে আপনার চোখে মায়াকাজলের প্রলেপ সব বিস্মৃত করে দিয়েছে। আপনি বিস্ফারিত চোখে দেখছিলেন সাদা মেঘ, গোলাপি মেঘ, সোনালি মেঘ, পান্না মেঘরণের পরীদের নৃত্য, শুনছিলেন তাদের গান। দিনের আটটি প্রহরে মেঘলোকের প্রাসাদে আটরকম বরণ ধারণ করে। সূর্য যখন পূর্ব আকাশে উঁকি দ্যায় তখন শুধু কাঁচা হলুদের ছড়াছড়ি, তারপরে রং সোনালি হয়, গাঢ় হয়, ধূসর কিকে হতে হতে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়, মেঘপরীদের আপনি ডাকলেন—নেমে এসো, নেমে এসো আকাশ তারকা চন্দ্র সূর্য গ্রহ আর অনন্তলোকের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে। তারা এলো বৃষ্টি হয়ে, কুয়াশা হয়ে, তুষার হয়ে, কোটি কোটি টিপের শিশির হয়ে। আপনি কেবল বললেন, এই তো আমার আনন্দ, এই তো আমার সুখ। আমি বাতাসের গায়ে কান পেতে আপনার সে কথা শুনছিলাম, শব্দ তরঙ্গের পিঠে আড়ি পেতে সে আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করেছি।’

‘আশ্চর্য, সব মিলে যাচ্ছে! তারপর?’

‘তৃতীয় দিনের ফুলপরীর গল্প? আপনার মতো আমিও যদিও তাকাই, দিক থেকে দিগন্তে শুধু বাহারি ফুলপরীদের নাচ। দেশের সর্বদক্ষিণে যেখানে সাগর, মহাসাগরের আশীর্বাদ নিয়ে নাচতে নাচতে এসে উপকূলে আছাড় খায়, সেখানে সৃষ্টির প্রথম রজনীগন্ধা ফুলের পরী এলো। উত্তরে পাহাড়ের শীর্ষে আছে এক হৃসনুহেনা গাছ; সেখানকার পরীরা এলো মাতাল করা গন্ধ ছড়িয়ে। রাজাধিরাজ, দেশের ফুলপরীদের এতো সুবাস এতোদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলো জানতাম না। কেবল নয়ন ভরে দেখলাম, দেবদেবীর সামনে রমণীরা যেমন আত্মমি নত হয়ে প্রণাম জানায় তেমনি সবাই আপনাকে প্রদ্ধার নৈবেদ্য দিতে লাগলো। আপনি তখন বিভোরতার তুঙ্গে, পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগৎ ভুলে পৃথিবীর সমস্ত ফুলপরীর নাচ দেখতে দেখতে একসময় চিৎকার করে উঠলেন, আমি চাই সব ফুল ও ফুলপরী আমার অধিকারে থাকবে। সব ফুলপরী ঠিক তখনই মিলিয়ে গেল।’

‘হবহ মিলে যাচ্ছে। সব সত্যি। বলো, আরো বলো।’

রাজা হুকুম দিয়ে আবার সিংহাসনে হেলান দিয়ে বেশ জোরে কঁকিয়ে ওঠেন। সিংহাসনে প্রথমবার সামান্য ব্যথা তিনি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়বার লক্ষ করেন নি, কিন্তু তৃতীয়বারে বুঝতে পারেন তিনি, দ্বিতীয়বারেও আঘাতটা অপেক্ষাকৃত জোরে লেগেছিলো।

‘রাজাধিরাজ, চতুর্থ দিনে গানের পরীরা আপনাকে গান শুনিয়ে প্রীত করার জন্যে মাতামাতি শুরু করে দিলো। মধ্যযামে সবাই যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে, তখন পৃথিবীর নাভিমূল থেকে যে নিঃশব্দ সংগীত গীত হয় তাও আপনাকে শোনালো গানপরীরা। দেশের সমস্ত প্রচলিত সুরধ্বনিকে কেবল ওরাই গাইতে পারে দেখে আমার ঘুরে-ফিরে একটা কথাই মনে হচ্ছিলো রাজন, এমনটা শুনে শুনে জীবন কাটানো যায় না! গাছের পাতারা গান গায়, ঘাসের কচি ডগা শিশুকণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করে, ফুলগাছের কাণ্ড থেকে যে মায়াময় গীত ধ্বনিত হয় তা ধমনীতে শিহরণ জাগাচ্ছে বারবার; পরীরা সবার গান কণ্ঠে ধারণ করলো কি করে! কোনো দিকে লক্ষ নেই আপনার, আকাশের প্রান্ত থেকে সদ্য জীবনপ্রাপ্ত যে শিশু কেঁদে উঠলো, হ্যাঁ, সেটাও সংগীত, কিন্তু আপনি চিৎকার করে বললেন, আমি সুরের সুরা পান করে আজীবন মাতাল থাকতে চাই।’

‘হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। তুমি আর কিছু শোন নি?’

‘শুনেছি মহারাজ। সেই কান্নাটা ক্রমশ উচ্চ্যামে উঠতে থাকে, গানপরীরা ওটাই সুরে সুরে গাঁথে যায় দেখে আপনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আলো চাই, স্বস্তি চাই, নৈঃশব্দের ভুবন চাই বলে রাজপ্রাসাদে ছুটে চলে গেলেন। বিশ্বাস করুন আমি তখন আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম।’

সহসা কোনো জবাব দিতে পারেন না রাজা। কিন্তু পরে বাতাসের কাছে শুনে শুনে স্তিমিত কণ্ঠে বললেন,—‘সত্যি ভুল বলোনি।’

‘মহান নৃপতি! আপনি জানেন না হয়তো, আমি বহুদিন গভীর রাতে নগরীতে ঘুরে বেড়াই। সবাই যখন ঘুমে বিভোর, তখন পরীরা বেড়াতে বেরোয়। জলপরী, মেঘপরী, ফুলপরী অনেকবার দেখেছি, তারা হেসে কথা বলেছে আমার সাথে। কিন্তু ফলপরীকে কোনোবার দেখি নি। তাদের প্রথম দেখলাম আপনার পঞ্চম দিনের বাজি-পোড়ানো অনুষ্ঠানে। আর সব পরীর মতো অতো সুন্দর চেহারা তাদের নয়, কিন্তু পাকা আমের গন্ধে বাতাস যেমন ভুরভুর করে, জাম কলা লিচু রঙিন হয়ে গন্ধ ছড়ায়, তখন মৌমাছিদের গুঞ্জনের মতো মানুষের খুশি প্রকাশ পায়; হ্যাঁ, তেমনি সবখুশির একখুশি হয়ে তারা আপনার সামনে নাচ দ্যাখালো। সব ফলপরী কতো বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য, গায়ে তাদের মনোহর পোশাকের সাথে মাতালি গন্ধ, সাধারণ মানুষ খুশি হয়েই কান্দে; কান্দে হয়ে দুঃখ পায়, কিন্তু আপনার আকর্ষণ-বিস্তৃত হাসি সৃষ্টির সেরা খুশির স্বাক্ষর হয়ে থাকে। কিন্তু মায়নীয় অধিপতি, আপনি তখনো জানতেন না সে-স্বাক্ষর কণহারা, কারণ, কিছু পরেই প্রকৃতির নিয়মে ফলপরীরা পচা ও গলিত ফলের গন্ধ নেচে নেচে

বাতাসে ছড়িয়ে দ্যায়। আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতির মতো হুংকার দিয়ে উঠলেন থামাও এ-সব অনাচার, কিন্তু প্রবাদের অমোঘ বাক্য অরণ্যে রোদন ঠা ঠা হাসি দিয়ে ভূমিকম্পের মতো আপনার ক্ষমতা কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। আপনি অসহায়ের মতো বসে থাকেন। এবার ষষ্ঠ দিনের আতশবাজির গল্পটা বলব?’

রাজা যেন ক্রমশ সিংহাসনের সাথে লেণ্টে যাচ্ছেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায়, পিঠের সেই আঘাতের ব্যথাটা আরো বেশি হয়েছে, মুখটা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে বারবার। তিনি ক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, ‘বলো।’

‘মহামহিম সম্রাট! ষষ্ঠ দিনে ফসলপরীদে নাচ দেখে আপনি শরীর ও মনে নতুন শক্তি পেলেন। পাকা ফসলের মাঠে যখন বাতাস খেলে যায়, তখন কৃষকদের মুখের দিকে তাকিয়ে ফসলের দেবতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমানকালেও নবান্নে যে উৎসবের মাতামাতি তা সব জড়াজড়ি করে আপনার মুখে ছবি হয়ে রইলো। দেবতা যেমন উঁচু আসনে সমাসীন থেকে সকলের অর্ঘ্য গ্রহণ করেন; সাথে চলে গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্রের মাতোয়ারা সুর, তেমনি ফসলপরীরা আপনাকে দেবতার আসনে বসিয়ে মৌসুমি ফসলের ফুল দিয়ে প্রণতি জানিয়ে চলে যায়। মনে আপনার চলতে থাকে গান, নিশ্চয় আপনার ভাণ্ডার উঠবে পূর্ণ হয়ে। আশ্চর্য, দুটো ফসলপরী কখন যে আর সব অবাধ্য পরীদের নিয়ে এসেছে তা আপনি কেন, ফসল পরীরানিও বুঝতে পারে নি। চোর চোর, তরুর তরুর করে রানি চাঁচিয়ে উঠলো, আপনিও গলা মেলালেন তার সাথে, কিন্তু পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈশান অগ্নি বায়ু নৈঋত উর্ধ্ব আর অধঃ থেকে সে চিৎকার-ধ্বনি ফিরে আসে প্রবল প্রতিবন্দ হয়ে, বিদ্রূপ হয়ে। সত্যি শক্তিমান রাজপুরুষ, ক্ষমতা যখন অসহায় হয়ে পড়ে, তখন তার মতো করুণ অবস্থা আর হয় না। আপনি দেখতে পেলেন সব শূন্য।’

ভয়াবহ চিৎকারে মাটি কাঁপিয়ে রাজা থামতে বলেন নসুকে। কিন্তু নসুর গলায় তখন কথামালার জীবন্ত বিনুনি, রাজার কণ্ঠস্বরের সমতা রেখে বলে, ‘সপ্তম আর শেষ দিনে জীবনপরীর আতশবাজির গল্প না শুনিয়ে আমি থামতে পারি নে নরপতি’ আপনি কোনোদিন জানতে চান নি জীবনের বিপরীতে একটা কুৎসিত, কদর্য, মলিন, হতাশ ও দুঃখময় জীবন আছে। জীবনপরীরা সুন্দর হয়ে যখন নাচলো তখন বারবার আপনার নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে দেখে বিহ্বল হয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু যখনই চাঁদের উলটো পিঠ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন রাজপ্রহরীকে পাঠালেন, যাও, ধরে নিয়ে এসো।’

কথা শেষ করতে পারে না নসু; মরণপণ চিৎকার করে রাজা বাতাস আঁকড়ে ধরতে গিয়ে মুখ ধুবড়ে পড়ে যান, তাঁর কণ্ঠে তখন হিমশীতল সঙ্গীতের অনুরণন।

